বন্ধুবর শ্রীনির্মলচন্দ্র মৈত্র

ও

বন্ধুপত্নী শ্রীমতী রাধারানী মৈত্রকে

তাঁদের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষ্যে

অনুবাদকের নিবেদন

টলস্টয় কেবল রুশ দেশের নন, সারা বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ লেখক ও চিন্তাশীল মহান শিল্পী। বিশেষ করে, ভারতীয় পাঠক মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও পরিচয় নিঃসংশয় এবং ঘনিষ্ঠ। তিনি অজস্র লিখেছেন। নীতিগত নিবন্ধ, আদর্শ ও মতামত-ঘটিত রচনাগুলো সরিয়ে রাখলেও তাঁর উপন্যাস ও গল্পের সংখ্যাও কম নয়, যেখানে তাঁর সৃষ্টিধর্মী মানস জীবনসত্তাকে উপলব্ধি করায় আগ্রহী, যেখানে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বহুমুখী চিন্তার শিল্পসম্ভার সংরক্ষিত আছে।

"শয়তান" টলস্টয়ের 'The Devil' নামক উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে এই উপন্যাসটি সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যায়। পরে এটি প্রকাশিত হয়ে তাঁর গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯২৮ সালে এলমার মড এই বইখানির প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৯৩১ সালে সেটি পড়ে আমি ও আমার সাহিত্য-রসিক বন্ধু কয়েকজন বিস্মিত হয়েছিলাম। কারণ, এত অল্প পরিসরে এমন কঠিন সংযমে লেখা একখানি সার্থক রচনা আগে পড়ি নি। শিল্পীর মুঠি একটু আলগা হলে, এ ধরনের আখ্যান নিছক যৌন-আবেদনে রসালো কাহিনীতে পরিণত হতে পারত। টলস্টয় তা হতে দেন নি।

তাই বইখানি বাংলায় তর্জমা করবার ইচ্ছা হয়। অনেক দিন পরে আমার বাংলা অনুবাদটি "দেশ" সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। দীর্ঘকাল পরে সেটির সংস্কার ও পরিমার্জনা করে "শয়তান" আবার প্রকাশিত হ'ল।

এখানে উল্লেখ্য, "শয়তান" উপন্যাসের একটা ব্যক্তিগত ইতিহাস আছে। টলস্টয়ের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে এবং তার প্রভাব তাঁর মনে ও লেখায় গভীর রেখাপাত করেছিল।

সেই ইতিহাস ও প্রভাবটুকুর কথা বইয়ের গোড়াতেই 'পূর্বকথায়' আলোচনা করেছি পাঠকদের সুবিধা হতে পারে, এই কথা ভেবে। সেই সূত্রে, নারীর জৈব আকর্ষণ এবং পুরুষের সম্ভোগলিপ্সা সম্পর্কে টলস্টয়ের নিজের মতামত প্রসঙ্গটিও আলোচিত হয়েছে। পাঠকরা লক্ষ করবেন, উপন্যাসের দুটি উপসংহার আছে। টলস্টয় দুটিই লিখে গেছেন। মনস্থির করতে পারেন নি, কোনটি উপযুক্ত পরিণাম। আমার নিজস্ব ধারণা, টলস্টয় প্রথম উপসংহারটি একটানা লিখেছিলেন এবং সেইটাই কাহিনীর স্বাভাবিক গতি ও পরিণতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। নারী-দেহের প্রলোভন এবং তজ্জনিত পাপ বা অমঙ্গল সম্বন্ধে তাঁর মনের যে বিশ্বাস ছিল, সেইটিই তাঁকে নায়িকার শাস্তি-বিধানে প্রবর্তিত করেছে তাকে হত্যা করিয়ে। তা না হলে ম্যাথু'র গসপেল বা সুসমাচার থেকে ঐ উদ্ধৃতি দিয়ে গল্প শুরু হ'ত না।

পরে কৃচ্ছ্রসাধন ও আত্মদমনের প্রতি তাঁর নৈতিক বিশ্বাস দৃঢ়তর হলে, তিনি নায়কের আত্মহনন ঘটিয়ে অন্তিম অনুশোচনায় কাহিনীর দ্বিতীয় পরিসমাপ্তি রচনা করেন।

অনুবাদের কাজ মোটেই সহজ নয়। সেখানে অনেকগুলো সমস্যা। প্রথমে, অনুবাদকের দক্ষতা—তিনি কতটা মূলকে অনুগমন করতে পেরেছেন। সেই সূত্রে দ্বিতীয় সমস্যা, মূল গ্রন্থকারের লিখনভঙ্গী, প্রকাশকৌশল বা আঙ্গিক, তাঁর বক্তব্য ও ব্যক্তিত্বকে তিনি কতখানি ত্রুটিহীন রূপায়িত করেছেন। তৃতীয় সমস্যা, মাধ্যম অর্থাৎ ভাষাগত। মূল রচনার ইডিয়ম অনুবাদকের আপন ইডিয়মে রূপান্তরিত হতে পারল কি না। দুঃখের বিষয়, রুশ ভাষায় আমি অনভিজ্ঞ, আমাকে ইংরেজী অনুবাদের উপরই ভরসা করতে হয়েছে। ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব মূলের আস্বাদ বজায় রাখতে চেষ্টা করেছি। আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভবপর নয়। তাই কোথাও বাক্যগঠন ভেঙে, কোথাও বা শব্দ সংযোজন করে—এক কথায় অল্প স্বল্প অপরিহার্য স্বাধীনতা নিয়ে স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কবেছি। তাতে কাহিনীর অন্তঃশীলা গতি, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আর নায়কের ক্ষুব্ধ-বিধ্বস্ত মনের যন্ত্রণাকর ছবিটি মূলানুগামী যথাযথ চিত্রিত হয়েছে কিনা, সুধী পাঠক তার বিচার করবেন।

সোভিয়েত রুশ দেশে অনেকেই সফর করে এসেছেন এবং কেউ কেউ তার কাহিনীও লিখেছেন। কিন্তু 'শয়তান' উপন্যাসের পৃষ্ঠপট ঐ ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা সম্বন্ধে যাঁর যথেষ্ট প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তিনি চিন্মোহন সেহানবিশ। তিনি এই জায়গায় চার বার গিয়েছেন এবং সব জিনিস খুঁটিয়ে দেখেছেন। টলস্টয়ের শেষ জীবন সম্পর্কে কয়েকটি বিশেষ তথ্য আর এই বইয়ের কভারের ছবি ও শেষ দিকে টলস্টয়ের সমাধির ছবি, এগুলি তাঁরই কাছে পাওয়া। প্রীতিভাজন বন্ধুর কাছে ঋণ স্বীকার করে রাখছি। পুথিপত্রের পরিচালক শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহা এই বই প্রকাশের ব্যাপারে যে অকুণ্ঠ সাহায্য করেছেন, তার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

"কিন্তু আমি তোমাদের বলি, যে-ব্যক্তি কোনও রমণীর প্রতি কামভরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সে ইতিপূর্বেই মনে মনে তার সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

এবং যদি তোমার দক্ষিণ চোখ তোমার পদস্খলন করায়, তা হলে সেটিকে উৎপাটিত করো এবং দূরে ফেলে দাও; কারণ, সমস্ত দেহ নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেয়ে শরীরের একটি অঙ্গ নষ্ট হয়ে যাওয়া অনেক ভালো।

আর যদি তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমার পতন ঘটায়, তা হলে সে হাত কেটে ফেলে দাও; কারণ, সমগ্র দেহ নরকে পতিত হওয়ার চেয়ে শরীরের একটি অংশকে বিনাশ করাই তোমার লাভজনক।"

ম্যাথু—পঞ্চম, ২৮, ২৯, ৩০।

পূর্ব কথা

'শয়তান' উপন্যাসের পিছনে যে ব্যক্তিগত ইতিহাসের সন্ধান-সূত্র মেলে, তা থেকে টলস্টয়ের আত্মচরিত্রের ও নৈতিক বিশ্বাসের কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়। গোড়ার কথা হিসেবে তাই এই উপন্যাসখানির পৃষ্ঠপট বা প্রাক্-কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

১৮৮০ সালের শেষ ভাগ।

টলস্টয়ের বয়স তখন বাহান্ন…

ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা অঞ্চলে টলস্টয়ের বাড়িতে থেকে একজন অল্পবয়সী মাস্টার তাঁর ছেলেদের পড়াশুনোর তত্ত্বাবধান করতেন।

একদিন খুব উত্তেজিত অবস্থায় টলস্টয় তাঁর কাছে দৌড়ে এলেন! বললেন, "আমার একটা উপকার করতে হবে তোমায়…"

টলস্টয়কে এতখানি বিচলিত হতে মাস্টার মহাশয় দেখেন নি কোনো দিন। তাই সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসে বললেন,—"বলুন কি করতে পারি….? আমার দ্বারা যেটুকু সম্ভব…"

স্খলিত কণ্ঠে টলস্টয় বলে উঠলেন :

"বাঁচাও আমাকে! আমি তলিয়ে যাচ্ছি…"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি হয়েছে, বলুন আগে…"

টলস্টয় তখন খুলে বললেন :

"একটা দুর্দম যৌন আকাঙ্ক্ষা আমার মন আর শরীরকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিছুতেই সামলাতে পারছি না নিজেকে…মনে হচ্ছে—কোন শক্তি নেই আমার…এই প্রলোভন জয় করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তুমি আমার সাহায্য করতে পারো।"

গৃহশিক্ষক বললেন ঃ

"কিন্তু কি ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, সেইটা বুঝতে পারছি না। কারণ আমি তো নিজেই দুর্বল···!"

"তুমি পারো—নিশ্চয়ই পারো, যদি-না ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাও···"

"বেশ, বলুন কি করতে হবে···আমি রাজি।"

"বাঁচালে তুমি!" টলস্টয় নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

"রোজ আমি হেঁটে বেড়াই, তুমি তখন আমার সঙ্গে এসো। দু'জনে একত্র বেড়ালে, কথা বললে, প্রলোভনের চিন্তা আর মাথায় ঢুকবে না··· আমি ছাড়া পাবো। আসবে তো?"

দু'জনে বেরুলেন বেড়াতে। পথে যেতে-যেতে এ-কথা সে-কথায় টলস্টয় সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বললেন তাঁর ভ্রমণ-সঙ্গীকে।

ইতিপূর্বে, টলস্টয় যখন বেড়াতে বেরোতেন, তাঁর চোখে পড়ে যেতো ডোম্‌না বলে একটি যুবতী মেয়েকে···বছর বাইশ বয়স হবে তার। চাকর-বাকরদের রাঁধুনী হিসাবে তাকে কাজে ভর্তি করা হয়েছিল কিছুদিন আগে।

এই ডোম্‌না মেয়েটি বেশ লম্বা-চওড়া আর স্বাস্থ্যবতী। দেখতে তেমন বিশেষ সুশ্রী না হলেও তার অঙ্গে আছে মজবুত স্বাস্থ্যের নিটোল লাবণ্য। দেহের গঠন মনোহর, রঙটাও চমৎকার। একবার দেখলে ওর দিকে বার বার তাকাতে ইচ্ছে করে···

প্রথম কয়েকদিন ডোম্‌নার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেলে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতেন। কিন্তু অবাধ্য দৃষ্টি আবার গিয়ে নিবদ্ধ হ'ত তার সুঠাম অঙ্গসৌষ্ঠবের ওপর। দূর থেকে লুকিয়ে-চুরিয়ে ওকে একদৃষ্টে দেখতে ভালোই লাগত তাঁর। ক্রমশ এই দেখাটা দাঁড়াল নেশায়। তখন আস্তে আস্তে ওর পিছু নিতে লাগলেন তিনি। ডোম্‌না যখন যেদিকে যায়, টলস্টয়ও তার অনুসরণ করেন। একটু আড়াল পেলেই শিস্ দেন, ইশারা করেন।

ক্রমশ ডোম্‌নার সঙ্গে আলাপ হ'ল তাঁর। ওর সঙ্গে কথা বলা, একত্র বেড়ানো ব্যাপারগুলো সহজ ও সাধারণ হয়ে এল। অবশেষে এক দিন ওর কাছে প্রস্তাব করলেন, দুজনে এক জায়গায় গিয়ে মিলবেন।

জায়গাটা তাঁর তালুকের মধ্যেই···একটু দূরে মেঠো পথ ধরে গেলে একটা পুরানো বাগানের কানাচে একটি নিভৃত-স্থান। ঠিক হ'ল সেইখানে....

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানে পৌঁছাতে হলে ছেলেদের যে পড়বার ঘরটা ছিল বার বাড়ির দিকে, তার পাশ কাটিয়ে যেতে হয়। সে ঘরের জানালার ঠিক নীচ দিয়েই পথটা গেছে। পরের দিন সঙ্কেত-স্থলে চলেছেন টলস্টয়···

যাচ্ছেন আপন মনে···কিন্তু মনের মধ্যে তখন দারুণ ঝড় উঠেছে! দ্বিধায় আর দ্বন্দ্বে মন তাঁর দুলছে। একদিকে দেহ-তৃষ্ণার দুর্বার প্রলোভন আর অপর দিকে বিবেক-বুদ্ধি সংযমের প্রেরণা।

ঠিক সেই সময়টিতে তাঁর মেজ ছেলে পড়াবার ঘরের জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে বাপকে ডেকে বলল ঃ

"আজ যে কথা ছিল, তুমি আমায় গ্রীক পড়িয়ে দেবে! ভুলে গেছ ··?"

চমক ভাঙ্‌ল টলস্টয়ের। চৈতন্য ফিরে পেলেন যেন: ছেলেকে পড়াতে বসে গেলেন। আর যাওয়া হ'ল না ডোম্‌নার কাছে···আসন্ন বিপদের কবল থেকে এইভাবে বেঁচে গিয়ে তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। কিন্তু কতক্ষণের মুক্তি? কতটুকুই বা?

প্রলোভন পরাস্ত হয় নি। মাথা নীচু করেছিল মাত্র, কিছুক্ষণের জন্যে। আবার শুরু হ'ল সেই আকস্মিক দ্বন্দ্ব আর বিক্ষোভ। উদগ্র কামনার তাড়নায় মন তাঁর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে উঠল। ভক্তি ও বিশ্বাসে আস্থাবান হয়ে তিনি চেষ্টা করলেন প্রার্থনায় বসতে, যদি ধ্যান-ধারণায় মন আবার সরল সতেজ হয়ে দেহ-তৃষ্ণাকে অবদমিত করতে পারে···

কিন্তু হ'ল না···মুক্তি পেলেন না টলস্টয়। নানা উপায়ে চেষ্টা করলেন মনকে ফেরাতে। দেহ-নির্যাতনে শরীর অবসন্ন হয় মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। মনের কোষের মধ্যে যে কীটাণু প্রবেশ করেছে, সেখানে কোনো প্রতিকার মেলে না। নিজেকে অসহায় দুর্বল মনে হয়···মনের যন্ত্রণা আর অস্বস্তি বাড়তেই থাকে।

টলস্টয় স্থির করলেন···এর চেয়ে আরো কড়া ওষুধ চাই। স্বীকারোক্তি আর আত্মধিক্কারে হয়তো ফল পাওয়া যেতে পারে। কারুর কাছে অকপটে

স্বীকার করতে হবে তাঁর এই নৈতিক অধঃপতন। রেখে-ঢেকে নয়,—খোলাখুলি প্রকাশ করতে হবে তাঁর এই প্রলোভনের কথা আর আপনার চরিত্র-দুর্বলতার সমস্ত খুঁটিনাটি। ঘৃণায়, লজ্জায় আর আত্মধিক্কারে কারুর সামনে মাথা মাটিতে নত করে দিলে তবেই মুক্তি, তবেই পাপক্ষালন···

তাই ঠিক করলেন, একলা আর না বেড়িয়ে সঙ্গে নেবেন ছেলেদের মাস্টার মশাইকে। বলবেন তাকে সমস্ত কথা···প্রত্যেকটি ঘটনা, তাঁর মনোভাবের আর গোপন আকাঙ্ক্ষাব প্রতিটি লজ্জাকর তথ্য প্রকাশ করবেন অকপটে তার কাছে।

তাই করলেন টলস্টয়। ডোম্‌নাকে তাঁর জমিদারী থেকে অন্যত্র সরিয়ে দিলেন আর এই শিক্ষকটির সাহচর্যে, তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশে এবং নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করে মুক্তি পেলেন টলস্টয়···অমানুষিক দৃঢ়তায় চিত্তশুদ্ধি হ'ল। সমস্ত গ্লানি দূর হ'ল, স্থূল দেহ পরাস্ত হ'ল আত্মিক সাধনার কাছে।

জীবনের এই সঙ্কটকাল অতীত হয়ে যাবার পর, টলস্টয় বড় বেশি উল্লেখ করতেন না এই ঘটনার। যদি কেউ তার যৌন জীবনের বিপত্তি উল্লেখ করে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইতেন, তবেই তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলতেন···

কেবল একটি বার তিনি এই ঘটনার বিশদ বিবরণ লিখে জানিয়েছিলেন তাঁর এক নিকট-বন্ধুকে। তবে এই ব্যাপার টলস্টয়ের জীবনে এক গভীর রেখাপাত করেছিল, এ কথা সত্য। **The Kreutzer Sonata, Resurrection** প্রভৃতি গ্রন্থে এই দেহ-সম্ভোগের প্রলোভন তিনি চিত্রিত করে গেছেন। আর এই বর্তমান ছোট উপন্যাসখানিতে তিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতাকে নির্মম লেখনী দিয়ে ফুটিয়েছেন। "শয়তানে"র নায়ক ইউজিন যে-দুস্তর বিক্ষোভ অতিক্রম করেছে, স্টীপানিডার দেহের প্রতি তার যে-দুর্দমনীয় আকর্ষণ তাকে পাগল করেছে—যে-সমস্ত আত্মচিন্তা, দ্বন্দ্ব আর গ্লানি তাঁকে পীড়িত, নির্যাতিত করেছে প্রতিনিয়ত, তার মধ্যে বহুলাংশই সত্যকারের ঘটনা, প্রকৃত ও বাস্তব অভিজ্ঞতা।

এই বইয়ের মধ্যে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক, যৌন-জীবনের ব্যাখ্যা, প্রলোভন-জয়ের পন্থা আর সংযম ও আত্ম-নিরোধের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তার সঙ্গে বর্তমান কালের অনেকেই—এমন কি টলস্টয়ের সমকালীন চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও একমত হতে পারেন নি। দেহবাদিতা সম্পর্কে টলস্টয়ের মত ও বিশ্বাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় বইখানিতে, সে সম্বন্ধেও আধুনিক পাঠক-সমালোচকদের মনে সন্দেহ হয়েছে, টলস্টয় কতটা আন্তরিক বিশ্বাস করতেন। কেউ কেউ বলেন, যৌন-জীবন সম্পর্কে তাঁর মন ছিল খোলা এবং এ বিষয়ে তাঁর বিশেষ সঙ্কোচ বা শুচিবাদিতা ছিল না। মৌখিক প্রকাশও ছিল গ্রাম্যতা-ঘেঁষা। ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা 'টলস্টয়ের স্মৃতি-চিত্র' পড়লে তাই মনে হয়। পরবর্তী জীবনে তাঁর ধর্ম ও নৈতিক মতামতের অনেক পরিবর্তন ঘটে। তখন সংযম ও চিত্তশুদ্ধির উপর তাঁর আস্থা বাড়ে, যেটি বোঝা যায় 'শয়তান' উপন্যাসের নায়ক ইউজিনের দ্বিধাবিভক্ত মন ও আচরণ থেকে। টলস্টয়ের ব্যক্তিত্বেও এই দ্বৈত ভাব ও তজ্জনিত অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়।

বস্তুতঃ, টলস্টয় একদিকে হলেন 'গ্রেট এরিস্টোক্র্যাট', অপরদিকে খাঁটি রুশ 'ম্যুজিক' বা চাষী-শ্রমিক। আর, স্ত্রীলোক সম্পর্কে টলস্টয়ের মধ্যে বেশ একটা বৈরিভাব ছিল। নারীর প্রতি তাঁর এই মনোভাব, গোর্কি লিখেছেন, "the hostility of the male, the hostility of the spirit against the degrading impulses of the flesh."

আত্ম-নিরোধ, অনুশোচনা, দেহ-দমন প্রভৃতি উপায়গুলো হয়তো একদা তাঁর কাছে পরীক্ষিত সত্য। তবে টলস্টয়ের আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ গ্রহণ করতে না পারলেও কোনো ক্ষতি নেই। শিল্পী টলস্টয়ের নিষ্ঠা, সংযম এবং দৃঢ় আন্তরিকতা সম্বন্ধে কিন্তু কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। তাই গোর্কি নিজে এক মহৎ শিল্পী হয়ে টলস্টয়ের নানা অসঙ্গতি সত্ত্বে সেই মহান শিল্পীর মৃত্যু-সংবাদে কি ভাবে ও ভাষায় তাঁর অন্তরশ্রদ্ধা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তা পাওয়া যাবে 'টলস্টয়ের স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে 'একটি চিঠি' নামক রচনার ৫৮-৬২ পৃষ্ঠায়।

আত্ম-জীবনীমূলক এই রচনাটিতে টলস্টয়ের যে-দৃঢ়বিশ্বাস, ঋজু কাঠিন্য

এবং বলিষ্ঠ অন্তঃশক্তির অনিবার্য প্রকাশ, তার তুলনা মেলে মাত্র আর একখানি বইতে—মহাত্মা গান্ধীর আত্মচরিত "সত্য নিয়ে পরীক্ষা", "My Experiments With Truth" নাম গ্রন্থে। ক্ষমাহীন আত্মপ্রকাশে, চিত্তশুদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টায়, নির্মম নিষ্ঠায় ও নির্বিরোধ অহিংস-ভাবাশ্রয়ী আত্মিক বল-সাধনায়, গান্ধীজী ও টলস্টয়ের নাম একসঙ্গে এসে যায়।

টলস্টয়ের মৃত্যুর পর অনেক লেখা পাওয়া গিয়েছিল, যেগুলো অপ্রকাশিত এবং যার অধিকাংশ 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' ও অহিংস নীতি-সংক্রান্ত রচনা। পরে কিছু কিছু লেখা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু "শয়তান" উপন্যাস-খানিই তাদের মধ্যে একমাত্র সম্পূর্ণ ও সার্থক রচনা। এতে আছে শিল্প-সৃষ্টির দৃঢ় পরিচয়। শুধু ব্যক্তিগত ইতিহাসের কারণে নয়, লেখার গুণে এবং সংযত পরিবেশনেও মহৎ-শিল্পী টলস্টয়ের বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে এই ছোট উপন্যাসখানিতে। দুটি উপসংহার তিনি লিখে গেছেন। সেই দুটিই মুদ্রিত হ'ল এখানে। কিন্তু তিনি জীবিত থাকলে বইখানি যদি প্রকাশিত হ'ত, তাহলে কোন্ পাঠান্তর গ্রহণ করে তিনি গল্পের শেষ করতেন, সেটির অনুমান-দায়িত্ব পাঠকদের ওপর ছেড়ে দিলাম।

ইউজিন আর্তেনিভের সামনে ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। অর্থাৎ জীবনে কৃতিত্ব অর্জন করতে হলে যে-যে উপকরণের প্রয়োজন, তার কিছুরই অভাব ছিল না। বাড়িতে ইউজিনের যে-শিক্ষালাভ হয়েছিল, তার বনিয়াদটা ছিল পাকা। পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনের ডিগ্রী নিয়ে সে সসম্মানে পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়েছিল। সম্প্রতি তার পিতার লোকান্তর হয়েছে বটে কিন্তু তাঁরই খাতিরের সূত্রে বড় সমাজের উচ্চ ও অভিজাত কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে ইউজিনের যথেষ্ট আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা আছে। তা ছাড়া, কোনো এক উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীর আনুকূল্যে ইতিমধ্যেই সে এক রাজ-দপ্তরে সরকারী কাজ যোগাড় করে নিয়েছে।

উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া পৈতৃক সম্পত্তিটাও নেহাৎ কম নয়। ভালোই বলতে হবে যদিও আয়ের দিক্ থেকে এটা খুব নিশ্চিত, লাভবান ছিল না। তার বাবা বেশির ভাগ বাইরে-বাইরে কাটাতেন, অধিকাংশ সময়ে থাকতেন পিটার্সবুর্গে। নিজে ও স্ত্রী দুজনে মিলে বেশ ভালভাবেই খরচপত্র করে বাস করতেন। আর দুই ছেলেকে বছরে বছরে প্রত্যেককে ছ' হাজার করে রুবল দিতেন তাদের নিজস্ব খরচের জন্য। বড় ছেলে হ'ল এ্যাণ্ড্রু, সে ছিল ঘোড়-সওয়ার সৈন্যদলে। প্রতি বছরেই গ্রীষ্মকালটায় মাস দুই তিনি এসে থাকতেন নিজের জমিদারীতে। কিন্তু মহাল পরিদর্শন করা, টাকা আদায়, সম্পত্তি দেখাশুনো করা—এ সমস্ত কোনো কাজেই তিনি মাথা ঘামাতেন না। সমস্ত জমিদারী চালনার ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন তাঁর নায়েবের ওপরে। কিন্তু এই ভদ্রলোক ছিলেন নামেই ম্যানেজার, কাজ তিনি একটা বড়

করতেন না। ধূর্ত ও অসৎ লোক,—কাজে ফাঁকি দিতে ওস্তাদ এবং বেশির ভাগ সময়েই মহালে অনুপস্থিত থাকতেন।

বাপের মৃত্যুর পর ছেলেরা নিজেদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিতে বসল। কিন্তু ভাগ করতে গিয়ে দেখা গেল, বিস্তর দেনার দায়। এতো বেশি, যে, পারিবারিক উকিল ভদ্রলোক পরামর্শ দিলেন যে, এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার অস্বীকার করে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়াই ভালো। খালি পিতামহীর কাছ থেকে পাওয়া দশ হাজার রুব্‌লের বিষয়টা রাখা যেতে পারে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী আর এক জমিদার এসে অন্য রকম পরামর্শ দিলেন। বৃদ্ধ আর্তেনিভের সঙ্গে এইভদ্রলোকের টাকা লেন-দেন চলত। কয়েকখানা বন্ধকী খত ও হাতচিঠা ছিল তাঁর কাছে। এগুলোর আদায়ের চেষ্টাতেই তিনি পিটার্সবুর্গ থেকে এলেন ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে। এসে বললেন যে, দেনা আছে সত্যি বটে, কিন্তু তারও একটা বিহিত করা যায়। দেনা মিটিয়ে যদি কিছু হাতে নগদ আর বিষয়-আশয় রাখতে চায় ছেলেরা, সে ব্যবস্থা অনায়াসেই হতে পারে। মস্ত বড় যে-জঙ্গলের মহালটা রয়েছে সেইটে আর কিছু বার দিকের খুচরো জমি বিক্রি করে ফেললে সুরাহা হবে। কেবল সেমিয়োন্‌ভ তালুকটা যেটা সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি অর্থাৎ চার হাজার বিঘে আন্দাজ পোড়ো মাটির জমি, চিনির কারখানা, আর দুশো বিঘের মস্ত বড় বিল—এইটে রাখলেই যথেষ্ট। যদি এই বিষয়টুকু ভালো মত তদ্বির-তদারক করা যায়, জমিদারীতে নিজে বসবাস করে বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ-আবাদ করা যায়—তা হলে ঐ আবাদেই ফলবে সোনা। অনর্থক খরচ বাঁচিয়ে যে মিতব্যয়ীভাবে জমি-জমা চালাতে জানে তার পক্ষে গুছিয়ে নেওয়া কিছু শক্ত নয়।

তাই বাপের মৃত্যুর পর ইউজিন এল জমিদারীতে এবং বসন্তকালটা এখানেই কাটালে। এই সময়টা বাজে নষ্ট না করে সে জমিদারীর সমস্ত কাগজ-পত্র হিসেব-আদায় তন্ন তন্ন করে দেখে ব্যাপারটা বুঝে নিলে। বেশ কিছুদিন মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করার ফলে ইউজিনের দৃঢ় ধারণা হ'ল যে, সমস্ত বিষয়-আশয়ের মধ্যে আসল সম্পত্তিটা বাঁচানোই দরকার। তাই সে ঠিক করলে যে, সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে মাকে নিয়ে জমিদারীতেই বাস করবে

আর নিজে হাতে জমিদারী চালাবে। তখন বড় ভাইয়ের সঙ্গে সে একটা আপোস করে ফেললে। বছরে বছরে ইউজিন্ এ্যাণ্ড্রুকে চার হাজার করে রুবল দেবে। নয়তো একসঙ্গে সে আশি হাজার রুবল থোক্ টাকাটা নিয়ে একটা লেখা-পড়া করে দিক ছোট্ট ভাইকে এই শর্তে নিজের অংশটা ছেড়ে দিয়ে।

এই বন্দোবস্তই বহাল হ'ল। পাওনাদার জমিদারের প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে বড় ভাইয়ের সঙ্গে একটা বিলি-ব্যবস্থা করে ইউজিন মাকে নিযে এসে প্রকাণ্ড বাড়িটায বসবাস কবতে লাগল। তাবপর বিশেষ উৎসাহের সহিত এবং খানিকটা সতর্কভাবে সে জমিদারী-চালনায় মনোনিবেশ করলে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, বৃদ্ধ মানুষদেবই গোঁড়ামি আব সংস্কাব থাকে এবং তাদের মনোভাবটা হয বেশি মাত্রায বক্ষণশীল। আব যাবা নবীন ও তরুণ তারাই চায নূতনত্ব, পবিবর্তন। কিন্তু কথাটা ঠিক নয়। দেখা গিয়েছে, অপেক্ষাকৃত অল্পবযসী লোকেবাই বেশির ভাগ স্থিতিশীল জীবনের পক্ষপাতী—যারা স্বচ্ছন্দ স্ফূর্তিতে জীবন-যাপন কবতে চায, কিন্তু ভেবে দেখে না এবং ভাববার সময়ও নেই, কি ভাবে জীবনটা কাটানো উচিত। তাই তারা একটি সুপরিচিত জীবন-আদর্শকে অনুসবণ কবে. সেই জীবন-যাত্রার ছক-মাফিক আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে বদলে গড়ে পিটে নেয, যাব সম্বন্ধে তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে।

ইউজিনের বেলাযও তাই হযেছিল। গ্রামে এসে বসবাস করে তার ধারণা এবং লক্ষ্য হ'ল পুবানো দিনের জীবন-প্রণালীকে আবাব ফিরিয়ে আনা। তার বাবা তেমন সাংসারিক, অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না ; তাই পিতামহের আমলের চাল-চলন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কবতে ইউজিন্ বদ্ধপরিকর হয়ে উঠল। এখন সমগ্র জমিদারীতে খেত-খামার, বাগান-বাগিচা, এমন কি বসত বাড়িতেও—সর্বত্রই সে চেষ্টা করতে লাগল পিতামহের জীবনের ধারাটি ফিরিয়ে আনবার জন্যে। অবশ্য বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কিছুটা অদল-বদল করতেই হ'ল। কিন্তু মোটামুটি সেই বিগত দিনের হাল-চাল, অতীত জীবনের সুরটাকে ফুটিয়ে তোলাই হ'ল তার প্রধান উদ্যম এবং কর্তব্য। শান্তি, শৃঙ্খলা, সুনিয়ম এবং সর্বসাধারণের সন্তোষ—এই সবগুলোই হ'ল বড় ব্যাপার।

কিন্তু এভাবে বন্দোবস্ত করতে হলে চাই অশেষ ধৈর্য ও পরিশ্রম। সর্বপ্রথম কর্তব্য হল নানা পাওনাদার এবং ব্যাঙ্কের দেনাগুলো পর পর মিটিয়ে দেওয়া। সেই উদ্দেশ্যে আগে কতকগুলো জমি বিক্রি করা জরুরী হয়ে পড়ল এবং কতকগুলি পুরানো খৎ উসুল করিয়ে নেওয়া আর নতুন খতে সময়ের মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। তা ছাড়া অর্থেরও প্রয়োজন। চারশো বিঘে ফসলের জমি আর চিনির কারখানা সমেত ভালো সেমিয়োনভ তালুকখানা বাঁচাতে হলে চাই কাজের সুবন্দোবস্ত—কিছুটা জমি বিলি করে দেওয়া আর কিছুটা খাসে রেখে জন-মজুর লাগিয়ে ফসল বাড়ানো। এ ছাড়া রয়েছে প্রকাণ্ড বাগানখানা। সেটাকে ভালোমত পরিষ্কার না করলে, দেখাশুনা না করলে শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যাবে, অব্যবহারে জঙ্গল হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু এসবের জন্যে চাই অর্থ, চাই প্রচুর পরিশ্রম। অনেক—অনেক কাজ পড়ে রয়েছে সামনে। কিন্তু ইউজিনও পিছ-পা হবার লোক নয়। দেহে তার প্রচুর শক্তি, মনেও কঠিন, দৃঢ় সঙ্কল্প। বয়েস তার ছাব্বিশ হয়েছে। মাথায় মাঝারি, ডাঁটো চেহারা, আঁট-সাট গড়ন। কুস্তি আর ব্যায়ামে পেশীগুলো পরিপুষ্ট, লোহার মত শক্ত। চেহারা দেখলেই মনে হয় বলিষ্ঠ ব্যক্তি, রক্ত-কণিকায় জীবনী-শক্তির অভাব নেই। মুখ থেকে ঘাড় পর্যন্ত প্রাণশক্তির শোণিত-আভাস। দাঁতগুলো ঝকঝকে পরিষ্কার, চুল আর ঠোঁট মোটা নয় অথচ বেশ নরম আর কুঞ্চিত। তার দেহের একমাত্র ত্রুটি তার দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা। অল্প বয়স থেকেই চশমা ব্যবহার করে চোখের স্বাভাবিক তেজ অনেকটা কমে গিয়েছে। এখন একটা প্যাঁস-নে ছাড়া সে চলতেই পারে না। সর্বক্ষণ পরকোলা ব্যবহার করার ফলে নাকের ওপর বরাবরের মত একটা দাগ বসে গিয়েছে।

এই হ'ল মোটামুটি তার বাইরের চেহারা। আর অন্তরের চেহারা সম্বন্ধে এইটুকু বলা যায় যে, তার সঙ্গে যতই মেলামেশা করা যায়, ততই মানুষটাকে ভালো লাগে। ভিতরকার মানুষটির এইটিই হ'ল বৈশিষ্ট্য। তার মা বরাবরই তাকে বেশি স্নেহ দিয়ে এসেছেন। আর সবাইকে যত না ভালো-বেসেছেন তার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছেন এই ছেলেকে। এখন স্বামীর

মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরের সমস্ত স্নেহ-প্রীতি এই এক জায়গায় শুধু ঢেলে দেন নি, তাঁর সারা জীবনের অর্থ যেন এখানেই নিবদ্ধ করেছেন। শুধু যে মা-ই তাকে ভালোবেসেছেন, তা নয়। স্কুলের, তারপর কলেজের সমস্ত বন্ধু-সঙ্গীরাও তাকে খুব পছন্দ করত। শুধু পছন্দ নয়, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম করত। যারই সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তারই ওপর তার একটা প্রভাব বিস্তার হয়েছে। তার মুখের কথাও অবিশ্বাস করা এক রকম অসম্ভব বললেই হয়। যার মুখে এমন সরল সততার ছাপ, বিশেষ করে যার চোখে এমন নির্মল অকুণ্ঠ চাহনি, তার স্বভাবে কোনো শঠতা বা প্রতারণার আভাস সন্দেহ করা ধারণার বাইরে।

মোট কথা ইউজিনের চরিত্রে একটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ ছিল যেটি তাকে যাবতীয় সাংসারিক কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যে উত্তমর্ণ একজনকে টাকা ধার দিতে অস্বীকার করেছে, ইউজিনকে সে বিশ্বাস না করে পারে নি। গ্রামের কোনো বৃদ্ধ অগ্রণী হোক, নকলনবীশ হোক অথবা কোনো দরিদ্র কৃষকই হোক ইউজিনের সঙ্গে কোনো প্রবঞ্চনার কথা কল্পনাও করতে পারত না। অন্য কারুর সঙ্গে কূট চাল বা ধূর্ত মতলব তারা ফাঁদতে পারে, কিন্তু এমন একজন খোলামেলা, চমৎকার সরল-হৃদয় লোকের আন্তরিক সংস্পর্শে এসে সে চিন্তা তারা ভুলে যেতে বাধ্য হয়।

মে মাসের শেষ। শহরে থাকতে ইউজিন চেষ্টাচরিত্র করে খালি জমি-গুলো বন্ধকী থেকে ছাড়িয়ে নেবার বন্দোবস্ত করেছিল যাতে সেগুলো কোনো কারবারী লোককে বিক্রি করা যায়। সেই ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের কাছ থেকেই ইউজিন কিছু টাকা কর্জ করলে। কেননা, জোত-জমার কাজে রসদের দরকার। চাষের জন্যে চাই হালের বলদ, গরুর গাড়ি আর ঘোড়া। তা ছাড়া, খেত-খামারের ফসল মজুত করবার জন্যে চাই গোলাবাড়ি এবং তার জন্যে টাকার প্রয়োজন তো আছেই।

ইউজিন বন্দোবস্ত করে নিল একরকম। বড় বড় কাঠের গুঁড়ি গাড়ি করে চালান আসতে লাগল। ছুতোরেরাও কাজ আরম্ভ করে দিল। আর সত্তর-আশিখানা গাড়িভর্তি জমির জন্যে প্রচুর সার এনে ফেলা হ'ল। কিন্তু

তবু এইসব কাজকর্ম শুরু হওয়ার মধ্যেও কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব রয়েছে, যেন সব কিছুই সুতোর আগায় ঝুলছে।

এইসব কাজ-কর্ম ও চিন্তায় যখন ইউজিন অত্যন্ত জড়িত ও ব্যস্ত, সেই সময় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি তার মনের মধ্যে জাগতে লাগল। ব্যাপারটা তেমন গুরুতর না হলেও নিতান্ত উড়িয়ে দেওয়াও চলে না। এক-এক সময় রীতিমতই বিশ্রী লাগে।

বয়েস যখন কাঁচা ছিল, ইউজিনের জীবন আর দশজন সাধারণ যুবকের মতই চলেছিল। অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান যুবকরা সাধারণত যেভাবে জীবনকে, নিয়ন্ত্রিত করে থাকে, ইউজিনও সেইভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে চালিয়ে এসেছে। নানা ধরনের স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইতিপূর্বে তার যৌনসম্পর্ক ঘটেছে। ইউজিন উচ্ছৃঙ্খল বা কামুক প্রকৃতির লোক নয়। কিন্তু তাই বলে সাধু-সন্ন্যাসীর মত জিতেন্দ্রিয় পুরুষও নয। স্ত্রীলোকের প্রতি তার যে-আকর্ষণ, অর্থাৎ যে-কারণে ইউজিন মেয়েদের প্রতি ঝুঁকেছে, সেটা একান্তই দৈহিক আকর্ষণ। স্বাস্থ্যরক্ষার খাতিরে, আর তার নিজের ধারণা—মনটাকে খোলা ও পরিষ্কার রাখতে হলে স্ত্রীলোকের দৈহিক সম্পর্ক অপরিহার্য পুরুষের পক্ষে। বয়েস যখন তার বছর ষোলো, তখন থেকে তার যৌন-জীবন শুরু হয় এবং এতদিন চলেছে বেশ সন্তোষজনকভাবেই। বিশেষ কোনো গোলমালে পড়তে হয় নি দৈহিক প্রয়োজনের তাগিদে। কোনো হাঙ্গামা-যে পোহাতে হয় নি ইউজিনকে তার প্রথম কারণ হ'ল ইউজিনের দৃঢ় মন ও সংযম। কোনোও দিনই সে ইন্দ্রিয়ভোগের দাস হয় নি। দেহের ও মনের লাগাম বেশ কড়া হাতেই সে ধরতে জানে। তাই একদিনের জন্যেও সে বিব্রত বোধ করে নি। এ যাবৎ কোনো কুৎসিত রোগ তার দেহকে আশ্রয় করতে পারে নি। ব্যভিচার-প্রবৃত্তিকে শক্ত হাতে দমন করে রাখার ফলে কোনো স্ত্রীলোক তাকে খেলার পুতুল হিসেবে ব্যবহার করতে সাহসও করে নি। অন্ধ মোহে আচ্ছন্ন হবার মত পুরুষ সে নয়। প্রথম জীবনে পিটার্সবুর্গে একটি মেয়ে ছিল তার রক্ষিতা। সেলাইয়ের ব্যবসা ছিল তার। কিন্তু দেখা গেল তার আদুরে ও নাটুকে ভাবটা ক্রমশই বেড়ে চলেছে। ইউজিনের ধাতে এসব পোষাল না।

ঘাড়ে চড়ে বসবার আগেই ইউজিন তাকে সযত্নে ঝেড়ে ফেলে অন্য ব্যবস্থা করে নিল। ব্যক্তিগত জীবনের এই পর্যায়টি মোটামুটি বেশ মসৃণভাবেই গড়িয়ে এসেছে। এ যাবৎ তা নিয়ে ইউজিনকে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হয় নি।

কিন্তু আজ প্রায় ছ'মাস হতে চলল ইউজিন মফঃস্বলে এসে বাস করছে। এ সম্বন্ধে কি যে করা যায় সে বিষয়ে এখনও কিছু ঠিক করে উঠতে পারে নি। অবস্থান্তরে তাকে আজ অনেক দিন দেহকে উপবাসী, নিরুদ্ধ করে রাখতে হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বাধ্যতামূলক আত্মদমনের ফলে শরীর ও মনের ওপর টান পড়তে শুরু হয়েছে। তা হলে কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত কি তা হলে দেহের ক্ষুন্নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে শহরেই ছুটতে হবে? তাই যদি যেতেই হয়— কোথায় কেমন করে তা সম্ভব হবে? এই সব চিন্তাই গত কয়দিন ধরে ইউজিন ইভানিসকে উত্তপ্ত ও বিব্রত করে তুলেছে। ইউজিনের বিশ্বাস এবং ধারণা যে, শরীরের ধর্মকে বহুদিন দাবিয়ে রাখা চলে না আর তার নিজের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজনের তাগিদ অনুভব করছে। তা হলে বর্তমান অবস্থায় সেই প্রয়োজনের খাতিরেই তাকে কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হয়! কিন্তু ইউজিনের এও মনে হ'ল যে, এখন সে তো স্বাধীন নয়, কাজের ও দায়িত্বের চারদিকের বাঁধনে তাকে শক্তভাবেই বেঁধে ফেলেছে। তাই আপনার অজ্ঞাতসারেই আশে-পাশের প্রতিটি যুবতী নারীর পিছু-পিছু তার স্বাধীন দৃষ্টি ঘুরতে লাগল।

নিজের গ্রামে বসে কোনো নিন্দনীয় ব্যাপার বা কেলেঙ্কারী করার পক্ষপাতী নয় ইউজিন। এখানকার বিবাহিতা কিংবা কুমারী মেয়ের সঙ্গে অবৈধ সম্বন্ধ স্থাপন করা ইউজিনের মনঃপূত নয়। লোকমুখে সে শুনেছে যে, এ সমস্ত ব্যাপারে তার বাপ-পিতামহ অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক অন্যান্য জমিদার বা অভিজাত বংশীয় লোকদের মত তাঁরা ছিলেন না। স্থানীয় কোনো স্ত্রীলোক অথবা কৃষকদের মেয়েদের সঙ্গে তাঁরা কোনো-প্রকার সংস্রবে আসেন নি। তাই ইউজিনও স্থির করেছিল সেও নিজের গ্রামে বসে এই রকম কোনো ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়বে না।

কিন্তু যত দিন যায় ততই দেহের দাবী বাড়তে থাকে। তখন ইউজিন ভেবে দেখলে যে, কাছাকাছি কোনো শহরে এ ধরনের ব্যাপার জানাজানি

হয়ে পড়লে বিপদের আশঙ্কা বেশি। ভূমি-দাস প্রথা উঠে গিয়েছে, মুখ বুজে সহ্য করবার পাত্রও আজকাল কেউ নয়। তার চেয়ে এখানে গ্রামেই ভালো। ইউজিন অনেক ভেবে স্থির করলে—হ্যাঁ, তাই ঠিক। গ্রামের বাইরে অজানা জায়গায় জড়িয়ে পড়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে এটা অবিশ্যি দেখতে হবে, কেউ জেনে না ফেলে। কারণ ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেলে অসম্ভ্রমের সীমা থাকবে না। ইউজিন এই ভেবে মনকে বোঝালে যে, বর্তমানে তার এ ধরনের চেষ্টা মোটেই অন্যায় নয়। কেননা, সে তো কামপ্রবৃত্তির দাস হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ চরিতার্থ করতে যাচ্ছে না। যা কিছু করতে যাচ্ছে, সেটা স্বাস্থ্যেরই খাতিরে, নিছক শরীরধর্ম পালনের জন্যে।

সঙ্কল্প স্থির হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু ইউজিন যেন আরো বেশি চঞ্চল, আরো অস্থির হয়ে উঠল। যখনই সে গ্রামের বয়োবৃদ্ধ বা মোড়লের সঙ্গে অথবা চাষী-মজুর, ছুতোরদের সঙ্গে কোনো কথাবার্তা বলত, তখনই ঘুরে ফিরে সেই একই কথায় এসে পৌঁছুত অর্থাৎ স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গ। আর স্ত্রীলোকের কথা একবার উঠলে সে প্রসঙ্গ থামাতে চাইত না। এখন থেকে গ্রামের মেয়েদের ওপর নজরটা তার আরো বেশি করে যেন প্রখর হয়ে উঠল, চাহনিটাও হ'ল তীক্ষ্ণতর।

২

মনে মনে কোনও একটি বিষয়ের নিষ্পত্তি করা এক, আর তাকে কাজে পরিণত করা আর এক জিনিস। শুধু স্থির করলে কি হবে? কাজে অগ্রসর হওয়া চাই। কিন্তু সেখানেই বাধে মুস্কিল। কোনোও স্ত্রীলোকের কাছে এমনি একটি প্রস্তাব নিয়ে নিজে থেকে এগিয়ে যাওয়া? অসম্ভব। কার কাছে? কোথায়? নাঃ—এ কাজ আর কোনোও লোকের মধ্যস্থতায় সারতে হবে। কিন্তু সেই তৃতীয় ব্যক্তিটি কে—যাকে এসব কথা খুলে বলা যায়?

একদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়ল ইউজিন। তৃষ্ণার্ত হয়ে জলের সন্ধানে জঙ্গল-মহালের এক চৌকিদারের কুটীরে এসে সে পৌঁছাল।

চৌকিদার পুরানো পরিচিত লোক—তার বাবার শিকার-সঙ্গী। সাবেক আমলে বহুবার শিকারের খোঁজে সে ইউজিনের বাবার সঙ্গে ঘুরেছে, বন তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। আজ ওর সঙ্গে বসে বসে ইউজিন অনেকক্ষণ গল্প করলে। এই সরল বনপ্রহরী কত কথাই শোনালে তাকে—শিকারের উত্তেজনা আর স্ফূর্তি-আমোদের কত কাহিনী। বসে বসে, গল্প শুনতে শুনতে ইউজিনের মাথায় হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল—আচ্ছা। এই ছোট্ট ছাউনি ঘরে কিংবা বনের মধ্যেই কোন নিভৃত জায়গায় সে ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? কিন্তু কি ভাবে সে বন্দোবস্ত করা যায়, তার হদিস্ পায় না ইউজিন। বুড়ো দানিয়েল কি রাজী হবে ভার নিতে? হয়তো তার এ-প্রস্তাব শুনে আশ্চর্য, হতভম্ব হয়ে যাবে। আর ইউজিন নিজে? কথাটা পেড়ে শেষকালে যদি প্রত্যাখ্যান জোটে কপালে, তাহলে লজ্জার আর পরিসীমা থাকবে না। কিংবা এমনও তো হতে পারে—বুড়ো চট্ করে সহজেই রাজী হয়ে যাবে।

বুড়ো দানিয়েল অনেকটা আপন মনেই উৎসাহিত ভাবে গল্প করে যাচ্ছে, আর ইউজিন খানিকটা অন্যমনস্কভাবে শুনে যাচ্ছে।

দানিয়েল বলছিল, "একবার সত্যিই শিকারে ক্লান্ত হয়ে আমরা দূরে গিয়ে পড়েছিলুম। বিশ্রামের জন্যে সেই গ্রামের পাদ্রি-গিন্নীর মেঠো ঘরখানায় গিয়ে আশ্রয় নিই। ঐখানেই ফিয়োদর জাখারিচ প্রিয়ানিশনিকভের জন্যে একটি মেয়েমানুষ যোগাড় করে আনি।"

ইউজিন মনে মনে বলে উঠল, "এবার ঠিক হয়েছে!"

দানিয়েল বুড়ো কি যেন একটু ভেবে বললে, "আপনার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর কিন্তু উঁচু দরের লোক ছিলেন। এসব ছ্যাবলামির ব্যাপারে তিনি কখনও নামতেন না।"

"এর কাছে দেখছি সুবিধে হবে না।" ইউজিন মনে মনে বলল চিন্তিত-ভাবে। তবু পরখ করবার জন্যে জিজ্ঞাসা করল দানিয়েলকে—"আচ্ছা, এসব কুৎসিত ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়ালে কেমন করে?"

"কেন এর মধ্যে খারাপটা কি হ'ল? মেয়েটি আনন্দের সঙ্গেই রাজি হয়ে গিয়েছিল আর ফিয়োদর জাখারিচ—তিনিও খুবই খুশি এবং তৃপ্ত হয়েছিলেন,

মাঝখান থেকে আমি এক রুবল বকশিস পেলুম। তা ছাড়া, ফিয়োদরের কি দোষ বলুন? চটপটে স্ফূর্তিবাজ লোক—একটু-আধটু টানেও……"

"এইবার কথাটা পাড়া যেতে পারে—" ইউজিন আশ্বস্ত হয়ে ভাবল এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করল।

"কি জানো দানিয়েল—আমার এক-এক সময়ে মনে হয় অসহ্য—মানে, এভাবে নিজেকে চেপে রাখা……"

ইউজিন বুঝতে পারে, কথাগুলো বলতে বলতেই সে লজ্জায় আর সঙ্কোচে লাল হয়ে উঠছে।

দানিয়েল শুধু একটু হাসে। ইউজিন আবার বলে, "আমি তো সাধু-সন্ন্যেসি নই। তা ছাড়া আগের অভ্যেস……"

ইউজিন মনে মনে ভাবে—কেন বোকার মতন এসব কথা বলছে! কিন্তু দানিয়েলের মুখে মৌন সম্মতির লক্ষণ দেখে আশ্বস্ত বোধ করে।

"আচ্ছা মানুষ তো আপনি।" দানিয়েল বলে ওঠে। "আমাকে আগে বলতে হয়—তাহলে এতদিনে একটা ব্যবস্থা করে ফেলা যেত। সে যা-ই হোক—কাকে চাই, আমাকে শুধু একটু জানিয়ে দেবেন।"

"ওঃ! তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। আমার কাছে সবই সমান—অবিশ্যি কানা-কুৎসিত না হলেই হ'ল। তার রোগ-টোগ যেন না থাকে।"

"নিশ্চয়ই। তা তো বটেই। আচ্ছা—দেখি……" দানিয়েল নীরবে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, "ওহোঃ, ঠিক হয়েছে। এইবার মনে পড়েছে—বেশ খাসা জিনিস……"

ইউজিন ইতিমধ্যে আবার লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠেছে।

"এমন সরেস মেয়ে এ অঞ্চলে মেলা দুষ্কর"—দানিয়েল ফিস্ ফিস্ করে বলে। "জানেন, গেল বছর ওর বিয়ে হয়েছে। আর স্বামীটাও এমন! এখনও পর্যন্ত কোনও ছেলে-পুলে হ'ল না। ভেবে দেখুন—ওর দাম কত—অবিশ্যি যে চায়, তার কাছে!"

অপ্রস্তুত হয়ে লজ্জায় ভ্রূকুঞ্চিত করে ইউজিন। বলে—'নাঃ, নাঃ—ও সবের দরকার নেই। আমি চাই, মানে—বরং এমন যদি কেউ থাকে—

যার শরীরে কোনোও রোগের বালাই নেই, আর যেখানে হাঙ্গাম-হুজ্জুৎ পোয়াতে হবে না। মনে করো—এমন কোনোও স্ত্রীলোক, যার স্বামী বিদেশে থাকে কিংবা সৈন্যদলে কাজ করে বা অমনি কিছু! মোট কথা ঐ নিয়ে কোনও হৈ-চৈ আমি পছন্দ করি না।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি। আগেই আমি সেটা ঠাউরেছিলুম। ওই স্টীপা-নিডাকেই আন্‌বো শেষ পর্যন্ত আপনার কাছে। ওর স্বামী থাকে সদরে,—আর্মির লোকের মতই। বড় একটা বাড়ি আসে না। আর চমৎকার মেয়ে স্টীপানিডা। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, নীরোগ। ভারি ছিম্‌ছাম্। মনে ধরবে আপনার, এ আমি বলে দিলুম। দেখবেন আপনি—আপনার তৃপ্তিও হবে। এই তো সেদিন বল্‌ছিলুম ওকে—তুমি একটু আধটু বেরোও না কেন? নিজেকে অতো গুটিয়ে রাখলে কি চলে? কিন্তু ও কি বলে জানেন?"

"তা হলে, কখন—কবে?" ইউজিন কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত করে আনে।

"কালই—আপনি যদি বলেন, মানে যদি আপনার মর্জি হয়। আমি তো ঐ পথেই যাচ্ছি তামাক কিনতে। যাবার সময় একবার ডাক দেবো'খন। এখানে আসবো, ধরুন কাল দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে। নয়তো রান্নাঘরের পিছনে ছোট্ট বাগানটায়, যেখানে স্নানের ঘরটা দেখা যাচ্ছে,—ওখানেও থাকতে পারি। যা বলেন আপনি। দুপুর বেলায়ই ভালো। কেউ থাকে না তখন এদিকটায়। খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই একটু গড়ায়, ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময়টা বেশ নিরিবিলি…."

"আচ্ছা, ঐ কথাই রইল।"

ঘোড়ায় চড়ে বাড়ি ফিরল ইউজিন। মন তার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, প্রবল একটা উত্তেজনায় অস্থির ও চঞ্চল। সে ভাবতে লাগল: "আচ্ছা, এর পর কি দাঁড়াবে? চাষার ঘরের মেয়ে কেমনতর হবে, কে জানে? ধরো, দেখতে সে যদি অত্যন্ত বিশ্রী হয়,—কুৎসিত, স্পর্শের অযোগ্য! তা হলে? না না, তা হতেই পারে না। দেখতে-শুনতে তো ভালোই, দানিয়েল বলল।"

রাস্তায় আসতে আসতে আশে-পাশের কয়েকটি দরিদ্র কৃষক ঘরের মেয়েকে

বিশেষভাবেই লক্ষ্য করে ইউজিন আশ্বস্ত করে আপনার উত্তেজিত মনকে। তবু আবার মন সন্দেহ-দ্বিধায় দুলে ওঠে। ভাবে, "কিন্তু তাকে বলবো কি করে? করবোই বা কি?"

সারাটা দিন এই রকম অস্থিরভাবে কাটল ইউজিনের। কিছুতেই যেন আশ্বস্থ হতে পারছে না। পরের দিন দুপুর বেলায় সে গেল সেই জঙ্গলের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে। দানিয়েল দাঁড়িয়েছিল প্রতীক্ষায়, দরজার ঠিক সামনেই। চোখাচোখি হতেই নীরব, অর্থপূর্ণ চাউনিতে সে মাথা নেড়ে বনের দিকে, ইঙ্গিত করল।

একটা গরম রক্তের স্রোত যেন হঠাৎ গিয়ে ধাক্কা দিল ইউজিনের হৃৎপিণ্ডে। এই আকস্মিক আলোড়নটা বেশ সচেতনভাবেই সামলে নিল ইউজিন। তারপর ধীরে ধীরে এগিযে চলল রান্নাঘরের পেছনে ছোট বাগানটার দিকে।

নির্জন বাগান, কেউ কোথাও নেই।

সেখান থেকে গেল স্নানের ঘরেব দিকে। সেখানেও কারুর পাত্তা নেই। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল ইউজিন। আশে-পাশে উঁকি মেরে দেখল, কেউ আছে কিনা। ঘর খালি। আবার বেরিয়ে এল, এদিক ওদিক চেয়ে দেখল সে। তারপর হঠাৎ কানে ভেসে এল একটা শব্দ—মট করে ছোট গাছের ডালভাঙ্গার শব্দ। শব্দটা লক্ষ্য করে চারদিকে দৃষ্টি ঘোরাতেই নজরে পড়ল—দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। দাঁড়িযে আছে একটু দূরেই—ঝোপের মধ্যিখানে, ছোট খাদটার ওপারে।

খাদটা পার হয়ে যেন ছুটেই চলল ইউজিন। জাযগাটা কাঁটাগাছে ভর্তি। ইউজিন লক্ষ্য করে নি। জোরে যেতে যেতে কাঁটাগুলো গায়ে ফুটতে লাগল ইউজিনের। মাঝপথে নাক থেকে খসে পড়ল প্যাঁস্-নে চশমাটা। তবু ঢালু জায়গাটার গা বেয়ে অনিশ্চিত পদে ছুটেই চলল একরকম, যতক্ষণ না ঐ উঁচু ঝোপটার কাছে পৌঁছানো যায়।

পরনে মেটে-লাল রঙের স্কার্ট। তার ওপর ধবধবে শাদা, চিকনের কাজ করা একটি এপ্রন বাঁধা, কোমরের সঙ্গে। মাথায় টকটকে লাল একখানা রেশমি রুমাল। দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি, খালি পায়ে। তাজা সরস বৃন্ত যেন।

আঁট-সাট গড়ন আর সুঠাম দেহশ্রী নিয়ে একটি সতেজ ফুটন্ত দেহবল্লরী। মুখে লাজ-নম্র স্মিত হাসির রেখা।

প্রথমে সে-ই কথা বললে : "ওধার দিয়ে তো একটা পথ আছে—ঘুরে এসেছেন এইখানে। ঐ পথ দিয়ে এলেই পারতেন।"

তারপর একটু থেমে আবার বললে, "আমি কিন্তু আগেই এসেছি! অনেকক্ষণ হ'ল দাঁড়িয়ে আছি।"

ইউজিনের মুখে কোনও কথা বেরুল না। স্থির ও ধীর পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল শুধু। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন পরখ করে নিল একবার। তারপর গায়ের ওপর রাখল নিজের হাত।

প্রায় মিনিট পনেরো-কুড়ি পরে হ'ল ছাড়াছাড়ি।

এদিক ওদিক নজর করে খুঁজতেই পাওয়া গেল পড়ে-যাওয়া প্যাস্‌নে চশমা-জোড়াটা। কুড়িয়ে নিয়ে ইউজিন চলল দানিয়েলের সন্ধানে।

দেখা হওয়া মাত্রই দানিয়েল প্রশ্ন করলে : "হুজুরের আশ মিটেছে তো?"

জবাব এড়িয়ে ইউজিন তার হাতেব মধ্যে গুঁজে দিল একটা রুবল।

তারপর ফিরতি মুখে বাড়ি।

হ্যাঁ, যথেষ্ট তৃপ্ত হয়েছে ইউজিন। কেবল, প্রথমটায় গভীর একটা লজ্জাবোধ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তারপর সে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেল। এখন আর কোনোও গ্লানি বোধ হচ্ছে না।

ব্যাপারটা বেশ সহজেই নিষ্পন্ন হয়ে গেল। কোনও হাঙ্গামা পোয়াতে হয় নি তাকে। আর সব চেয়ে যেটা নিশ্চিত আরামের কথা, তা হ'ল এই যে, বর্তমানে ইউজিন বেশ সুস্থ বোধ করছে। শরীরে এসেছে স্বাচ্ছন্দ্য, যেন অনেক দিন পরে সে খুঁজে পেল স্বাভাবিক প্রশান্তির দৃঢ়তা।

আর মেয়েটি? তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই ভাবে নি ইউজিন। ভালো করে তার অবয়বগুলো খুঁটিয়ে দেখবার মতন অবকাশ ও মনের অবস্থা ছিল না ইউজিনের। কেবল এইটুকু জে আর নিজে দেখে সে নিশ্চিত এবং তৃপ্ত যে, মেয়েটির শরীর নীরোগ, সতেজ আর পরিচ্ছন্ন। দেখতে কিছু খারাপ

নয়—যাতে মনের ইচ্ছাশক্তি গুটিয়ে যায়। বেশ সরল প্রকৃতির মানুষ, অন্ততঃ কোনোও ছলা-কলার ধার ধারে না।

"কার বউ কে জানে!" আপন মনেই শুধায় ইউজিন। "ও হো! পেশ্‌নিকভের বউ, দানিয়েল তো তা-ই বলেছিল। কিন্তু কোন্‌ পেশ্‌নিকভ? ও নামে তো দু'ঘর আছে এই গাঁয়ে। হয়তো, বুড়ো মাইকেলেরই ছেলের বউ হবে। হ্যাঁ, তাই তো! বুড়োর ছেলে তো মস্কো শহরেই থাকে। কোনো এক সময়ে দানিয়েলের কাছে পুরো খবর সব নিতে হবে।"

৩

মফঃস্বলে পল্লীজীবনের যেটা এতদিন ধরে ছিল সবচেয়ে বড় অন্তরায় এবং অসুবিধা,—অর্থাৎ বাধ্য হয়ে জোর-করা আত্মসংযমের অভ্যাস, সেটার প্রয়োজন আর রইল না। ইউজিনেব চিত্তে এখন আর কোনো উদ্বেগ নেই। মনের স্থৈর্য এবং স্বাধীন চিন্তায় এখন আর কোনো ব্যাঘাতই ঘটছে না। সহজ এবং সুস্থভাবে এখন আবার নিজের সমস্ত কাজকর্মে মন দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই, যে বৈষয়িক ব্যাপারে ইউজিন স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়িত করেছে এবং তার আনুষঙ্গিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে, সেটা মোটেই সহজ নয়। রীতিমত কঠিন কাজ। কখনো মনে হত ইউজিনের যে, শেষ পর্যন্ত এ কাজ তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। হয়তো অবশেষে তাকে তালুকটি বিক্রি করে ফেলতে হবে। তাহলে তো তার এতদিনের অক্লান্ত চেষ্টা পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াবে। তখন দাঁড়াবে এই যে, সে কৃতকার্য হতে পারল না,—যে গুরুভার ভবিষ্যতের আশায় একদিন আপন হাতে সে তুলে নিয়েছিল, তাতে সমাপ্তির ছেদ টানবার মতো তার সামর্থ্য আর নেই। ভবিষ্যতের এই চিন্তাই তাকে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুলল। একটা গোলমালের জের মিটতে না মিটতেই, আর একটা গোলমালের সূত্রপাত হয়। শুরু হয় নতুন করে দুশ্চিন্তা, অভাবিতের আকস্মিক আবির্ভাবে।

জমিজমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে লিপ্ত হওয়ার পর থেকে একটা না একটা

দুর্ঘটনা লেগেই আছে। পিতার দেনার দায় একটির পর একটি হুড়মুড় করে এসে তার ঘাড়ে পড়তে লাগল,—যে-সমস্ত ঋণের কথা সে তো জানতোই না, কল্পনাও করে নি। সে স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, তার বাবা ডাইনে-বাঁয়ে, সব জায়গাতেই ধার করেছিলেন। যে মাসে তখন দেনা-পাওনা সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছিল, ইউজিন ভেবেছিল এবং আশাও করেছিল যে, জমিদারির খুঁটিনাটি তার নখদর্পণে এসে গেছে। কিন্তু হঠাৎ, গ্রীষ্মের মাঝা-মাঝি সময়ে, একখানা চিঠি তার হস্তগত হ'ল। তাই থেকে বোঝা গেল যে, ইসিপোভা নামে এক বিধবার কাছে তার বাবার বারো হাজার রুবল পরিমাণের এক দেনা এখনও বাকী রয়ে গেছে, মেটানো হয় নি। অবিশ্যি এ দেনার প্রমাণ হিসেবে কোনো হাতচিঠা ছিল না। ছিল একখানা সাধারণ রসিদ মাত্র,—যেটা ইউজিনের উকিল মহাশয় বললেন অনায়াসেই অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ-অভাবে রসিদখানাকে-যে অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দেওয়া যায়, মাত্র এই কারণেই পিতৃকৃত ঋণকে অস্বীকার করবার মতো বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি ইউজিনের মাথায় এল না। কেবল একটা জিনিস সে নিশ্চিত করে জানতে চায় যে, এ দেনা তার বাবা সত্যই করে গেছেন কিনা।

একদিন যথানিয়মে খাবার টেবিলে বসতে গিয়ে সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, এই কালেবিয়া ইসিপোভা নামে স্ত্রীলোকটি কে ?'

'কে ? ইসিপোভা ? তোমার ঠাকুর্দা তাকে মানুষ করেছিলেন। কিন্তু কেন বল তো ?'

ইউজিন চিঠির সব কথাই খুলে বলল মাকে।

'কিন্তু আমি আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে, এই টাকা আবার চাইতে তার একটুও লজ্জাবোধ হ'ল না! তোমার বাবা তো তার জন্যে অনেক কিছু করে গেছেন!'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, মা, যে, এ টাকা কি সত্যই আমরা তাঁর কাছে ধারি ?'

'তা—সে এখন সঠিক কি করে ব'. বলো ? তবে একে ঋণ বলা যায় না। তোমার বাবার ছিল দয়ার শরীর······।'

'বুঝলুম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, বাবা কি এটা ধার মনে করেছিলেন?'

'তা আমি বলতে পারি না,—মানে, জানি না। খালি এইটুকু জানি আর বুঝতে পারছি যে, ও-দেনাটা বাদ দিলেও এমনি তোমার পক্ষে চালানো খুবই কষ্টকর ব্যাপার·····'

ইউজিন বেশ বুঝতে পারল যে, মেরী পাভ্‌লোভ্‌না কি যে বলবেন, তা বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই ছেলের মনোভাব আঁচ করে কথা বলছেন মাত্র।

ছেলে জবাব দিল, 'তুমি যেটুকু বললে, মা, তাই থেকে অন্ততঃ বোঝা যায় যে, টাকাটা শোধ করতেই হবে। কালই যাব তার ওখানে। কথা বলে দেখবো একবার, দেনাটাকে আবও কিছুদিন স্থগিত রাখা যায় কি না।'

'তোমার অদৃষ্ট। তবে তুমি যা বলছ ও করতে চাইছ, আমার মনে হয় সেইটাই সব চেয়ে ভালো। আব তাকে জানিযে দিয়ো যে, সবুর তাকে করতেই হবে।'

মেরী পাভ্‌লোভ্‌না এইটুকু বলে ক্ষান্ত হলেন। মনে তাঁর অসীম শান্তি। ছেলে-যে বিবেক বুদ্ধিতে এই সিদ্ধান্ত করেছে, তাতে তাঁর যথেষ্ট গর্ব বোধ হ'ল।

ইউজিনের বর্তমান সাংসারিক অবস্থা সতিই তাকে উভয় সঙ্কটে ফেলেছে। আরও মুস্কিল হয়েছে এই যে, মা রয়েছেন তার সঙ্গে। তিনি ঠিক অনুমান করতে পারছেন না ছেলের দুরবস্থা। সারাটা জীবন তিনি কাটিয়েছেন এক ভাবে। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য আর বিলাসের আবহাওয়ায় অভ্যস্ত জীবন গড়ে তুলেছে তাঁর স্বতন্ত্র মন আর দৃষ্টি। তাই তিনি ধরতেই পারেন না ছেলে কি গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর মাথাতেই ঢোকে না কোনো বিপদ, অথবা বিপর্যয়ের পূর্বাভাস। যদি এমন কোনোদিন আসে, আজই হোক আর কালই হোক, যখন অবস্থার ফেরে সংসারে আশ্রয় বলতে আর কিছুই থাকবে না, মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুও মিলবে না, তখন ভিটেমাটি সব কিছু বিক্রী করে ছেলেকে চলে যেতে হবে। আর ইউজিনের নিজের রোজগার অথবা মাইনে—তা' বড় জোর বছরে হাজার দুই রুবল—এরি উপরে

নির্ভর করে ছেলের আশ্রয়ে তাঁকে বাকি জীবন কাটাতে হবে,—এই সব কথা তাঁকে মোটেই চিন্তিত বা উদ্বিগ্ন করে না। এই নিশ্চিত সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে হলে একমাত্র উপায় হ'ল কঠিন শৃঙ্খলা—সব কিছু খরচ কমানো এবং বাঁচিয়ে চলা। এই সহজ বাস্তব সত্য কথাটি তিনি বুঝেও বোঝেন না। তাই তিনি ধারণা করতে পারেন না ইউজিন কেন আজকাল এত হুঁশিয়ার হয়ে উঠেছে,—কেন সে সমস্ত ব্যাপারে, মালী-চাকর-সহিসদের মাইনে, এমন কি খাই-খরচ প্রভৃতি সামান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও এতটা সতর্ক হয়ে চলছে। তা ছাড়া আর পাঁচজন বিধবার মতন স্বর্গত স্বামী সম্বন্ধে তাঁর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। যদিও পতির জীবদ্দশায় স্ত্রীর এতোখানি নিষ্ঠা দেখা যায় নি, তবু বৈধব্যে সে মনোভাব এখন সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়েছে। তাই স্বামী যা করে গেছেন, যে বিধি-ব্যবস্থা চালু করে গেছেন, তা যে ভুল বা অন্যায় হওয়া স্বাভাবিক কিংবা তার কোনো রদ-বদল হতে পাবে, একথা তিনি মনেও স্থান দিতে পারেন না।

অনেক ভেবে ও কষ্ট করে সংসার চালায় ইউজিন। মাত্র দু'জন কোচম্যান ও সহিস দিয়ে আস্তাবল পরিষ্কার আর দু'জন মালীর সাহায্যে বাগান-বাড়ি আর সংলগ্ন জমি ও বাগিচাগুলো পরিচ্ছন্ন রাখা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

মেরী পাভলোভনা কিন্তু সরল মনেই বিশ্বাস করেন যে, তিনি আদর্শ জননী। ছেলের মুখ চেয়ে তিনি অনেকখানি আত্মত্যাগ করেছেন। বুড়ো পাচক যা রেঁধে দেয় তাই তিনি অম্লান বদনে মুখে তুলছেন। বাগানটা ভালো ভাবে পরিষ্কার হয় না, সরু পথগুলো আগাছায় ভরে গেছে। বাড়িতে একটাও খানসামা নেই, মাত্র একজন বালক-ভৃত্য। এতে সম্ভ্রম রক্ষা করা দায়। তবু, এত অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তো কোন নালিশ জানান না। নানা অসুবিধার মধ্যে বাস করেও ছেলেকে কোন অভিযোগ না করে তিনি তো মায়ের যথাকর্তব্যই পালন করছেন।

তাই এই নতুন দেনার খবর যখন পাওয়া গেল, ইউজিন দেখল সর্বনাশ। তার সব কিছু আশা-ভরসা, পরিকল্পনা বাতিল হবার যোগাড় ও দেনা মিটিয়ে আবার সমস্ত গুছিয়ে নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার মতন সামর্থ্য এবং

অবকাশ আর মিলবে কি না সন্দেহ। মেরী পাভলোভনা কিন্তু অত-শত বুঝলেন না। তিনি এটাকে নিলেন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা হিসেবে, যে ঘটনার মধ্যে দিয়ে ইউজিনের সচ্চরিত্র, তার আন্তরিক মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। তার বেশি কিছু নয়। তা ছাড়া, ছেলের সাংসারিক অবস্থা সম্বন্ধে মায়ের মনে কোন দুশ্চিন্তার বালাই ছিল না। তিনি ভাবতেন আর মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করতেন যে, ইউজিনের বিয়ে হবে একটা মস্ত সার্থক ব্যাপার। সে বিয়েতে ঘরে আসবে অনেক ধন-দৌলত, আসবে প্রতিষ্ঠা। তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন দশ-বারো ঘর ভদ্র পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে, যারা এই বংশে মেয়ের বিয়ে দেওয়া সৌভাগ্য বলেই মনে করবে। তাই আর দেরি না করে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ইউজিনের বিয়েটা চুকিয়ে ফেলাই ভালো।

মেরী পাভলোভনা ভাবতে থাকেন।

৪

ইউজিন নিজেও ভাবে। তবে মা যেমন করে ভাবেন আর দেখেন বিয়ে-ব্যাপারটা, তেমন করে কখনোই নয়। বিবাহ জিনিসটাকে সাংসারিক সুবিধা ও সচ্ছলতার কৌশল বা উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে বাধে তার রুচি ও বিবেকে। বিয়ের সাহায্যে নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেওয়া অথবা বর্তমানে কোনো উন্নতির ব্যবস্থা করে নেওয়া, একথা ভাবতেও তার মন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ইউজিনের মনোগত অভিপ্রায় এবং কামনা হ'ল কাউকে ভালোবেসে সম্মানজনক প্রস্তাবে তাকে বিয়ে করা। যেসব মেয়েদের সঙ্গে তার পূর্বেই আলাপ ছিল কিংবা যাদের সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়েছে, সম্প্রতি মনে মনে নিজেকে তাদের সঙ্গে তুলনা করত, বিচার করত আপন মনেই পরস্পরের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা নিয়ে। এদিকে কিন্তু স্টীপানিডার সঙ্গে তার অবৈধ সম্পর্কটা তখনও চলেছে, এমন কি একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তে এসে দাঁড়িয়েছে। এতখানি যে দাঁড়াবে, সে কথা পূর্বে

ইউজিন ভাবে নি, অনুমানও করতে পারে নি। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এখন তাই।

ব্যভিচারের প্রতি স্বাভাবিক ঝোঁক ইউজিনের কখনোই ছিল না। তার ওপর চরিত্রে ও প্রকৃতিতে সে কামুক স্বভাবের মানুষ নয়। যে জিনিসটা সে খারাপ বলে ভাবত বা জানত, সে কাজটা গোপনে লুকিয়ে-চুরিয়ে করা তার ধাতে নেই। তাই প্রথম প্রথম স্টীপানিডার সঙ্গে গোপন মিলনের ব্যবস্থা সে নিজে থেকে কোন দিনই করতে পারে নি। প্রথম দিন স্টীপানিডার সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর ইউজিন ভেবেছিল, এই শেষ! কিন্তু দেখা গেল, তা হয় না। কিছুদিন যেতে না যেতেই ইউজিন লক্ষ করলে যে, সেই একই কারণে একই ধরনের একটা দৈহিক অস্বস্তি আর মানসিক অতৃপ্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে, তাকে পীড়িত করে তুলেছে।

ইউজিন এবার স্পষ্টই বুঝতে পারল আকর্ষণটা কোথায় এবং কী ধরনের। যে অস্বস্তিকর চাপা গুমোটে মন আর শরীর উদ্ব্যস্ত হচ্ছে, সেটার উৎপত্তি হ'ল একজন বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ আবেদন। সে আকর্ষণ নৈর্ব্যক্তিক নয়, দেহ-নিরপেক্ষও নয়। সে আকর্ষণ ইঙ্গিত-বাহন। সঙ্গে টেনে আনছে সেই উজ্জ্বল কালো চোখের চঞ্চল তারা দু'টি, সেই ভরাট গলার ঈষৎ কম্পমান আওযাজ—'কতক্ষণ হ'ল দাঁড়িযে আছি!' মনে পড়ে যাচ্ছে বারে-বারেই সেই তাজা, আঁট-সাঁট জীবন্ত তনুদেহেব পরিচিত সৌরভ। চোখের সামনে যেন ভাসতে থাকে কোমরে আঁট-করে বাঁধা সেই ছোট গাউনের বুকের কাছটায় একটু উঁচু হযে ওঠা সুডৌল স্তনাগ্র-চূড়ার নিটোল আভাস। আর চারিদিকে ঝক্‌ঝকে হলুদ তবক-মোড়া সোনালী রোদের থর-থর ঝাঁঝের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সেই ছায়াচ্ছন্ন নিভৃত হেজেল ও মেপ্‌ল গাছের ঝোপ।

তাই নিতান্ত লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে এলেও মন তার আবার ছুটল। ইউজিন আবার এগিয়ে গেল বুড়ো দানিয়েলের সন্ধানে।

আবার সেই দুপুরবেলাতেই ধার্য হ'ল পরস্পরের গোপন অভিসার, সেই ছোট্ট ঘন বনের মাঝখানে পুরানো সঙ্কেতস্থলে।

এইবার ইউজিন আরো ভালো করে মেয়েটিকে নজর করবার অবকাশ পেল। সুযোগ ও সুবিধামত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল তাকে। মোটের ওপর ভালোই লাগল তার সবকিছু। মেয়েটির আকর্ষণ এবং মাদকতা অস্বীকার করা চলে না।

তারপর ইউজিন তার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল, জিজ্ঞাসা করল তার স্বামীর কথা। দেখা গেল ইউজিন যা ভেবেছিল, তাই-ই ঠিক। তার স্বামী বুড়ো মাইকেলেরই ছেলে বটে। মস্কো শহরে অনেকদিন যাবৎ আছে। সেখানে কোচম্যানের কাজ করে।

"আচ্ছা—এটা তুমি কেমন করে··· ?" ইউজিন প্রশ্ন করে ফেলে ইতস্তত করে। মানে সে জিজ্ঞাসা করতে চায়, সত্যি কথা জানতে চায়, কেমন করে স্টীপানিডা তার স্বামীর প্রতি এমন অবিশ্বাসী হতে পারল।

"কি কেমন করে ?" পাল্‌টা জবাবে প্রশ্ন করে বসে স্টীপানিডা।

মেয়েটি খাসা সপ্রতিভ। রীতিমত চালাক এবং চটপটে। মনে মনে তারিফ করে ইউজিন। আবার শুধোয়ঃ "আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো—তুমি কেন আমার কাছে এলে,—মানে আসো ?"

"বাঃ, আসব না !" লঘু কৌতুকের শুভ্র হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে স্টীপানিডা। বলে, "সে-ও কি সেখানে মজা করে না, স্ফুর্তি করে না ? আর আমার বেলায় যত দোষ ?"

স্টীপানিডার উত্তেজিত কথা বলবার ভঙ্গীটুকু খুব মনোযোগ সহকারে লক্ষ করছিল ইউজিন। ভারি মিষ্টি ও সুন্দর লাগল তার সরল অথচ কপট অভিমান-মিশ্রিত জবাব, তার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, আর ঈষৎ উদ্ধত গ্রীবার কমনীয় ছাঁচটুকু।

সে যাই হোক, ইউজিন নিজে থেকে এবারে এগিয়ে এল না। নিজে থেকে চাইল না এবং স্থিরও করল না এর পরে দু'জনে আবার কোন দিনে এসে ঐ জায়গায় মিলিত হবে। এমন কি, স্টীপানিডা যখন আপনা হতেই প্রস্তাব করল যে, এর পর থেকে দু'জনের এমনি দেখা-সাক্ষাৎ চালুকো বুড়ো দানিয়েলের সাহায্যের আর দরকার নেই, ওকে তার মোটেই

ভালো লাগে না, ওর মধ্যস্থতার প্রয়োজনটা কিসের -তখনও ইউজিন রাজী হ'ল না।

আসল কথা এই—ইউজিনের মনের অন্তস্তলে ইতিমধ্যে একটা সূক্ষ্ম দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে। মনে মনে সে আশা করছিল, এইটেই যেন শেষ মিলন হয়। পরস্পরের আর দেখা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্টীপানিডাকে তার পছন্দই, মোটেই খারাপ লাগছে না। বরঞ্চ রীতিমত আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে ইউজিন। তবু তাদের দু'জনের এই গোপন সম্পর্ক অবৈধ, নিশ্চয়ই। কিন্তু অনিবার্য কারণে যখন সেটা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে, তার মধ্যে এমন কিছু দূষণীয় ব্যাপার বোধ হয় নেই।

তবু—তবু মনের কোণে, জাগ্রত সত্তার গভীরে ঘনিয়ে উঠেছে একটা অপ্রসাদ, একটা অহেতুক অস্বস্তির মলিন ছায়া। যেখানে ইউজিন একলা, আপন চৈতন্যের সামনে মুখোমুখী, সেখানে সে কঠিন বিচারক। বিবেকের নিরপেক্ষ বিচারে তাই তার আত্ম-সমর্থন টিকছে না। মনে হচ্ছে, না এ ঠিক নয়। এই দেখাই যেন শেষ দেখা হয়। আর যদি তা না হয়, প্রার্থনা তার কোন কারণে যদি সফল না হয়, তা হলে এমন ব্যবস্থায় বা গোপন বন্দোবস্তে সে কোনমতেই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না—যাতে করে আবার তাদের ঘনিষ্ঠতা কায়েম হয়ে উঠে।

এইভাবেই কাটল সারা গ্রীষ্মকালটা। এই সময়টার মধ্যে উভয়ে একত্র হ'ল প্রায় দশ-বারো বার। আর প্রত্যেক বারেই দানিয়েলের মধ্যবর্তিতায়।

একবার হ'ল কি—স্টীপানিডার স্বামী এল ঘরে, মস্কো থেকে ফিরে। তাই সেবার আসতে পারল না স্টীপানিডা ইউজিনের কাছে। বুড়ো দানিয়েল প্রতিবারই হুজুরে হাজির। এবারে অসুবিধা দেখে ইউজিনের কাছে সে প্রস্তাব তুলল,—আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে এলে কেমন হয়! ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'ল ইউজিন, সজোরে প্রত্যাখ্যান করল তার গর্হিত প্রস্তাব।

তারপর স্বামী একদিন চলে গেল, ফিরল তার প্রবাসের কর্মস্থলে। শুরু হ'ল আবার তাদের দেখা-শোনা। আগেকার মতই যথারীতি, নিয়মিত ভাবে

তারা এসে মিলত সেই পরিচিত স্থানটিতে। যে সম্পর্কে সাময়িক ছেদ পড়েছিল, আবার তা প্রতিষ্ঠিত হ'ল। প্রথম প্রথম দানিয়েলকে ডাকা হ'ত, আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারে। কিন্তু কিছুদিন পরে তার আর প্রয়োজন রইল না। দানিয়েলকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। ইউজিন কেবল তারিখটার উল্লেখ করে বলে দিত, 'অমুক দিন এসো।' যথাসময়ে হাজির হ'ত স্টীপানিডা, সঙ্গে আরেকজন স্ত্রীলোক নিয়ে। কেন না, কৃষকের ঘরের মেয়ে বা বধূ একলা ঘুরে বেড়ানো সমাজ-রীতির বিরুদ্ধে। সঙ্গিনীটির নাম প্রোখোরোভা।

একদিন ভারি মুস্কিল হ'ল। সেদিন যে-সময়ে স্টীপানিডার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল ইউজিনের, ঠিক সেইদিনই সেই সময়ে, বাড়িতে এলেন অতিথির দল সপরিবারে। মেরী পাভ্‌লোভনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন এঁরা, সামাজিক শিষ্টাচার হিসেবে। সঙ্গে ছিল সেই পরিবারেরই একটি মেয়ে, বহুদিন ধরে যার ওপরে নজর রেখেছিল ইউজিনের মা। মনে মনে এঁচে রেখেছিলেন ইউজিনের সঙ্গে সেই মেয়েটির বিয়ে হলে বেশ হয়। তাই ইউজিনকে ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে বাড়িতে আটকে থাকতেই হ'ল। বাড়িতে অতিথি বসিয়ে রেখে অভিসারে বেরুনো অসম্ভব। তবে ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই ইউজিন চট্ করে বেরিয়ে পড়ল। গোলাবাড়ির পিছনে ফসল ঝাড়াই হচ্ছে, তাই দেখবার নাম করে ইউজিন ঐ পথ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল বনের দিকে। পুরানো সঙ্কেতস্থলে অধীর আগ্রহে এসে যখন সে পৌঁছুল, দেখল জনশূন্য ঝোপ—কেউ কোথাও নেই। তবে যে-জায়গাটিতে প্রতি বার স্টীপানিডা প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাক্‌ত সেই জায়গাটির আশে-পাশে হাতের নাগালের মধ্যে যত কিছু ছোট-খাটো গাছের চারা আর ডাল-পালা ছিল, সব ভাঙা-চোরা অবস্থায় পড়ে আছে। হেজেল গাছের ছোট্ট ডালগুলো দুমড়ানো, —একটা সরু লাঠির মতন মেপ্‌ল গাছের নতুন সবুজ চারাটিকেও মচ্‌কে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

চোখের সামনে সব দেখতে পেল ইউজিন। বহুক্ষণ ধরে সাগ্রহ প্রত্যাশায় অপেক্ষা করেছে স্টীপানিডা। তারপর নিরাশ হয়ে ক্রুদ্ধ, ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নিষ্ফল অভিসারের ব্যর্থ আক্রোশে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত চলে

গিয়েছে, রেখে গিয়েছে বিরক্তি আর অভিমানের কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ। ধূলিসাৎ প্রত্যাশার ধূলিসাৎ নিদর্শন।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ইউজিন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে চলল দানিয়েলের সন্ধানে। বৃদ্ধ বন-প্রহরীকে বলে দিল যেন কাল আবার স্টীপানিডাকে আসবার জন্য খবর দেওয়া হয়।

এল স্টীপানিডা—যথারীতি, ঠিক সময়েই। যেন কিছুই হয় নি। সহজ এবং স্বাভাবিক।

কাটল সারা গ্রীষ্মকাল এই ভাবে। প্রতিবারই উভয়ে এসে মিলত বনের মধ্যে, সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে। কেবল একবার, শরৎকালের কাছাকাছি তারা পিছনকার উঠোনে ছোট্ট ছাউনি-ঘরটায় এসে উঠেছিল। তারপর কিছুক্ষণ পরেই চলে যেত যে যার নিজের ঘরে। গতানুগতিক, নিয়মিত, পূর্ব-নির্ধারিত তাদের অভিসার।

ব্যক্তিগত জীবনে, এই গোপন প্রণয় আর দৈহিক সম্পর্ক যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—এই চিন্তা কোনদিনই ইউজিনের মাথায় উদয় হয় নি। স্টীপানিডার সম্বন্ধে সে কোন কিছুই ভাবত না। মানে, ভাবনার কোন অবকাশ বা প্রয়োজন বোধ করত না। টাকা দিত তাকে, এই পর্যন্ত। তার বেশি কিছু নয়।

ইউজিন গোড়ায় গোড়ায় কিছুই জানত না, বুঝতেও পারে নি। তার মাথাতেই ঢোকে নি যে, তার এই গোপন প্রণয়ের কথা আর কেউ আঁচ করেছে অথবা সারা গ্রামে সে খবর রাষ্ট্র হয়ে গেছে। পড়শীর দল যে ইতিমধ্যে হাসি-তামাসা শুরু করে দিয়েছে, গ্রামের মেয়েরা স্টীপানিডার সৌভাগ্যে রীতিমত ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে, তার আত্মীয়স্বজন এ বিষয়ে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ দিচ্ছে—এমন কি ইউজিনের দেওয়া টাকায় ভাগও বসাচ্ছে, সে সব খবর কিছুই জানত না ইউজিন। বুঝতেই পারে নি স্টীপানিডার প্রকৃত মনোভাব। এ ব্যাপারটাকে সে কত সহজ ভাবে নিয়েছে—পাপ-পুণ্য জ্ঞানটা তার কতটুকু! আর যেটুকু অন্যায়বোধের দরুন মানসিক অস্বস্তি হ'ত, সেটা বেমালুম চাপা পড়ে গিয়েছে ইউজিনের খোলা হাতের

দক্ষিণায়! স্টীপানিডার মনে হ'ত আর পাঁচজনে যখন তাকে হিংসা করছে, তখন মন্দটা কিসের? কাজটা মোটের ওপর নিন্দনীয় নয়, বরঞ্চ ভালই।

আর ইউজিন ভাবেঃ এটা হ'ল জৈব প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের খাতিরে, নিরুদ্ধ দেহ-ক্ষুধার প্রশমন মাত্র। নিতান্তই দরকারী। নিরুপায় মন আর অবদমিত শরীর-ধর্ম নিয়ে কি করে চালানো সম্ভব? মানে কাজটা ঠিক ভাল নয়, প্রশংসা বা সমাজ-অনুমোদনের বাইরে। কেউ অবিশ্যি মুখে কিছু বলছে না এখনও পর্যন্ত। কিন্তু সবাই, অন্তত অনেকেই জেনে ফেলেছে। যে স্ত্রীলোকটিকে স্টীপানিডা সঙ্গে করে আনে, সে তো জানেই। আর, তার জানা মানেই আর দশজনের কাছে খবরটি বেশ রসাল, পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তা'হলে এ অবস্থায় কি করা যায়?

ইউজিন ভাবে—কাজটা ঠিক হচ্ছে না। অন্যায় করাই হচ্ছে—জানি। কিন্তু করি কি? তবে, বেশিদিন আর নয়। এবারে দাঁড়ি টানা দরকার।"

ইউজিনের মনে সবচেয়ে বড় অস্বস্তির কারণ হ'ল স্টীপানিডার স্বামী-প্রসঙ্গ। গোড়ায় গোড়ায় সে ভাবত—স্বামীটা নিশ্চয়ই এক হতচ্ছাড়া, বাজেমার্কা লোক—স্টীপানিডার অপছন্দ এবং অযোগ্য। কথাটা ভেবে আত্ম-তৃপ্তি বোধ করত ইউজিন। যেন স্খলনকে সমর্থনের একটা কিছু নিশ্চিত হেতু খুঁজে পাওয়া গেল। কিন্তু অবাক হয়ে গেল ইউজিন, স্টীপানিডার স্বামীকে একদিন চাক্ষুষ দেখে। কি চমৎকার, লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ মানুষ! খাসা ভদ্র পোশাক-আশাক। চলাফেরার ধরনে দিব্যি স্মার্ট বলেই তো মনে হয়। অন্তত ইউজিনের চেয়ে কোন অংশেই খাটো সে নয়। তবে...?

পরের দিন স্টীপানিডার সঙ্গে দেখা হতেই কথাটা পাড়ল ইউজিন। বলল, তার স্বামীকে দেখে সে তো রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। সে যে এ রকম, তা তো জানতো না ইউজিন—ভাবতেই পারে নি।

তৃপ্ত, গর্বিত সুরে জবাব দেয় স্টীপানিডা—"সারা গ্রামে ওর জুড়ি নেই।"

'তা হলে…?' আশ্চর্য বোধ করে ইউজিন। বিস্ময়-স্তব্ধ মনে কেবলি প্রশ্ন জাগে…'তবে কিসের জন্যে…?'

এর পর থেকে চলতে থাকে ক্রমাগত ঐ একই ভাবনা। মনটা চাপা অসহিষ্ণুতায় পীড়িত হয়ে ওঠে খালি খালি। একদিন এমনি খামোকা, দানিয়েলের ছোট্ট কুঁড়ে ঘরটায় গিয়ে বসল ইউজিন। গল্প জুড়ে দিল বুড়োর সঙ্গে। বুড়ো তো গল্প পেলে আর কিছুই চায় না। এ কথায় সে কথায় এক সময়ে সোজাসুজি বলে ফেলল দানিয়েল—"মাইকেল তো এই সেদিন আমায় জিজ্ঞাসা করছিল—'আচ্ছা, বাবু কি আমার বৌয়ের সঙ্গে সত্যিই আছেন'? আমি বললুম, অত-শত জানি না। তবে, যদি বৌ তোর নষ্টই হয়ে থাকে, তাহলে চাষীর চেয়ে মনিবের সঙ্গে হওয়াই ভালো।"

"তারপর? মাইকেল কি বললে?"

"বললে—'রোসো—আর ক'টা দিন। জানতে ঠিক পারবোই একদিন না একদিন। তখন মজা টের পাইয়ে দেব মাগীকে' বলে চুপ করে রইল।"

ইউজিন শুনে চুপ করে রইল। ভাবল—স্বামী যদি ফিরে আসে—এসে গ্রামে বসবাস করে, তাহলে ছেড়ে দেব ওকে।'

কিন্তু মাইকেল থাকে শহরে! গ্রামে ফেরবার কোন লক্ষণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাই চলতে থাকে আগের মতন। সম্পর্ক ছিন্ন হয় না।

'দরকার পড়লেই ইতি করে দেওয়া যাবে। ওতে আর হাঙ্গামা কিসের? তখন ব্যাপারটা ধুয়ে-মুছে যাবে একেবারে—নিশ্চিহ্ন।'

এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করে ইউজিন।

ইউজিনের কাছে এটা অবধারিত সত্য। পরিণতি আর যথাকর্তব্য সম্বন্ধে সে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত। খতম একদিন করতেই হবে। এমনিই হবে। এমনিই হয়ে যাবে। মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয় অস্বস্তিকর ভাবনাগুলো। চারদিকে তার কতো কাজ। সারাটা গ্রীষ্মকাল তার কেটে গেল যেন কোথা দিয়ে। মন আর দেহ নানান্ কাজে ব্যস্ত, ব্যাপৃত। এদিকে নতুন একটা গোলাবাড়ি আর একটা নতুন মরাই তুলতে হ'ল, ওদিকে ফসল-কাটা, ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ। দম নেবার অবকাশ নেই। তার ওপর দেনার দায়—

সেগুলো একে-একে চুকিয়ে ফেলা, অকেজো পতিত জমিগুলো বিক্রি করে দেওয়া—এ সমস্ত কাজে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল ইউজিন। সারাটা দিন জমি আর ঘর—এক চিন্তা, এক কাজ। ভোর বেলায় বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে রাত্তিরে ক্লান্ত দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়া পর্যন্ত একটুও ফাঁক নেই। অবসর মেলে না অন্য চিন্তার।

এই তো কাজ—আর এই নিয়েই তো জীবন। বাস্তব, সত্য।

স্টীপানিডার সঙ্গে তার যে সম্বন্ধ—সম্পর্ক বলে সেটাকে চিহ্নিত করতে চায় না ইউজিন—সেটার দিকে নজর দেবার, মন ফেরাবার সময়ই পাওয়া যায় না। অবিশ্যি এটা সত্যি যে, স্টীপানিডাকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা, তার কাছে যাবার ইচ্ছা যখন জেগে উঠত ইউজিনের, অস্থির হয়ে পড়ত সে। এমন জোরে, এমন আকস্মিক ভাবে সে দুর্বার কামনা এসে তাকে নাড়া দিয়ে যেত, রীতিমত ধাক্কা দিয়ে যেত যে, ইউজিন সামলাতে পারত না নিজেকে সেই সময়ে। অন্য কোনও চিন্তাই তখন মগজে ঢুকত না। উগ্র আকাঙ্ক্ষায় সে ছটফট করত, উন্মথিত হৃদয় আর কামনাক্লিষ্ট শরীরটাকে নিয়ে সে যে কি করবে, তা ভেবে ঠিক করতে পারত না। তবে এই অবস্থা এই মনোভাবটা বেশিদিন ধরে থাকত না—এই যা রক্ষে। একটা ব্যবস্থা করে নিত ইউজিন—কোন একটা দিন সুযোগ সুবিধামত কাছে পেত স্টীপানিডাকে। তারপর দিনের পর দিন, সপ্তাহভোর কেটে যেত—এমন কি, মাসাবধি কাল পেরিয়ে যেত। ইউজিনের আর চাহিদা থাকত না, ভুলে যেত স্টীপানিডার কথা।

শরৎকাল এসে পড়ল। ইউজিন এই সময়টা প্রায়ই ঘোড়ায় চড়ে যেত শহরে। যাতায়াতের ফলে অ্যানেন্স্কি নামে এক পরিবারের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয় হ'ল। ক্রমে সে পরিচয়টা দাঁড়াল অন্তরঙ্গ বন্ধুতায়। অ্যানেন্স্কি পরিবারের একটি মেয়ে ছিল। 'ইনস্টিটিউট' থেকে সবে সে বেরিয়েছে। বড়লোক আর অভিজাত জমিদার বাড়ির মেয়েদের জন্যে বোর্ডিং-স্কুল গোছের প্রতিষ্ঠান হ'ল এই ইন্‌স্টিটিউট। সেখানে ছাত্রীদের চাল-চলন,

বেশ-ভূষা, সামাজিক শিষ্টাচার প্রভৃতি কায়দা-কানুনের দিকেই নজর দেওয়া হয় বেশি। এমনতর প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা শেষ করে মেয়েটি ফিরেছে। তাই ইউজিন যখন লিজা অ্যানেনস্কায়ার সঙ্গে প্রেমে পড়ল, আর তার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে বসল, তখন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই ছিল না। কিন্তু দুঃখ পেলেন সবচেয়ে বেশি ইউজিনের মা। ব্যাপার দেখে মেরী পাভলোভনা অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। স্বপ্নভঙ্গের আঘাতে তিনি ভাবলেন, ইউজিন নিজেকে এতখানি খেলো করল কি করে!

এই সময় থেকেই এধারে স্টীপানিডার সঙ্গে ইউজিনের সকল সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল।

ইউজিন কেন যে এতো দেশ আর এতো মেয়ে থাকতে লিজা আনেনস্কায়াকেই পছন্দ করে বসল—তার উত্তর দেওয়া অসম্ভব।

কোন পুরুষ যখন একটি বিশেষ মেয়েকে পছন্দ করে, তখন তার কারণ খুঁজে বার করা শক্ত। এই ক্ষেত্রে কারণ অবিশ্যি ছিল—কয়েকটা সপক্ষে, কয়েকটা বিপক্ষে।

প্রথম কারণ হ'ল—লিজা ধনীর ঘরের উত্তরাধিকারিণী কন্যা নয়, আদরের দুলালীও নয়, ইউজিনের মা যা একান্ত মনেই কামনা করেছিলেন। আরেকটি কারণ হচ্ছে—লিজা সরল প্রকৃতির মেয়ে, ছলা-কলার ধার ধারে না। লিজার মা মেয়েকে যেভাবে চালান, তাতে মেয়ের প্রতি সহানুভূতি হওয়াই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, লিজা এমন কিছু চটকদার সুন্দরী নয়, যাতে সকলের চোখ পড়ে তার ওপরে সাদা-মাটা চেহারা, তবে দেখতে এমন কিছু খারাপও নয়—এই পর্যন্ত। কিন্তু লিজাকে ইউজিন যে পছন্দ করল, তার প্রধান কারণ হ'ল এই—লিজার সঙ্গে তার আলাপ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হ'ল এমন একটা সময়ে যখন ইউজিন বিয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। মনে-মনে সাংসারিক এবং গার্হস্থ্যজীবনের জন্যে সে তখন তৈরি হয়ে উঠেছে। বিয়ে করা

দরকার এবং বিয়ে করবো···এই জেনে আর ভেবেই ইউজিন প্রেমে পড়ল, জানাল তার প্রস্তাব।

প্রথমটা শুধু ভালো-লাগার পালা। অর্থাৎ লিজা অ্যানেন্‌স্কায়াকে দেখতে এমনি বেশ ভালো লাগত ইউজিনের। ক্রমশ সেই ভালো-লাগার ফিকে ভাবটা গাঢ় হয়ে জমতে লাগল। যখন লিজাকে স্ত্রী-হিসেবে গ্রহণ করাই স্থির করল ইউজিন, তার প্রতি মনোভাবটা সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হতে লাগল, রূপান্তরিত হ'ল হৃদয়ের গভীরতর আকর্ষণে। ইউজিন বুঝল—এটা প্রণয়। লিজাকে সে ভালোবেসেছে।

লিজার আকৃতি দীর্ঘ, ছিপছিপে ও পাতলা। তার শরীরের সব কিছুই একটু পাতলা আর লম্বাটে ধাঁচের। তার মুখের গড়ন, তার নাক উঁচু না হয়ে যেভাবে নিচের দিকে নেমে এসেছে, তার আঙুলের ডগা ও পায়ের পাতা—সমস্ত অবয়বই পেলব এবং দীঘল। মুখের রংটায় কিসের যেন সূক্ষ্ম আভাস—ফিকে-হলদে সাদায় মেশা আর তারি সঙ্গে লালচে গোলাপী। চুলগুলি বেশ লম্বা, ঈষৎ বাদামি রঙের। নরম আবার কোঁকড়ানো। আর চোখ দুটি তার সত্যিই সুন্দর—পরিষ্কার দীপ্তি ও মধুর আবেশে উজ্জ্বল। নম্র তার চাউনি, কোমল দৃষ্টিতে অনুমান ও বিশ্বাস-প্রবণতার স্পর্শ।

এই হ'ল লিজার শারীরিক কাঠামোর বর্ণনা, তার বাহ্য আকৃতির পরিচয়। যেটা ইউজিন চোখের সামনে সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু তার আত্মার খবর—অর্থাৎ দেহাতিরিক্ত মনের সংবাদ? সে সম্বন্ধে ইউজিন কিছুই জানে না—বলতে পারে না। কেবল দেখতে পায় তার চোখ দুটি। সে দৃষ্টিতে জবাব পেয়ে যায় ইউজিন। মনের গোপন কোণে যা কিছু জিজ্ঞাসা আছে তার সব প্রশ্নের ইঙ্গিত-সমাধান মিলে যায় যেন লিজার চোখে। আর সে চোখের দৃষ্টি আর বৈশিষ্ট্য ও অর্থ হ'ল এই ঃ লিজা যখন ইনস্টিটিউটের ছাত্রী হিসেবে বোর্ডিং-স্কুলে থাকত, বয়েস আন্দাজ পনেরো—তখন থেকেই সে ক্রমাগত প্রেমে পড়েছে। সুপুরুষের আকর্ষণ ছিল তার কাছে অত্যন্ত গভীর। প্রেমে না পড়লে তার সুখ হ'ত না—প্রণয়াস্পদের চিন্তাতেই তার শান্তি, উত্তেজনা, জীবনের আনন্দ আর সার্থকতা। ইনস্টিটিউট ছেড়ে যখন লিজা বাড়ি ফিরল,

তারপর থেকে যত যুবাপুরুষের সঙ্গে তার আলাপ-পরিচয়, দেখাশোনা হয়েছিল, সকলের সঙ্গেই ঠিক একই ভাবে প্রেমে পড়তে লাগল। কাজেই ইউজিনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া মাত্রই, লিজা তাকে ভালবেসে ফেলল। অনবরত প্রেমে পড়ে পড়ে আর ভালোবাসার উদ্বেল ঢেউয়ের ওপর নিত্য ভেসে থাকতে থাকতে তার চোখ দুটিতে 'ভেসে উঠল এমন একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টি, একটা টলটলে ভাসা-ভাসা চাউনি—যে ইউজিন তাতেই মজল, ডুবল এবং জড়িয়ে গেল নিথর চোখের দীঘল পালকেব জালে।

এই শীতকালেই, ইতিমধ্যে লিজা দু'জায়গায় প্রেমে পড়েছে। দু'জায়গায় এবং একই সঙ্গে। যুগপৎ দুটি যোগ্য পাত্রে হৃদয় দানের ফলে সময়টা কাটছিল লঘূর্মি নদীর একটানা স্রোতের মতই। দুজনেই সুদর্শন যুবক। তারা কাছে এলেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠত লিজা। তারা ঘরে ঢুকলেই উত্তেজনায় বুক ঢিপ্ ঢিপ্ কবে উঠত। এমন কি তাদের নামোল্লেখ মাত্রেই শুরু হ'ত লিজার হৃদয়-চাঞ্চল্য।

কিন্তু পরে, লিজাব মা একদিন সুযোগ বুঝে ইঙ্গিত করলেন মেয়েকে। বললেন, আর্তেনিভ পাত্র হিসেবে কিছু ফেলনা নয়। উপরন্তু তার উদ্দেশ্য সৎ। প্র্যাকটিক্যাল লোক, বিবাহ করাটাই তাব সত্যিকারের অভিপ্রায়। অমনি লিজা স্থির, ধীর ও গম্ভীর হয়ে গেল। ইউজিন আর্তেনিভের প্রতি শ্রদ্ধায়, ভালোবাসায় তার মন পূর্ণ হয়ে উঠল। ভালোবাসতে শুরু করল ইউজিনকেই। প্রণয়ের মাত্রা ও গভীরতা বাড়তে লাগল ক্রমে ক্রমে। অবশেষে লিজা তার পরম অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠল। পূর্ববর্তী দু'জন প্রণয়াস্পদের প্রতি তার আকর্ষণের জোর গেল কমে—ক্রমশ সেটা দাঁড়াল শিথিল উদাসীন মনোভাবে। এর পরে যখন ইউজিন হামেশাই অ্যানেন্স্কি পরিবারে যাতায়াত করতে লাগল, ঘন ঘন আসতে শুরু করল তাদের বল্-নাচে আর পার্টিতে, তখন লিজার উত্তেজনাও বাড়তে লাগল সেই অনুপাতে। ইউজিন তাদের বাড়ি এসে তারই সঙ্গে কথা কয়, নাচে যোগ দেয় বেশি করে,—জানতে চায় লিজা তাকে ভালোবাসে কিনা, ঘুরি পিছু-পিছু ঘোরাফেরা করে। এ সমস্ত দেখে শুনে লিজার প্রেমও গভীর হয়ে উঠল। শুরু হ'ল শয্যাকণ্টক, মানসিক

ছটফটানি—পুলকেরই আনুষঙ্গিক, অকারণ বেদনা। নিদ্রায় আর জাগরণে লিজার মনে ঐ এক চিন্তা—ইউজিন। ঘুমিয়ে তাকে স্বপ্ন দেখে, আবার জেগে জেগেও তাকে দেখতে পায়। অন্ধকার ঘরে বসে চোখ মেলে লিজা যেন স্পষ্ট দেখতে পায় ইউজিনকে। আর অন্য সব মানুষ ভেসে যায়—সব কথা ভুলে যায়। অস্পষ্ট, অদৃশ্য হয় আশ-পাশের জিনিস। কেবল একটি মানুষ, হৃদয়ের ঘটাকাশে স্ফীতালোকের মধ্যবর্তী যেন একটিই মানুষ—উজ্জ্বলতম বিন্দু হয়ে ফুটে থাকে…ভাস্বর, অম্লান।

তারপর যখন ইউজিন বিয়ের প্রস্তাব জানাল, তখন উভয় পক্ষের সম্মতি-ক্রমে তারা বাগ্‌দত্ত হ'ল। পরস্পর চুম্বন করে তারা আবদ্ধ হ'ল পবিত্র চুক্তিতে। সবাই জানল তাদের 'এনগেজমেণ্টের' কথা। এর পর থেকে লিজার মনে ইউজিন ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তা রইল না। ইউজিনের সঙ্গ ছাড়া আর কারুর সংসর্গ ভালো লাগত না তার। ইউজিনকে ভালোবাসা আর ভালোবাসার প্রতিদান পাওয়া ছাড়া লিজার মনে আর অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। ইউজিনের প্রেম-স্পর্শ-ধন্যতাই তার জীবনের একান্ত কামনা হয়ে দাঁড়াল।

ইউজিনকে নিয়ে বাড়াবাড়ি শুরু করল লিজা। শুধুই ভবিষ্য-পতিগত-প্রাণা হয়ে সে ক্ষান্ত রইল না। ইউজিন সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক গর্ব নিজের আর বাগ্‌দত্ত স্বামীর কথায়, উভয়ের প্রণয়-স্বপ্নে সে একাই বিভোর হয়ে উঠল। হৃদয় হ'ল ভাবপ্রবণ। প্রীতির সুধারসে অভিষিক্ত হয়ে যেন থেকে থেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে লিজা। আবেগের আতিশয্য এক এক সময়ে যেন সহন-সীমা লঙ্ঘন করে যায়। স্বপ্নের ঘোর আর কাটতে চায় না—

যত দিন যায়, তত প্রেম বাড়ে। ইউজিন লিজাকে যত চিনতে থাকে, ততই মুগ্ধ হয়ে যায়। এতখানি প্রেম যে একটি ছোট বুকের ভিতর বাসা বেঁধে আছে তারি জন্যে, সে কথা সে ভাবতেও পারে নি। এ যেন অপ্রত্যাশিত প্রণয়ের বন্যা। আরেক জনের ভালবাসার দৃঢ়তায়, সরল সহজ বিশ্বাসে আর বিকাশে নিজের ভালবাসাও উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে।

শীতকাল কাট্‌ল এই ভাবে, বসন্ত এসে পড়ল। আর বসে থাকলে চলে না।

ইউজিন বেবিয়ে পড়ল কাজের তাগিদে। সেমিয়োনভ তালুকটা একবার ঘুরে আসা দরকার। কি হচ্ছে না হচ্ছে ওদিকটায় দেখা উচিত। নায়েব-গোমস্তা আমলাদের সাক্ষাতে একটু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন, মহালের কাজ ভালমত চল্‌ছে কিনা, তদারক করা উচিত। তা ছাড়া ওখানকার পুরানো কুঠিটা অসংস্কৃত অবস্থায় পড়ে আছে বহু দিন। এদিকে বিয়ের দিন এগিয়ে এল। এবারে কুঠিটাকে ঝালিয়ে মেরামত করতে হবে, বিয়ের আগেই সাজিয়ে-গুছিযে ফেলতে হবে।

মেরী পাভ্‌লোভ্‌নার মনে কিন্তু শান্তি নেই, সন্তোষ নেই। অপ্রসন্ন চিত্ত, খুঁৎখুঁৎ করছে সর্বদাই ছেলেব পছন্দের বহর দেখে। আজীবন সঙ্গিনী হিসেবে ইউজিন যাকে নির্বাচন করল, মেরী তাকে পুরোপুরি অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারছেন না। ছেলের ভবিষ্যৎ, তার বিবাহ সম্বন্ধে কত উজ্জ্বল স্বপ্ন আর আশা তাঁর ব্যর্থ হযে গেল! বিয়েটা যতখানি তাক্‌-লাগানো ব্যাপার হবে বলে আঁচ করে বেখেছিলেন, এ যেন তাব কাছে কিছুই নয়। নেহাৎই মিইয়ে-যাওয়া একটা ঘটনা, আব দশজনেব বৈচিত্র্যহীন জীবনে যেটা হামেশাই ঘট্‌ছে। খুঁৎখুঁতুনির আবও একটা কারণ ছিল মাযের মনে। ছেলের বিয়ে একটা মস্ত বড় ঘটনা—জঁাক-জমক আব আড়ম্ববে পূর্ণ এবং সার্থক হয়ে উঠল না—সে আক্ষেপ তো ছিলই। উপবন্তু ইউজিনের শ্বাশুড়ী-ভাগ্যে তিনি আনন্দিত হতে পারলেন না। ভার্ভাবা আলেক্সিভ্‌না মোটেই তাঁকে সন্তুষ্ট এবং প্রীত করতে পারেন নি। ইউজিনের শ্বাশুড়ী হিসেবে তাঁকে মনোনীত করা চলে না। নিজের থাকের লোক নন্। আগামী দিনের সম্পর্ক ধরে তাঁকে সম-স্তরের শ্রদ্ধা বা বিবেচনায় আপ্যায়িত করতে মন তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে উঠছে।

মেয়ের মা কি ধরনের মানুষ—তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিই বা কি ধঁাচের, তার কোন খরবই জানেন না মেরী পাভ্‌লোভ্‌না। সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই

তাঁর মনে তৈরী হয় নি। কেবল এইটুকু বলতে পারেন যে, তাঁর আচার-ব্যবহার অভিজাত ঘরের মহিলাদের মতন নয়। প্রথম দৃষ্টি ও আলাপেই মেরী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নাকে ঠিক 'লেডি' নামে অভিহিত করা যায় না, অন্ততঃ তাঁর রুচি ও চাল-চলনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে বাধে। এইখানেই মেরীর আপত্তি আর মনঃকষ্ট। মনোদুঃখের প্রধান কারণ হ'ল মেয়ের মা উঁচু থাকের নন। সারাটা জীবন মেরী চাল-চলন আর সহবৎ শিক্ষাকেই উঁচু আসন দিয়ে এসেছেন। শিক্ষা-দীক্ষা রুচি ও সংস্কার, ভদ্রতা-বোধ এবং শালীনতাকেই তিনি প্রাপ্যেরও অধিক মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। আজ তাই এতটা নামতে হবে ভেবে, তিনি মনে মনে কষ্ট পান। দুঃখ বোধ করেন ইউজিনের জন্যে। ইউজিনও খুঁতখুঁতে লোক—সূক্ষ্ম তার স্নায়ু। নির্ভুল চাল-চলনের এতটুকু এদিক-ওদিক সহ্য করতে পারে না। এই দিক থেকে ভবিষ্যতে তাকে অনেকখানি বিরক্তি ও হাঙ্গামা পোয়াতে হবে। অসমান সামাজিকতার জন্যে তাকে কষ্ট পেতে হবে—দেখাই যাচ্ছে। তবে সুখের বিষয়, লিজাকে মেরীর ভালো লাগে···বেশ পছন্দসই !

ইউজিন লিজাকে এতটা পছন্দ করে—সেও একটা কারণ অবিশ্যি। তা ছাড়া লিজার মতন মেয়েকে ভালো না বেসে উপায় নেই। ওর সঙ্গে মেলা-মেশা করলেই পছন্দ ও তারিফ করতে হয়। আর লিজাকে ভালোবেসে গ্রহণ করবার জন্যে মেরী পাভ্‌লোভ্‌না তো প্রস্তুত হয়েই আছেন। সেটা সত্যিই আন্তরিক সদ্ভাব থেকে।

ইউজিন দেখতে পেল যে, তার মা সুখী এবং তৃপ্ত হয়েছেন। আসন্ন বিবাহের চিন্তায় ও জল্পনায় তিনি রীতিমত ব্যস্ত, মেজাজও তাঁর প্রসন্ন। বাড়িতে সব কিছু গোছগাছ করে, ঘর-সংসার গুছিয়ে দিতেই তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় করছেন। খালি নতুন গৃহিণীর আসার প্রতীক্ষায় আছেন। বৌ এলেই তার হাতে সংসার আর ছেলের ভার সমর্পণ করে চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন মেরী। অবিশ্যি এই-ই নিয়ম। কিন্তু ইউজিন তাঁকে অনেক বুঝিয়েছে। আর কিছুদিনের জন্যে নতুন সংসারে থেকে যাবার

অনুরোধ জানিয়েছে। চেষ্টা করেছে মাকে বুঝিয়ে-পড়িয়ে রাজি করাতে। মেরী এখনও কিছু শেষ কথা বলেন নি। ভবিষ্যতে, অর্থাৎ বিয়ের পরে, সাংসারিক বিলি-বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এখনো পাকাপাকি কিছু ঠিক হয় নি।

সন্ধ্যে বেলায় চা খাবার পরে, মেরী পাভলোভনা বসে বসে 'পেশেন্স' খেলছিলেন এক মনে। পাশে বসে ইউজিন তাস গুছোচ্ছিল। এই সময়টাই যা নিরিবিলি। মা ও ছেলে একত্র মুখোমুখি বসে দু'দণ্ড আলাপ-আলোচনা করতে পায়, মনের কথা খুলে বলবার সুযোগ পায়।

এক দান খেলা শেষ করে তাসগুলো ফের ভাঁজাতে ভাঁজাতে মেরী পাভলোভনা ছেলের দিকে একবার তাকালেন। তারপর একটু যেন ইতস্তত করে ইউজিনকে বললেন,—"জেন্যা, তোমাকে একটা কথা বলবো ভাবছিলুম। মানে—এমনি সাধারণভাবে বলছি। আমি অবিশ্যি জানি না তুমি আবার কি ভাবে নেবে। তবে পরামর্শ হিসেবে খালি বলছি যে, বিয়ে হবার আগেই, তোমার অন্য যদি কোনো ব্যাপার থাকে……মানে, বিয়ের আগে সুস্থ জোয়ান ছেলে—এমনি কতো লোকের কতো ব্যাপারই তো ঘটে যায়! তাই বলছি, সেই রকম যদি কিছু হয়ে থাকে তোমার, তা হলে ওসব চুকিয়ে দেওয়াই ভালো। মানে—পরে যেন এই নিয়ে তোমাকে কিংবা তোমার স্ত্রীকে আফসোশ করতে না হয়। ভগবান্ করুন—সে রকম যেন কিছু না হয়—তোমাদের কাউকেই পস্তাতে না হয়। তবে আগে থাকতে সাবধান হওয়া ভালো, পুরানো জিনিসের জের রাখতে নেই—ঝেড়ে-পুঁছে জঞ্জাল সাফ করে দিতে হয়—বুঝলে কিনা!"

বলা বাহুল্য, ইউজিন বেশ ভালোভাবেই বুঝেছিল এবং তক্ষুনি ধরতে পেরেছিল, মা কি বলতে চাইছেন। স্টীপানিডার সঙ্গে গত শরৎকালে তার যে ব্যাপার চুকে-বুকে গেছে, মা যে সেই গোপন সম্পর্কের প্রতি ইঙ্গিত করছেন, এটুকু বোঝবার মত তার বুদ্ধি আছে। বিবাহিতা মহিলারা এসব ব্যাপারে তেমন নজর দেন না। কিন্তু যাঁরা একলা, বিধবা কিংবা আজীবন কুমারী—তাঁদের দৃষ্টিটা স্বভাবতই তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে। এই সব অবৈধ

সম্পর্ক হাজার সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী হলেও, তাঁদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।

তাই ইউজিন লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল, মেরী পাভলোভনা যেই কথাটার উল্লেখ করলেন। তবে লজ্জার চেয়ে অপ্রস্তুত আর বিরক্তির ভাবটাই যেন বেশি। কেন না, যদিও তিনি মা এবং মা হয়ে সন্তানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখের চিন্তায় মাথা ঘামানো খুবই ন্যায্য এবং স্বাভাবিক, তবুও তিনি অকারণে একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে উদ্ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, এটা ইউজিনের মোটেই ভালো লাগল না। এমন একটা ব্যাপার, যেটা ইউজিনের একান্ত নিজস্ব এলাকার। ব্যক্তিগত জীবনের যে নগণ্য একটা অধ্যায় নিজ হাতেই শেষ করে মুড়ে ফেলেছে—তা নিয়ে অযথা চিন্তিত অথবা শঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে জিনিস মা বুঝেও ঠিক বুঝবেন না, ছেলের সামনে সে প্রসঙ্গের উল্লেখ একটু অশোভন। ইউজিনের মন তাই এই আলোচনায় ঈষৎ বিরক্ত এবং সঙ্কুচিত হয়ে উঠল।

তবু সরল ও সহজ গলায় ইউজিন বললে তার মাকে, "এমন কিছু আমার জীবনে ঘটে নি, মা, যেটাকে গোপন করার প্রয়োজন হয়। অন্তত এমন কোনো কাজ করেছি বলে মনে পড়ে না যেটা একদিন অস্বস্তির কারণ হতে পারে বলে লুকোচাপা করতে হবে এখন থেকে। বিয়ে করার বিপক্ষে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করি নি নিজ হাতে, এটুকু তোমায় বলতে পারি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা,—তা হলে তো ভালোই, বাবা। আমার আর চিন্তা কিসের! তুমি যেন কিছু ভেবো না, জেন্যা—মানে, আমার ওপর বিরক্ত হয়ো না—তোমার কথায় কথা বলছি বলে—" মেরী পাভলেভানা সহসা অপ্রতিভ হয়ে পড়েন। নিজের অপ্রস্তুত ভাবটা সামলাবার জন্য কৈফিয়ৎ দিয়ে কথা ঢাকবার চেষ্টা করেন।

কিন্তু ইউজিন স্পষ্টই বুঝতে পারল, মা'র বক্তব্য এখনও শেষ হয় নি। কথাটা চাপা দেওয়া হল মাত্র, নইলে আরো কী যেন বলবার ছিল···

ইউজিন যা ভেবেছিল তাই-ই ঠিক। একটু পরেই, ঈষৎ থেমে, মেরী

পাভলোভনা বলতে শুরু করেন। বলেন, ইউজিন যখন বাড়িতে ছিল না পেশ্‌নিকভ-রা ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে ধর্ম-মা হবার জন্যে।

ইউজিনের মুখমণ্ডল রক্তাভ হয়ে ওঠে। ঠিক লজ্জা নয়—বিরক্তিও নয়। একটা জটিল মনোভাব। মা তাকে যা বলতে চাইছেন, সেটা যে বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ, এটা সে বেশ বুঝতে পারছে। অথচ এ সম্বন্ধে তার নিজস্ব মতামত ও ধারণা অন্য রকম। তবু, মনেব মধ্যে একটা সচেতনতা ঘনিয়ে উঠছে—একটা কিছু জরুবী খবর আসছে—দ্বিধায়, সতর্কতায় আর প্রতীক্ষায় মনেব সূক্ষ্ম তাবগুলো থেকে থেকে কম্পিত হচ্ছে।

কথার পিঠে কথা আসে। মেরী পাভলোভনা বলে চলেন: "এ বছরে দেখছি কেবল ছেলের পালা। সব বাড়িতেই খোকা হচ্ছে শুনতে পাই। ভ্যাসিন্‌দের বাড়িব নতুন বৌয়ের খোকা হয়েছে······আবার পেশ্‌নিকভদের বৌ, তারও প্রথম ছেলে হয়েছে······এবার যে রকম ছেলের দল জন্মাচ্ছে, তাতে মনে হয়, শীগ্‌গিবই বোধ হয় যুদ্ধ বাধবে, না?"

কথাচ্ছলে প্রসঙ্গটা এসে পড়ে। মেরী পাভলোভনা এমন সহজ সুরে কথাগুলো বলেন, যেন কিছুই হয় নি।

অথচ বেশ কিছুই যে হয়েছে সেটা ইউজিনেব মুখ দেখলেই মালুম হয়। ছেলের মুখখানা সঙ্কোচে আর চাপা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠছে দেখে মেরী পাভলোভনা মনে মনে কুণ্ঠিত হন। আড়-চোখে দেখেন ইউজিনের অস্বস্তি—তার বিব্রত ভাবখানা। এটা নাড়ছে, ওটা সরাচ্ছে, টেবিলেব ওপর অন্যমনস্ক ভাবে আঙুল দিয়ে টক্‌টক্‌ আওয়াজ করছে। চোখ থেকে প্যাঁসনেটা একবার খুলছে, আবাব তখুনি চোখে লাগাচ্ছে। তারপর হঠাৎ একটা সিগ্‌রেট ধরিয়ে খুব খানিকটা ধোঁয়া টেনে নিঃশ্বাস ফেলে যেন বাঁচল।

মেরী পাভলোভনা চুপ করে থাকেন। ইউজিন নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা চাপা অস্বস্তি। কেমন করে এই অস্বস্তিকর নিঃশব্দতা ভঙ্গ করা যায়, ভেবে পায় না ইউজিন। কেউই নিজে থেকে

কথা বলতে আর ভরসা পাচ্ছে না। উভয় পক্ষই বুঝতে পারে, তারা পরস্পরের মনের কথা বুঝতে পেরেছে।

"আসল কথা কি জানো—সুবিচার। দেখতে হবে,—আর দেখাই উচিত—গ্রামের মধ্যে যেন কোনো অন্যায়-অবিচার না হয়। কারুর হয়ে পক্ষপাতিত্ব করাটা মোটেই সঙ্গত নয়। মানে—তোমার ঠাকুর্দার আমলে যে রকম অবস্থা ছিল, সেই রকম মেনে চলাই উচিত। নইলে, অকল্যাণ…" মেরী অনেকটা স্বগতই বলে চলেন, কথার জের টেনে অপ্রীতিকর অবস্থাটা দূর করতে চান।

"দেখ মা", ইউজিন হঠাৎ বলে উঠল, "তুমি যে কেন এসব বলছ, তা' আমি বুঝতে পেরেছি। তবে একটা কথা তোমায় বলি। তুমি শুধু শুধু চিন্তিত হয়ো না। তুমি এটুকু জেনো যে, আমার চোখে ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চিন্ততা অর্থাৎ আমার দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতার মুল্য অনেকখানি। আর সেটাকে নষ্ট হতে আমি কোনো মতেই দেব না। আর তুমি যে-কথা ভেবে অকারণে ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হচ্ছ—আমার অবিবাহিত জীবনে যদি কোনো অবাঞ্ছনীয় ব্যাপার ঘটে থাকে বলে'—তার উত্তরে বলতে চাই যে, সে সব চুকে-বুকে গেছে। কখনো কোনো দিনই কারুর সঙ্গে আমার স্থায়ী সম্পর্ক গোছের কিছু গড়ে ওঠে নি। তাই আমাব ওপরে কোনো দাবী-দাওয়া কারুর নেই, থাকতে পারে না।"

"বাঁচলুম", মেরী পাভলোভনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন। "শুনে সত্যিই খুশি হলুম। তোমার মন যে কতখানি উঁচু তা তো আমি জানি।"

ইউজিন চুপ করে রইল। এর পরে আর কোনও কথা কইল না। মা যা যা বললেন আর তাব মহত্ত্বের যে প্রশংসা করলেন, সেটা সর্বতোভাবেই তার প্রাপ্য জেনে প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করল ইউজিন।

পরের দিন ইউজিন যাচ্ছিল শহরে গাড়িতে করে। মনে-মনে ভাবছিল তার বাগদত্তা বধুর কথা। স্টীপানিডার কোনো প্রসঙ্গ-চিন্তাই তার মাথায় তখন উদয় হয় নি। কিন্তু ইউজিনের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই যেন ইচ্ছাকৃত একটা অবস্থার সৃষ্টি হ'ল।

গির্জের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ইউজিনের নজরে পড়ল, অনেক লোকের সমাবেশ হয়েছে। অধিকাংশ লোকই গির্জে থেকে গ্রামের দিকে ফিরছে—কেউ বা হেঁটে, কেউ বা গাড়িতে ঘরমুখো চলেছে। রাস্তায় দেখা হয়ে গেল বুড়ো ম্যাত্‌ভি আর সাইমনের সঙ্গে—ওরা বাড়ি ফিরছে। আরো কয়েকজন ছেলে-ছোকরা…অল্পবয়সী মেয়ের দল, হাসাহাসি আর গল্প করতে করতে চলেছে। ওই দলটির পিছনে পিছনে আসছে দু'জন স্ত্রীলোক, ইউজিন দূর থেকে নজর করল। ওদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া গোছের—আধাবয়সী ও ভারিক্কি চালের। আরেক জনের বয়স কাঁচা। বেশ সপ্রতিভ গতিভঙ্গী—পরনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক। মাথায় টক্‌টকে লাল রেশমী রুমাল বাঁধা। চেহারাটা খুব চেনা-চেনা মনে হল ইউজিনের। কিন্তু ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তি বলে' ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

ইউজিনের গাড়ি যখন ওদের কাছাকাছি এগিয়ে এল, প্রৌঢ়া মেয়েমানুষটি রাস্তার এক পাশ ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। পুরানো প্রথা মত অনেকখানি মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো ইউজিনকে। আর অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি—কোলে একটি শিশু নিয়ে যে এতক্ষণ লঘু অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে হেঁটে আসছিল—সে শুধু একটিবার মাথা নত করল ঈষৎ হেলিয়ে। লাল রুমালটার নীচে থেকে দেখা যাচ্ছে—চক্‌চক্ করে উঠল একজোড়া পরিচিত চোখ, হাসিতে আর কৌতুকের দীপ্ত ছটায় উজ্জ্বল।

হ্যাঁ—ইউজিন যা আন্দাজ করেছিল, তাই। স্টীপানিডাই বটে। কিন্তু ওর সঙ্গে সেই পুরানো ব্যাপারটা তো চুকে-বুকে গেছে। এখন ঝাড়া হাত-পা, সব পরিষ্কার। স্টীপানিডার দিকে তাকিয়ে আর লাভ কী?

'কিন্তু ছেলেটা তো আমারও হতে পারে!' ভাবে ইউজিন। এক লহমার জন্যে চিন্তাটা উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। পর মুহূর্তেই ঝেড়ে ফেলে দেয় ইউজিন। বলে আপন মনেই—যতো সব পাগলামি, মনের প্রলাপ! ওর স্বামী তো ছিলই বরাবর, এখনও আছে। দেখাশুনো কি হত না পরস্পরের?

এর বেশি আর কিছু ভাবতে চায় না ইউজিন। উৎকণ্ঠিত মনকে

আশ্বস্ত করে তর্কে আর বিচারে। ও সম্বন্ধে চিন্তা শুরু হলে তার আর অন্ত থাকে না। জোর করে মুছে ফেলা দরকার। তা ছাড়া, ও ব্যাপারের শেষবেশ তো হয়েই গেছে। একটা বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। শরীরের জন্য, স্বাস্থ্যের খাতিরে ওর প্রয়োজন ঘটেছিল একদিন। টাকা দিয়ে ইউজিন মিটিয়ে ফেলেছে যখন, তখন পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। ও সম্বন্ধে বলার কিছু নেই, আর থাকতেও পারে না। এই ধারণাটা বেশ দৃঢ়ভাবেই ইউজিনের মনের ভেতর গেঁথে গেছে। তাই সে ভাবে, স্টীপানিডার সঙ্গে তার স্থায়ী সম্বন্ধ কোনও দিন হয় নি, হতে পারত না এবং নেইও। ভবিষ্যতেও তার কোন সূত্র ধরে টেনে চলার প্রশ্ন আর উঠতে পারে না। দিন কয়েক নিতান্তই শরীর-ধর্ম পালনের জন্যে একটা ক্ষণিকের দেহ-সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল। এই পর্যন্ত।

এটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা নয়, বিবেককে দাবিয়ে রাখাও নয়। কারণ ইউজিনের বিবেক এ বিষয়ে নির্বাক, নিষ্কর্মা। তাই মেরী পাভলোভনার সঙ্গে কথাবার্তার পর আর রাস্তায় হঠাৎ দেখা হওয়ার পর থেকে ইউজিন স্টীপানিডার সম্বন্ধে কোনও চিন্তাকেই মনে স্থান দিত না। একটা দিকের দরজা যেন চিরদিনের জন্যে বন্ধ করে দিলে। এর পরে অবিশ্যি তুজনের দেখা-সাক্ষাৎ আর হয় নি।

ঈস্টারের পরের সপ্তাহে ইউজিনের বিয়ে হয়ে গেল শহরে। বেশ নির্বিঘ্নেই কাজ শেষ হল।

বিয়ের হাঙ্গামা মিটে যাওয়া মাত্রই ইউজিন নতুন বৌকে নিয়ে রওনা হল গাঁয়ের জমিদারীতে। মহালের কুঠিটা ইতিমধ্যে মেরামত করা হয়েছিল। বর-কনে এই বাড়িতে এসে উঠবে বলে তাদের বাসোপযোগী করবার জন্যে কুঠিটাকে যথাসাধ্য সংস্কার করে রাখা হয়েছিল। সবটা করা সম্ভব হয় নি। তু'জনের পক্ষে যতটুকু দরকার, সেই মতই সারানো হয়েছিল। মেরী পাভলোভনা, যা স্বাভাবিক নিয়ম সেই অনুসারে, ছেলে-বৌয়ের কাছ থেকে সরে অন্যত্র যাবার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকবার। কিন্তু ইউজিন আর লিজা—কেউই তাঁকে ছাড়তে চাইল না। তু'জনের মিলিত

সনির্বন্ধ অনুরোধে অবশেষে মেরী থাকতে রাজি হলেন। তবে কুঠিরই মধ্যে একটা স্বতন্ত্র অংশে তিনি উঠে গেলেন। সেটা আসল বাড়ি থেকে একটু দূরে, তার ব্যবস্থাও পৃথক। উভয় পক্ষেরই কোনো অসুবিধার কারণ আর রইল না।

এইভাবে শুরু হল ইউজিনের নতুন জীবন···নতুন জীবনের প্রথম পর্ব।

৭

বিয়ের প্রথম বছরটা কাটল কিন্তু কষ্টে। ইউজিনের পক্ষে, নববিবাহিত জীবনের অভূতপূর্ব সুখ-সম্পদ সত্ত্বেও, এক হিসেবে এটা দুর্বৎসরই বলতে হবে বৈ কি!

বিয়ের আগে, বাগ্‌দানের পর থেকে কোর্টশিপের সময়টা, ইউজিন চালিয়ে নিয়েছিল একরকম। অর্থাৎ বৈষয়িক ব্যাপারের মধ্যে যেগুলো সবচেয়ে অপ্রীতিকর, সেগুলো ঠেলেঠুলে ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল কোনো মতে। কিন্তু আর তা চল্‌ল না। হঠাৎ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়্‌ল ঘাড়ের ওপর। তাল সাম্‌লাবার সময়ই পায় না ইউজিন।

দেনার দায় ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠলো। পৈতৃক ঋণ কতো দিন আর এড়িয়ে যাওয়া চলে! ঋণ শোধের মেয়াদ বাড়াতে গেলে শোধ আর হয় না, ঋণ থেকেই যায়। মাঝখান থেকে হয় অমূল্য সময়ের অপচয়। এই সাময়িক নিশ্চিন্ততার প্রতারক আরামটুক্ ত্যাগ করতেই হবে—দাঁড়াতে হবে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের মুখোমুখি।

তাই বিক্রী করা হয়েছিল জমিদারীর খানিকটা অংশ। লাভবান্ তালুকের বারদিকের একটা অংশ ছেড়ে দিতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে। তা থেকে যে-টাকা পাওয়া গিয়েছিল, কর্জের কিছুটা ভাগ তাই দিয়ে শোধ হয়েছিল যেগুলোর জরুরি তাগিদ, সেইগুলো। কিন্তু আরো তো ঋণ আছে—অনেক বাকী এখনো। সেগুলোর কি উপায় হবে? ইউজিন ভেবে কূল পায় না।

তালুকটা রীতিমত দামী এবং তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। খাজনা যা আসে, তা ভালোই। কিন্তু খরচ মিটিয়ে আদায় বাবদ যেটুকু থাকে, তাই দিয়ে সংসারই বা চলে কি করে? আর তালুকটা বাঁচিয়ে রেখে তাকে বাড়ানো তার উন্নতি সাধন করাই বা সম্ভব হয় কি করে? দাদাকে নিয়মমত বার্ষিক টাকা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। নিজের বিয়েতেও বেশ কিছু খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। হাতে নগদ টাকা নেই বললেই চলে। অথচ বিষয়-সম্পত্তির আনুষঙ্গিক অর্থব্যয় অনিবার্য। কারখানার পেছনে টাকা না ঢাললে কারখানার কাজও অচল। বন্ধ করে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে হবে। টাকা নেই ঘরে। অথচ নগদের প্রয়োজন এখনি। হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলেও এদিকে চলে না। কি করা যায়! মহা সমস্যার ব্যাপার!

'একটা উপায় আছে অবিশ্যি। লিজার টাকা। তাই থেকে কিছু নিয়ে কাজে লাগানো চলে এখন। আপাতত এ দায় থেকে তা হলে উদ্ধার পাওয়া যায়। স্বামীর সঙ্কট-অবস্থা দেখে লিজা নিজে থেকেই এগিয়ে আসে। প্রস্তাব করে, অনুরোধ জানায় ইউজিনকে। বলে, 'টাকা তো পড়েই আছে, নাও না। নেবে না কেন, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে?' পীড়াপীড়ি শুরু করে দেয় লিজা, বলে টাকা তোমায় নিতেই হবে।

শেষকালে ইউজিন রাজি না হয়ে পারে না। সম্মত হয়, নিম্‌রাজি হয় টাকাটা নিতে। তবে একটা শর্ত আছে ইউজিনের। ও টাকা ধার হিসেবে নিতে পারে সে। নইলে নয়। আর তার পরিবর্তে, বিষয়ের অর্ধেকটা বন্ধকী হিসেবে নিতে হবে লিজাকে। শেষ পর্যন্ত ইউজিন তার নিজের জেদ বজায় রেখে ছাড়ল। তবে ইউজিন যে এতোখানি করল, অর্থাৎ সম্পত্তির অর্ধেক অংশ বন্ধক রাখল লিজার কাছে লেখাপড়া করে, তার বিশেষ কারণও একটা ছিল। কারণটা স্ত্রী নয়। কেন না, এই লেন-দেনের ব্যাপারে লিজা রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণটা আসলে হল শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি। স্ত্রীর টাকা নেওয়া তিনি কি চোখে দেখবেন, কে জানে!

এইসব ব্যাপারে প্রথম বছরটা কাটল দারুণ অশান্তির মধ্য দিয়ে। কখনো ভাগ্য মুখ তুলে চেয়েছে, কখনো বা মুখ অন্ধকার করেছে। লাভের সঙ্গে ক্ষতির অঙ্কটাও সামান্য হয় নি। ভালোয়-মন্দয়, লাভে আর ক্ষতিতে, আশায় এবং দুর্ভাবনায়,—আর সব চেয়ে যেটা বিশ্রী, বিষয়-কারবার সবকিছু এক সঙ্গে ফেঁসে যাওয়ার নিত্য বিপদাশঙ্কায়, দাম্পত্য জীবনের প্রাথমিক মিষ্টতাটুকুও তিক্ত এবং বিস্বাদ হয়ে উঠল।

এর ওপর আর এক দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর স্বাস্থ্যভঙ্গ।

বিয়ের বছরেই, বিয়ের মাস সাতেক বাদে—শরতের এক সন্ধ্যায় এক দুর্ঘটনা ঘটল লিজার। স্বামী ফিরবেন শহব থেকে। তাঁকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসবার জন্যে লিজা বেরিয়েছিল গাড়ি নিয়ে। কিন্তু আগ-বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে ঘটল এক বিপদ। ঘোড়াটা এতোক্ষণ বেশ শান্তই ছিল, চলছিল ঠিক কদম ফেলে। হঠাৎ কি যে হ'ল তার—চঞ্চল হয়ে উঠল আর বজ্জাতি শুরু করে দিল। লিজা তো রীতিমত ঘাবড়ে গিয়ে গাড়ি থেকে মারল লাফ। লাফিয়ে পড়বার সময়ে গাড়ির চাকায় যে জড়িয়ে যায় নি কিংবা মাটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে কোনো বড় রকমের আঘাত পায় নি লিজা—এই যা রক্ষে।

কিন্তু বিপদ ঐখানেই শেষ হল না। শুরু হল মাত্র। লিজা এ সময়ে ছিল অন্তঃসত্ত্বা। বাড়ি ফিরেই অনুভব করল একটা অস্বাভাবিক বেদনার অস্বস্তি। 'পেন'টা বারে বারে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল না। গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয় গেল। আর এ ধাক্কা সামলে উঠতে অনেকদিন লাগল লিজার। বহু-প্রতীক্ষিত আসন্নপ্রায় একটি সৌভাগ্যের সূচনা অকালেই বিনষ্ট হল। প্রথম সন্তান সম্বন্ধে কতো আশা-ভরসা ছিল ইউজিনের। সব ভূমিসাৎ। তার ওপর স্ত্রীর শয্যাগ্রহণ। মনস্তাপ আর ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হল বৈষয়িক গণ্ডগোল। সব যেন ওৎ পেতে বসেছিল, এই সময়টার জন্যেই। এক কথায় বলা যায়—ভণ্ডুল। আর সেই ভণ্ডুলের সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করলেন শ্বশ্রূমাতা। লিজা বিছানা নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মা এসে

হাজির হলেন। জামাইয়ের বাড়িতে কায়েম হয়ে বসলেন বেশ কিছুদিনের জন্যে, মেয়ের শুশ্রূষা এবং রোগের তত্ত্বাবধানের অজুহাতে।

এরপর মন আর ভালো থাকে কি করে? বিয়ের প্রথম বছরটা অন্তত মানুষ পায় ও চায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। ইউজিনের বরাত কি বিশ্রী চেহারা নিয়ে এসেই দাঁড়াল, একেবারে সামনে!

তবু—এ সমস্ত অসুবিধা, হাঙ্গাম-হুজ্জৎ একটু একটু করে কাটিয়ে উঠল ইউজিন। বছরের শেষ দিকটায় যেন সুরাহা মনে হল। প্রথমত, ইউজিনের যেটা বহুদিনের আশা আর আকাঙ্ক্ষা—অর্থাৎ পিতামহের আমলের চাল-চলন নতুন যুগের উপযোগী করে ফিরিয়ে আনা, নষ্ট বিষয়-সম্পত্তির পুনরুদ্ধার করা—সেটা সাফল্যের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। অবিশ্যি খুবই ধীরে ধীরে, বাধাবিপত্তি কাটিয়ে হুঁশিয়ার হয়ে এগুতে হয়েছিল ইউজিনকে। তবু অবস্থার একটু উন্নতি হ'ল। এখন আব ঋণ শোধেব জন্য সমস্ত তালুকটাকেই বিক্রী করার প্রশ্ন বা প্রয়োজন হ'ল না। আসল দামী সম্পত্তিটা স্ত্রীর নামে লেখাপড়া করে দেওয়ার ফলে বেঁচে গেল। এবার, যদি বিট ফসলটা ভালোমত ঘরে ওঠে, আর দামটাও চড়া থাকে, তা হলে আসছে বছরে এমন সময়ে, তাব অভাব-কষ্ট কিছুই থাকবে না। অনটন দূর হবে; সংসাব লক্ষ্মীশ্রীতে হবে পুষ্ট ও স্নিগ্ধ। এই গেল প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ইউজিনেব স্ত্রীভাগ্য। স্ত্রীব কাছে যতই সে প্রত্যাশা করে থাকুক না কেন, এখন তাব কাছে সে যতটা পাচ্ছে তা কোনোদিনই সে কল্পনা করতে পারে নি। ভাবতে পারে নি ইউজিন, লিজা তাকে এতখানি পূর্ণ করে দেবে—ভরিয়ে রাখবে। লিজার কাছে যতখানি প্রত্যাশা ছিল মনে, বাস্তব জীবনে আর ব্যবহারে ইউজিন দেখতে পেল,—এ তার ঢের বেশি। কামনার অধীব আবেগ কিংবা উচ্ছ্বসিত, ব্যাকুল আগ্রহ—এগুলো তেমন হত না লিজার, যদিও ইউজিন চেষ্টা করেছিল তাকে জাগাতে। আর হলেও, তা এতো কম যে ঠিক বোঝা যেত না। কিন্তু অন্য একটা জিনিস পেল ইউজিন তার বদলে—যেটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস, অপ্রত্যাশিত

—দৈহিক আবেদনের অনেক উর্ধ্বে। মানসিক তৃপ্তি। এখন মনে হয় ইউজিনের—জীবন যেন অনেকটা সরল, সহজ হয়ে এসেছে। মনটা তার সন্তোষে ভরে থাকে, অকারণ খুঁত্‌খুঁতুনি আর ঘনিয়ে ওঠে না। বেশ খুশি খুশি ভাবে, স্বচ্ছন্দ দেহ-মন নিয়ে সুস্থ জীবন যাপন আবার সম্ভব হয়। নির্বিরোধ জীবন-প্রীতি আর তৃপ্তির সুনিশ্চিত ছাপ পড়ে তার মুখে। ঠিক বুঝতে পারে না ইউজিন—এই পূর্ণতার ভাব কোথা থেকে এল, কেমন করে সম্ভব হল এই অনেক-পাওয়া হৃদয়ের ভরপুর সুখ! কিন্তু হয়েছিল তাই।

এটা সম্ভব হয়েছিল নানা কারণে। লিজার সরল, সহজ বুদ্ধি আর ছলনার লেশ-সম্পর্কহীন নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার হল প্রধান কারণ।

ইউজিনের কাছে নিজেকে সে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিল, নিশ্চিহ্ন করে মুছে ফেলেছিল আপনার স্বতন্ত্র সত্তা। বিয়ের ঠিক পরেই লিজার মনে হ'ল—ইউজিন আর্তেনিভের মতন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সাধু আর মহৎ লোক পৃথিবীতে নেই। এটা শুধু নব-পরিণীতার স্বাভাবিক, প্রাথমিক উচ্ছ্বাস নয়। পুরুষের বক্ষোলগ্ন কুমারী-হৃদয়েব সঞ্চিত ভালোবাসার ব্যাকুল প্রকাশ নয়, সর্বস্ব-সমর্পণের গভীর আত্মতৃপ্তিও নয়। এটা হ'ল বিচার-সিদ্ধ মনোভাব, অন্তরের দৃঢ় ধারণা।

লিজার মনে ধারণা জন্মাল যে, ইউজিন যখন এতো ভালো, এতো উঁচু আর কর্তব্যপরায়ণ, তখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য তাকে মেনে চলা, তার প্রভুত্বকে প্রসন্নচিত্তে স্বীকার করা। ইউজিনকে খুশি করা, তার মন-যুগিয়ে চলা—এ ছাড়া অন্য কিছু করণীয় নেই কারুর কিন্তু আর পাঁচজনকে দিয়ে তাই করানো, তাদের বিশ্বাস জাগানো যখন সম্ভব নয়, তখন লিজাকেই একলা সে কাজ করতে হবে। যতদূর তার সামর্থ্য, তাই দিয়ে ইউজিনকে সে সন্তুষ্ট করবে। অক্ষুণ্ণ রাখবে স্বামীর অভ্রান্ত কর্তৃত্ব—অধিকার।

আর তাই করতে লাগল লিজা।

সমস্ত মন-প্রাণ যেন ঢেলে দিল ইউজিনের পেছনে,—তার সেবায় ও ও সন্তোষ-বিধানে। জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য দাঁড়ালো স্বামীর অন্তরকে

চেনা। লিজা তাই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করল ইউজিনের হৃদয়কে নিজের হৃদয় দিয়ে বোঝবার জন্যে। ইউজিন কি চায়, কি সে ভালোবাসে, কখন কি তার পছন্দ—এই সমস্ত তথ্য আর খুঁটিনাটি আবিষ্কারে, আন্তরিকভাবে স্বামীকে প্রীত করবার চেষ্টায়, তার মন বুঝে সেই মত চলবার আকুল আগ্রহে অধিকাংশ সময় কেটে যেত লিজার। এই নিত্য-নিয়ত অনুধ্যানে আর স্বামী-সেবার অনুবর্তনে সে কোনো কষ্টই গ্রাহ্য করত না। যত কঠিনই সে পরিশ্রম হোক, তাতে সে বিমুখ হবার পাত্রী নয়।

অনুরাগিণী স্ত্রীলোকের সংস্রব মানুষের মনে আনন্দই দিয়ে থাকে। কিন্তু ওরই মধ্যে যে-যে সদগুণ থাকলে তার সঙ্গসুখটা অতিমাত্রায় তৃপ্তিকর, কামনার বস্তু হয়ে ওঠে সে সমস্ত সদ্‌গুণের মধ্যে যেটি বিশিষ্টতম, লিজার চরিত্রে তার অভাব ছিল না। স্বামীর প্রতি তার যে প্রগাঢ় ভালোবাসা, সেই নিছক ভালোবাসার জোরেই সে ইউজিনের মনের গভীরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। ইউজিন নিজেকে যতখানি না চিনত, লিজা তাকে চিনত তারও বেশি। বুঝতে শিখেছিল স্বামীর প্রতিটি মনোভাব, সযত্নে অনুধাবন করতে শিখেছিল তার প্রতিটি ভাবান্তর। মনের গোপন অন্তস্তলে,—যেখানে চলছে নিত্য সূক্ষ্ম কম্পন, পড়ছে কখনো হালকা কখনো গভীর আলো আব ছায়ার জটিল রেখা—সেইখানে, সত্তার নিভৃত মর্মমূলে নামত লিজার সন্ধানী দৃষ্টি। ধরা পড়ত ইউজিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-দুঃখ-নৈরাশ্যের পলাতক রেশগুলি। স্বামীর চিত্তের গোপন কোণগুলি পর্যন্ত উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠত স্ত্রীর সহানুভূতির সন্ধানী দৃষ্টির আলোয়। তাই ইউজিনকে কখনো কোনো আঘাত সে তো নিজ থেকে দেয়ই নি, বাইরের কোনো আঘাত আসবার সম্ভাবনাতেও সে ব্যাকুল হয়ে উঠত। আড়াল করে ঘিরে রাখত ইউজিনকে। নিজেকে সে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিয়েছিল স্বামীর মানসিক অবস্থার সঙ্গে। স্বাভাবিক মমত্ববোধের দৃঢ় বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত তার দাম্পত্য প্রতিভা। সেই সহজ অথচ আশ্চর্য অভ্রান্ত বোশধক্তির সাহায্যেই লিজা নিয়ন্ত্রিত করে নিয়েছিল তার দিনানুদৈনিক জীবনের গার্হস্থ্য আচরণ এবং কর্তব্য।

তাই স্বামীর দুঃখ-দুশ্চিন্তা লাঘব করতে যেমনি তার ব্যগ্র চেষ্টা, স্বামীর স্ফূর্তি-আনন্দের পূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে, সে আনন্দকে তীব্রতর করতেও তেমনি তার স্বাভাবিক নিপুণতা। এক কথায়, স্বামীর মন-বুঝে চলা মন-যুগিয়ে কাজ করার কঠিন কৌশলটি ভালো ভাবেই লিজা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। যেসব ব্যাপার নিয়ে কোনো দিনই এযাবৎ সে মাথা ঘামায় নি,—যে-সমস্ত বিষয়ে তাব বিন্দু-বিসর্গ জ্ঞান বা কৌতূহল ছিল না,—সে সব ব্যাপার নিয়ে কেমন অনায়াসে ইউজিনের সঙ্গে সে আলাপ করে আজকাল! চাষ-বাস, ক্ষেত-খামার, কারখানার কাজ-কর্ম কিংবা জন-মানুষদের দিয়ে কাজ-করানো, খাটানো—এমন কি, মহালের লোকদের সম্বন্ধে মতামত দেওয়া—এসব বিষয় নিয়ে লিজা অবলীলাক্রমে ইউজিনের সঙ্গে আলোচনা করে। শুধু তাই নয়, কারখানা আর জমি-জমা-সংক্রান্ত ব্যাপারে ইউজিনকে সব সময়েই সে সুপরামর্শ দিয়ে থাকে। আজকাল ইউজিনেরও হয়েছে এমনি যে, সর্বক্ষণ, সর্বকর্মে লিজাকে না হলে তার চলে না। লিজার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, সরল সুচিন্তিত উপদেশ, সহজ বাস্তব বুদ্ধি ইউজিনের কাছে অপরিহার্য।

ইউজিনের কর্ম-জীবনে আর সাংসারিক জীবনে লিজার উপস্থিতি যে এতোখানি অত্যাবশ্যক হয়ে উঠছে, তার প্রধান কারণ হ'ল লিজা। যাবতীয় বিষয় দেখতে আর বিচার করতে শিখেছিল ইউজিনের চোখ দিয়ে। উভয়ের দৃষ্টি আর মন অভিন্ন বলে জীবনে এসেছিল পূর্ণতা, নিরাবিল শান্তি।

লিজা তার মাকে খুবই ভালোবাসত। কিন্তু যেদিন থেকে সে বুঝল ইউজিন মনে মনে তাঁর ওপর তেমন প্রীত নয়, বরঞ্চ উভয়ের পারিবারিক জীবনে অকারণ হস্তক্ষেপের জন্য রীতিমত বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট, সেদিন থেকে লিজাও যেন বদলে গেল। কোনো কিছু ব্যাপারে তর্কে অথবা মতামতে সে স্বামীর পক্ষ নিত। মধ্যে মধ্যে স্বামীর হয়ে কথা বলতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করে ফেলত লিজা, যে ইউজিনকে লজ্জায় পড়তে হ'ত তার দরুন। কোনো মতে সামলে নিত, পাছে কোনো অপ্রিয় ব্যাপার ঘটে।

এ ছাড়া লিজার চরিত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তার কোনো কাজেই হঠকারিতা কিংবা অসংযমের পরিচয় পাওয়া যেত না। ঘরকন্নার কাজ থেকে বাইরের সমস্ত ব্যাপারেই একটা ভদ্র, মার্জিত রুচির ছাপ পাওয়া যেত। হঠাৎ কিছু করে বসা বা বলে বসা, কিংবা কাউকে অকারণে চটিয়ে দেওয়া অথবা তার মনে আঘাত দেওয়া—এগুলো লিজার ধাতে নেই। সংসার আর সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কটা ছিল ধীর, স্থির, সাবধান ও সংযত। গা-জুরির চেয়ে বুদ্ধি-কৌশল যে কাজ দেয় বেশি,—এ সহজ সত্যটি লিজা ভালো ভাবেই জানত। তাই অশান্তি-উৎপাতের ত্রিসীমানায় তাকে ঘেঁষতে হ'ত না। নীরবে, নির্বিবাদে, পরিপূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চলত নিত্যকার জীবন। চট্ করে কেউ বুঝতে পারত না, এর মধ্যে লিজার কৃতিত্বটা কোথায়। কিন্তু একটু নজর দিয়ে লক্ষ করলেই বোঝা যেত, লিজার সর্ববিধ কর্মে আর আচরণে ছিল পরিচ্ছন্নতা, ভব্যতা আর শৃঙ্খলা। অত্যন্ত সুপরিমিত সুনিয়ন্ত্রিত ছিল তার জীবন-যাত্রার ছন্দ। বিয়ের অল্পদিনের মধ্যেই লিজা বুঝে নিয়েছিল ইউজিনের জীবন-আদর্শের ধরনটা কি। তার অনুরাগ আর অপছন্দ জিনিসগুলো তলিয়ে বুঝে সে এমন একটা পারিবারিক জীবনের ছক্ তৈরি করে নিয়েছিল যাতে বিরোধের সম্ভাবনামাত্র না সৃষ্টি হয়। ঘর-দোর সাজানো, গৃহস্থালীর কাজ, সংসার চালানো আর সামাজিক মেলামেশা—সমস্ত ব্যাপারেই লিজা সেই ছক্ মাফিক নির্দিষ্ট পথে চলত। পথ যেখানে আগে থাকতেই মসৃণ ভাবে প্রস্তুত, দ্বন্দ্বের অবসর কোথায় সেখানে? বিরোধের অবকাশ থাকলে তবে তো সংঘর্ষ! যেখানে মন বুঝে কাজ,—সুচিন্তিত আত্মসমর্পণে অখণ্ড প্রণতি, সেখানে উদ্ধত মতান্তর অথবা উগ্যত মনান্তর আসবে কি করে?

অবিশ্যি একটা মস্ত অভাব ছিল ওদের জীবনে। ছেলেপুলে কিছু হয় নি। কিন্তু হবার সময়ও পেরিয়ে যায় নি। অদূর ভবিষ্যতে আশা আছে তার।

সেবার শীতের গোড়াতেই লিজা গেল পিটার্সবুর্গে বড় ডাক্তার

দেখাবার জন্যে। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তিনি। বললেন, লিজার স্বাস্থ্যে তো কোনো খুঁত নেই। সন্তানাদি অনায়াসেই হতে পারে।

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল লিজার। বছর ঘুরতে না ঘুরতে লিজা বুঝল—সে অন্তঃসত্ত্বা।

সবই ভালো। কেবল একটা বড় গলদ। থেকে থেকে দুঃস্বপ্নের মতন তার কালোছায়া জীবনের সমস্ত আলো যেন শুষে নেয়। লিজার মনে যখন হিংসার আগুন জ্বলে ওঠে, তখন জীবনের সব সুখ-শান্তি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। মনে হয়, বাঁচবার কোনো অর্থ হয় না। অবিশ্যি এই ঈর্ষাকে সে দমন করে চেপে রাখত, বাইরে প্রকাশ করত না কখনো। কিন্তু তীব্র অন্তর্দাহে, হিংসার চাপা আগুনে লিজা প্রায়ই কষ্ট পেত।

ইউজিন আর কাউকে ভালোবাসতে পারবে না। কারুর সম্বন্ধে সে চিন্তা করতে পারবে না। এই হ'ল লিজার অন্তরের কথা। সে নিজে ইউজিনের যোগ্য কিনা—এই প্রশ্ন কোনো দিন তাকে চিন্তিত করে তোলে নি। কেননা, এসব ভাবনাকে লিজা আমলই দিত না। কিন্তু পৃথিবীর অন্য কোনো স্ত্রীলোক যে ইউজিনের যোগ্য নয়, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহই ছিল না। অতএব ইউজিনকে ভালোবাসবার মতন স্পর্ধা ও দুঃসাহস যেন কারুর না হয়। পাছে তাকে কেউ ভালোবেসে ফেলে—সেই দুর্ভাবনায় লিজা সন্ত্রস্ত, বিভ্রান্ত হয়ে থাকত।

৮

এইভাবেই চলল তাদের জীবন। ভোরবেলায় উঠ্‌ত ইউজিন, যেমন তার নিত্যকারের অভ্যাস। বিছানা ছেড়ে প্রত্যূষেই চলে যেত কারখানা কিম্বা গোলাবাড়ির দিকে। সেখানে তখন পুরো দমে কাজ চলেছে। তদারক করা দরকার। এক মুহূর্ত সময়ও অপব্যয় করবার মানুষ নয় ইউজিন। কখনো বা যেত মাঠের দিকে—ক্ষেতে কাজ কেমন চলছে দেখবার জন্যে।

আন্দাজ দশটা বেলায় ইউজিন বাড়ি ফিরত শ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে। প্রাতরাশ আর কফি নিয়ে এই সময়টা তারা বারান্দায় এসে বসত সবাই এক

সঙ্গে। মেরী পাভলোভনা, লিজা, ইউজিন নিজে আর একজন মামা। তিনি এই সংসারেই বাস করছেন কিছুদিন।

কফি খেতে খেতে কথাবার্তা চলত—নানান্ বিষয় নিয়ে। কখনো কখনো তর্ক-আলোচনা বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠত। তারপর সবাই উঠে যেত যে-যার ঘরে আর নিজের কাজে। মধ্যাহ্নভোজনের সময় পর্যন্ত বাড়ি আবার নিস্তব্ধ। বেলা দুটো আন্দাজ, আবার সবাই খেতে আসত, —মিলত খাবার টেবিলে। খাওয়া আর গল্প-গুজব শেষ হলে ঘরে বড় একটা কেউ থাকত না। বেরিয়ে পড়ত বেড়াতে—কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা গাড়ি করে।

সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরত ইউজিন। লিজা আর ইউজিন আরাম করে জমিয়ে তুলত চায়ের আসর। চায়ে চুমুক দিতে দিতে দু'জনে গল্প করত—এমনি কতো কথা, সারাদিনের কাজের হিসেব, জমানো খবর··· ···কখনো বা ইউজিন কিছু একটা পড়ে শোনাত লিজাকে আর লিজা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে চুপ করে শুনত, হাতে কোনো কাজ নিয়ে, সেলাই বা অমনি কিছু। তবে অতিথি-অভ্যাগত কেউ এলে ওরি মধ্যে একটু ব্যতিক্রম। স্রেফ গল্প-গুজব কিংবা সামাজিক আলাপ, লোক বুঝে। নয়তো একটু সঙ্গীতের আয়োজন—কারুর গান কিংবা পিয়ানো বাজনা।

কখনো কখনো ইউজিনকে বেরুতে হত কাজের উপলক্ষে। তখন বাইরে থেকে সে চিঠি লিখত লিজাকে। জবাবও মিলত নিত্য নিয়মিত, প্রতিদিন। এক এক সময়ে লিজাও সঙ্গে যেত। তখন বেশ জম্‌ত। স্ফূর্তিতে আমোদে সময়টা যেন কোথা দিয়ে কেটে যেত।

বিশেষ কোনো উৎসবে—যেমন, উভয়ের জন্মদিনে কিম্বা নামকরণের দিনে, নিমন্ত্রণ করা হত পরিচিত লোকদের। অতিথির দল আসত, জমে উঠত ছোটখাট পার্টি। ইউজিন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ করত লিজার সামাজিক রূপের মাধুর্য। কেমন সুন্দর, সহজ তার চলাফেরা! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘর-দোর। যত্ন করে টেবিল পাতা, জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখা। পরিপাটি করে সাজানো। কোথাও কোনো অগোছালো ভাব নেই। দেখে আন্তরিক

খুশি হয় ইউজিন। অভ্যাগত অতিথিদের পরিচর্যায় লিজার ক্লান্তি নেই। সকলের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তার প্রখর নজর। কোথাও ত্রুটি হয় না,—কোন্‌খানে কি দরকার, কোথায় কোন্‌ অসুবিধা, কোন্‌টা কেমন মানান্‌সই—সর্বত্রই লিজার স্নিগ্ধ দৃষ্টি, আতিথেয়তার কোমল প্রলেপ। ইউজিন শোনে আর দেখে—সকলেই লিজাকে পছন্দ করে। প্রীতিময়ী, অল্পবয়সী গৃহকর্ত্রীর শুভবুদ্ধির ওপরে সকলেরই আস্থা, অনুরাগভরা শ্রদ্ধা। ইউজিন দেখে। পরম তৃপ্তিতে হৃদয় যেন স্ফীত হয়ে ওঠে। লিজার প্রতি তার সহজ ভালোবাসাটা যেন আরো গাঢ়, আরো গভীর হয়ে ওঠে।

কাটছিল বেশ ভালোই। কোথাও কোনো গোলমাল নেই, আশঙ্কার কারণও নেই। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় লিজার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই যাচ্ছিল। অসুস্থতার বা দুর্বলতার কোনো চিহ্ন দেখা যায় নি। গর্ভস্থ শিশুর ভার সে অনায়াসে, প্রফুল্ল চিত্তেই বহন করছিল। প্রস্তুত হচ্ছিল প্রথম মাতৃত্বের আগামী শুভ দিনটির জন্যে। মনের কোণে হয়তো একটু আতঙ্কের ছায়া ছিল ঘনিয়ে। হয়তো একটু স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ছিল দু'জনেরই মনে—অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার কাল্পনিক অনুমানে। কিন্তু জোর করে সরিয়ে দিত ইউজিন ওসব ভয় আর অস্বস্তি। লিজাকে নিয়ে বসত, গল্প করত, ভুলিয়ে দিত। কখনো আলোচনা করত অনাগত ক্ষুদ্র আগন্তুকের ভবিষ্যৎ নিয়ে, মতলব ফাঁদত নানা রকমের। কখনো বা লিজার সঙ্গে কথাবার্তা চালাত শিশুকে কিভাবে মানুষ করা হবে, তাই নিয়ে। সন্তানের ভবিষ্যৎ, তার শিক্ষা-দীক্ষাকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠত তাদের কল্পনার সৌধ।

কি ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে, কিভাবে তাকে গড়ে তুলতে হবে আর সে সম্বন্ধে ব্যবস্থাই বা কি করা হবে—এসব ব্যাপারে শেষ সিদ্ধান্ত ইউজিনেরই হাতে—সে কথা বলাবাহুল্য। মনে মনে সে-ই সব ঠিক করে রেখেছে আর ইউজিনের মতামত লিজার পক্ষে চরম, শিরোধার্য। স্বামীর অভিমত আর ইচ্ছার বিপক্ষে কোনো মত বা ইচ্ছা প্রকাশ অথবা পোষণ

করা যে সম্ভব, লিজার কল্পনাতেও তা আসে না। তার কাজ হ'ল, সর্ববিষয়ে স্বামীর অনুগত হয়ে অনুকূল মত দেওয়া এবং সেই অনুসারে চলা।

ইউজিন ইতিমধ্যে পুরোদমে ডাক্তারী বই পড়তে শুরু করেছে। চিকিৎসা-শাস্ত্র আর শিশু-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সন্তানকে পালন আর গঠন করতে হবে—এই তার ধারণা ও প্রতিজ্ঞা। লিজা সব কথাতেই সায় দেয়, জেনে নেয় ইউজিনের বক্তব্য। আর প্রস্তুত হতে শুরু করে। আগাম তৈরি করে রাখে অজস্র ছোট ছোট জামা। ঠাণ্ডা আর গরম কাপড়ের টুকরো জমা হয়ে ওঠে। তৈরি হয় সুদৃশ্য দোলনা আর ছোট্ট নতুন গদির বিছানা। কোনোটা পাতবার জন্যে, কোনোটা বা শিশুকে শুইয়ে কোলে করে নিয়ে বেড়াবার জন্যে। ছোট্ট গদির সঙ্গে আবার ছোট্ট লেপ সেলাই করে জুড়ে দেওয়া—যেন নৌকার ওপর ছই। নরম খোলের মধ্যে কেমন আরামে শুয়ে থাকবে শিশু—আর দুল্‌বে দোল্‌নায় ········

এইভাবে এগিয়ে এল বিয়ের দ্বিতীয় বছর—আর একবার ঘুরে এল বসন্ত।

৯

ট্রিনিটি রবিবারের ঠিক আগেই সে ঘটনা।

লিজার তখন পাঁচ মাস চলছে। খুব সাবধানে থাকে। তবে শরীর তখনও অলস, মন্থর হয়ে আসে নি। সহজ, স্বাভাবিক ভাবেই কাজকর্ম করে, চলাফেরা করে—ঘুরে বেড়ায়। লিজার মা আর ইউজিনের মা—দু'জনেই আছেন বাড়িতে, লিজার শরীর আর স্বাস্থ্য তদারক করা দরকার কিন্তু লিজার পিছনে সর্বক্ষণ নজর দেবার অছিলায়, তাকে সাবধানে রাখবার চেষ্টায় শুরু হয় দু'জনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জমে ওঠে কর্ত্রীত্ব নিয়ে মন-কষাকষি। পাল্লা দিয়ে উপদেশের ঠেলায় মাঝখান থেকে লিজার হয় প্রাণান্ত। ইউজিন এই সময়টা সমস্তক্ষণই অন্যমনস্ক। বীজ-চারা জমিতে লাগিয়ে তাই নিয়ে নতুন পরীক্ষায় সে অহরহ ব্যস্ত। কেমন করে তাই

থেকে বীট্-চিনির কারবার ফলাও করে ফাঁদা যাবে, সেই চিন্তাতেই ইউজিন উন্মত্ত।

ট্রিনিটির ঠিক আগেই বাড়িটাকে ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে ফেলা দরকার, লিজা মনস্থ করলে। ঈস্টারের পর থেকে বাড়িতে আর হাত দেওয়া হয় নি। ঝুল-ময়লা-আবর্জনা জমে উঠেছে কোণে-কোণে। ধুয়ে-পাখলে আচ্ছা করে সাফ্ করা দরকার। দরকার আছে নিশ্চয়ই। তবে হাতে কাজ না থাকলে কিছু একটা করা আরো দরকার। আসবাবপত্র সরানো, খুঁজে খুঁজে ময়লা বের করে ঘরদোর ঝক্ঝকে পরিষ্কার করে তোলা মেয়েদের বাতিক।

লিজা ঠিক করলে—ঘরের চাকরদের দিয়ে শুধু হবে না। মেহনতের কাজ—অনেক সময় লেগে যাবে। তার চেয়ে বাইরে থেকে কয়েক দিনের জন্য জন দুই ঠিকে মেয়েমানুষ আনা ভালো। দিন পিছু পয়সা পেলে মেয়েদের দ্বারাই এ কাজ আরো ভালোভাবে উঠবে। কার্পেট ঝাড়া, আসবাব সরানো, ঝুল ঝাড়া, জানালা-দরজা, ঘরের মেঝে জল দিয়ে ধোয়া-মোঝা, বিছানা রোদ্দুরে দেওয়া, সাবান কাচা, চেয়ার টেবিলে দাগ মুছে সাফ করা, ওয়াড় পরানো, পর্দা ঝোলানো—অনেক কাজ। ঠিকে লোক নিতে হবে।

সকাল হতেই ঠিকে মানুষ এসে হাজির। তামার পাতে আগুন সাজিয়ে, উনুন ধরিয়ে তারা যথাসময়ে কাজ শুরু করে দিলে।

স্ত্রীলোক দু'জনের মধ্যে একজন হল স্টীপানিডা। কোলের শিশুকে সবে দুধ ছাড়িয়ে, কাজ-কর্মে বাইরে বেরুতে শুরু করেছে। জমিদার বাড়ির সরকার মশাইয়ের সঙ্গে সে এখন আছে। তারই সুপারিশে এই ঠিকে কাজে জুটেছে। অবস্থায় মন্দা পড়েছে। তাই জমিদার বাড়িতে ধোয়া-মোছার ঠিকে কাজটি সে অনেক অনুনয়-বিনয় করে যোগাড় করে নিয়েছে।

ইচ্ছে ছিল—জমিদারের নতুন গিন্নীটিকে একবার ভালো করে দেখে নেয়। স্বামী তার এখনও বাইরে-বাইরে কাজ করে। স্টীপানিডা একলাই থাকে কোলের ছেলে নিয়ে। আগেকার মতই এখনও সে স্ফূর্তিবাজ।

সুবিধাসুযোগ পেলে উড়ে বেড়ায় একটু-আধটু। চটুল স্বভাবটা তার যায় নি এখনো। প্রথমে সে ছিল বুড়ো দানিয়েলের সঙ্গে। বন থেকে জ্বালানি কাঠ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বুড়োর কাছে। ছাড়া পায় নি তার কবল থেকে। তারপর এল ইউজিন। মনিবের সঙ্গে বছরাবধি রইল। এখন আছে এই ছোকরা সরকারের সঙ্গে।

'এখন তো বাবুর বিয়ে হয়েছে, সুখ-সমাধা হয়েছে। নতুন বৌ এল ঘরে।' স্টীপানিডা ভাবে। ভারি সাধ হয় তার নতুন গিন্নীটিকে একবার দেখতে। কেমন লোক, ঘর-কন্না কেমন করে, কে জানে! লোকে তো বলে—ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মানুষ। নিখুঁত গেরস্থালি। ঘর-দোর নাকি ফিটফার্ট সর্বক্ষণ—চমৎকার সাজানো!

ইউজিন স্টীপানিডাকে দেখে নি বহুদিন। রাস্তায় কোলে ছেলে নিয়ে যেদিন স্টীপানিডা গির্জে থেকে ফিরছিল শাশুড়ীর সঙ্গে, সেইদিন তার সঙ্গে ইউজিনের শেষ চোখাচোখি। ইতিমধ্যে স্টীপানিডাও বড় একটা বেরুতে পায় নি। কাজের জন্য ইদানীং বাইরে যাওয়া সম্ভবও ছিল না তার পক্ষে। শিশুটি নিতান্তই বাচ্চা। তা ছাড়া, ইউজিন গ্রামের ভেতর দিয়ে তেমন যাতায়াত করত না পায়ে হেঁটে। তাই পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বললেই হয়।

সেদিন শনিবার। ভোরবেলায়, পাঁচটার মধ্যেই উঠে পড়ল ইউজিন। গেল সেই পতিত জমিটার দিকে—যেখানে ফস্‌ফেট ছড়ানোর কথা। জমিটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে কতো দিন। ওটার উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে হলে চাই সযত্ন চিকিৎসা আর শুশ্রূষা। ভোর বেলায় উঠে যখন ইউজিন বেরিয়ে যায়, তখনও স্ত্রীলোক দুটি কাজে লাগে নি। রান্নাঘর থেকে আগুন নিয়ে জল গরমের জন্যে স্টোভ ধরাচ্ছিল।

সকাল থেকে খেটেখুটে ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে বাড়ি ফিরল ইউজিন। মনটা তার ভালোই আছে আজ,—বেশ একটা তাজা, স্ফূর্তির ভাব। দেহটাও পরিশ্রমে সতেজ আর টান্‌ হয়ে উঠেছে।

বাড়ির ফটকের সামনে এসে ঘোড়া থেকে নাম্‌ল ইউজিন। লাগাম

ছেড়ে দিয়ে ঘোড়াকে জিম্মা করে দিল মালির কাছে। উচু উচু ঘাসের ডগায় চাবুকটা নাড়তে নাড়তে এগিয়ে এল ইউজিন। মুখে তার অস্ফুট কথার রেশ—'ফস্‌ফেটই ফলাবে'। একটু আগেই হয়তো কাউকে ওকথা বলে থাকবে। তাই অন্যমনস্কতার ফাঁকে ফাঁকে ঐ কথার টুকরোটা মুখের আগায় ভাসছে। থেকে থেকে ঐ একই কথা মুদ্রাদোষের মতন বেরিয়ে আস্‌ছে—'ফস্‌ফেটই ফলাবে!' কি ফলাবে—কোথায়—কখন—কার কাছে এসব না জেনে আর ভেবেই যেন কথাগুলো উচ্চারণ করছে ইউজিন। কি যেন আনমনা হয়ে ভাবছে সে—ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা উঁকি দিচ্ছে।

মেয়েরা তখন বাইরের উঠানে গাল্‌চেখানা এনে ধূলো ঝাড়ছে। অন্যান্য আসবাবও বাইরে আনা হয়েছে।

দূর থেকে এই সব দেখতে পেয়ে ইউজিন আপন মনেই বলে ওঠে, "ছাখো, কি কাণ্ড! লিজার মাথায় কি যেন ঢুকেছে আজকে, সারা বাড়ি-খানা সাফ করে তবে ছাড়বে দেখছি···ফস্‌ফেটই ফলাবে···এ যেন হুলস্থুল ব্যাপার!···কি জবর গিন্নী···হুঁ, গিন্নী ঠাক্‌রুণই বটে···"

মনে মনে কল্পনা করে নেয় লিজার পরিচিত মূর্তিখানি। কোমরে খাটো করে এপ্রন বাঁধা, ব্লাউসের হাতা গুটানো, হাতে হয়তো একটা লম্বা ঝাড়ন, আর মুখে সেই অনবদ্য হাসির দীপ্তি। যতবারই দেখে ইউজিন বাড়ি ফিরে এসে—লিজার সেই ঝক্‌ঝকে, শাদাসিধে পোশাক আর সৌম্য সহাস মুখ ঠিকই আছে। একটুও বদলায় না।

"বুট জোড়াটা এইবার ছাড়তে হয়—যা গন্ধ বেরুচ্ছে! মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময়ে সার লেগে গেছে। গিন্নীর আবার যা বর্তমান অবস্থা······গিন্নীর কি অবস্থা? ও হোঃ—ক্ষুদে মনিব যে আসছে—বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে···তাই"—ভাবতে ভাবতে হাসি ফুটে ওঠে ইউজিনের মুখে।

এগিয়ে যায় নিজের ঘরের দরজার দিকে। হাতলটায় হাত দেয়। আপন মনের খেয়ালে তখনও সে অন্যমনস্ক।

দরজাটা ঠেলে খোলবার আগেই, ভিতর থেকে সেটা আপনি খুলে

গেল। দেখতে পেল সামনা-সামনি একটি স্ত্রীলোক কাঠের বালতিতে জল ভরে এক হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছে। শুধু পা, জামার আস্তিন গুটানো।

তাকে রাস্তা দেবার জন্যে সরে দাঁড়ালো ইউজিন। মেয়েটিও একই সঙ্গে সরে দাঁড়ালো এক পাশে ইউজিনকে পথ দেবার জন্যে। ভিজে হাতেই বুকের কাছটায় বড় রুমালখানা ঠিক করে নিলে।

"নাঃ নাঃ তুমি যাও···যদি দরকার থাকে, এখন আমি ঘরে না-ই ঢুক্‌লুম"···বলতে বলতে সহসা থেমে যায় ইউজিন। ভালো করে চোখো-চোখি হতেই চিন্‌তে পারে···আর কথা বলতে পারে না।

হাসি-হাসি চোখে তাকায় স্টীপানিডা। ইউজিনের দিকে অপাঙ্গে কৌতুক দৃষ্টি হেনে স্টীপানিডা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। যাবার সময়ে স্কার্টের নীচের দিকটা ঠিক করে নামিয়ে দেয়।

"কী মুশ্‌কিল! এতো অসম্ভব ব্যাপার!"

ইউজিন আপন মনেই বলে ওঠে—উক্তিতে বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ইউজিন। অত্যাসন্ন আপদের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে যেন স্থৈর্যচ্যুতি ঘটে। হাতটা নাড়ে আর মুখের সামনে দোলাতে থাকে। যেন মুখের সামনে ভনভনে মাছির অহেতুক উপদ্রব···এক্ষুনি তাড়িয়ে দেওয়া দরকার।

মনটা বিরক্ত হয়ে ওঠে ইউজিনের। স্টীপানিডা যে এমন আকস্মিক-ভাবে তার দৃষ্টিপথের সামনে এসে সশরীরে হাজির হ'ল—এইটেই হ'ল গভীর অসন্তোষের কারণ। তাকে সে চোখ মেলে দেখল কেন? নিজেরই ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে ইউজিন। যেমন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ঢুকছিল, সেই রকম পাশ কাটিয়ে চলে গেলেই হ'ত! স্টীপানিডার দিকে নজর করবার কি কারণ ঘটেছিল!

ভারি বিশ্রী লাগে ব্যাপারটা। অকারণে মনটা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নিজের

অন্যমনস্ক, নির্বোধ দুষ্কৃতির জন্যে। ওদিকে তাকাতে কে মাথার দিব্বি দিয়েছিল ?

তবু না তাকিয়ে পারে নি ইউজিন। উপায় ছিল না। দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছিল স্টীপানিডার সতেজ, জীবন্ত শরীরটার ওপরে। কোমরের নীচেকার অংশটা ঈষৎ দুলে দুলে উঠছিল নৃত্যের স্বাভাবিক ছন্দে, কটিদেশ কম্পিত হচ্ছিল তার দৃঢ় অথচ লঘু পদক্ষেপে। ইউজিন চোখ সরিয়ে নিতে পারে নি, তাকাতে বাধ্য হয়েছিল তার সুঠাম বাহুর দিকে। তার সুডৌল কাঁধের শুভ্র কমনীয়তা, ব্লাউজের নরম পড়ন্ত ভাঁজগুলো, গাউনের আঁট-সাঁট ছাঁদের ভেতর দিয়ে প্রকাশিত দেহ-রেখার নম্র বঙ্কিমা আর মাংসল পায়ের গোছের সুঠাম গড়নটুকু ইউজিনের চোখ দুটিকে যেন জাদুমন্ত্রে স্তব্ধ, আবদ্ধ করে রেখেছিল।

স্টীপানিডা পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। জোর করে চোখ নামিয়ে নেয় ইউজিন।

"কিন্তু ওর দিকে তাকিয়ে মরছি কেন ?" ইউজিন নিজেকে ধিক্কার দিতে চেষ্টা করে। আর আপন মনেই বলে ওঠে: "যাই, এবার বুট জোড়াটা ছাড়ি গিয়ে···" তারপর নিজের ঘরের দিকেই এগিয়ে যায় ইউজিন।

কিন্তু পাঁচ-সাত পা যেতে না যেতেই হঠাৎ পিছন দিকে তাকিয়ে ফেলে ইউজিন। কিছু না ভেবেই, এমনি অকারণে—আর একবার দেখে নেয়। স্টীপানিডা তখন দালানের বাঁকের মুখে। হাসি-হাসি চোখে সে-ও ফিরে তাকায়।

"আঃ, কি যে করছি—কি যেন হয়েছে আমার! হয়তো ভাবছে—আবার···হয়তো কেন, নিশ্চয়ই ভাবছে এতক্ষণ!"

ঘরটা জল দিয়ে ধোয়া হয়েছে সবে। ভিজে আর স্যাঁৎসেতে লাগছে। আরেকজন স্ত্রীলোক,—বৃদ্ধ আর শীর্ণ গোছের মেয়েমানুষ—তখন বড়, মোটা লাঠি-বুরুশ দিয়ে ঘরের মেঝেটাকে জোরে জোরে ঘষছে, রগ্‌ড়াচ্ছে। ময়লা জল তখনও এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে। সন্তর্পণে পায়ের আঙুলের

ওপর ভর দিয়ে ইউজিন মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটে, পাছে ছিটে লাগে। এগিয়ে গেল দেয়ালের কাছে, যেখানে বুট-জোড়াটা রাখা ছিল। জুতো নিয়ে ইউজিন ঘর থেকে বেরুবে, ঠিক সেই সময়ে বুড়ো মেয়েমানুষটি ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল।

কি রকম একটা অস্বস্তি আর সন্দেহ উঠল ইউজিনের মনে। ওভাবে বেরিয়ে গেল কেন স্ত্রীলোকটি ? কে যেন ভেতর থেকে বলে ওঠে নিশ্চিত অনুমান করে—"এই স্ত্রীলোকটি যখন গেল, তখন স্টীপানিডা বোধ হয় আসবে এবার। ঘরে ঢুকবে একলা···"

একটা গরম ঝাঁজ বয়ে যায় ইউজিনের সর্বাঙ্গে। চোখমুখ কান সহসা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। "কী সাংঘাতিক! কি ছাই সব ভাবছি···আর কি করতে যাচ্ছি!"

বুট জোড়াটা খপ্ করে তুলে নিয়ে এক রকম ছুটেই বেরিয়ে যায় ইউজিন। ঘর থেকে দালানে গিয়ে দাঁড়ায়—পরে নেয় জুতো জোড়াটা, কোনো রকমে টাল সামলে দাঁড়িয়ে। তারপর বুরুশ দিয়ে গায়ের কোটটা ঝেড়ে নিয়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। দেখে দুই মা-ই হাজির সেখানে। টেবিলের উপর কফির সরঞ্জাম। ইউজিনের দেরী হচ্ছে দেখে কফি খাওয়ার পালা শুরু হয়েছে।

লিজা বোধ হয় এতক্ষণ তারই প্রতীক্ষায় ছিল। ইউজিনকে আসতে দেখে অন্য দরজা দিয়ে ঠিক একই সময় ঘরে এসে ঢুকল এবার।

লিজার দিকে আড়চোখে তাকায় ইউজিন। ভাবে—"উঃ, কী কাণ্ড! আর একটু হলেই—"

মনে-মনে বিভীষিকা দেখে যেন শিউরে ওঠে ইউজিন। আবার ভাবে ঃ "লিজা বিশ্বাস করে কতো আমাকে! জানে আমার স্বভাব পবিত্র, চরিত্র মহৎ—নির্দোষ···যদি সে জানত··· !"

লিজা মুখ তুলে চায় ইউজিনের দিকে। যেমন সে তাকায় নিত্যই, স্বামী যখন ঘরে ফেরে।

ইউজিনও তাকায়। দৃষ্টি তার প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে।

আজ ইউজিনের মনে হ'ল—কেন তা সে জানে না—লিজা বড় দুর্বল অসহায়। আজ যেন লিজাকে বেশি নিষ্প্রভ দেখাচ্ছে—কি রকম একটা পাণ্ডুর ছাপ তার মুখে—মুখখানা যেন আরো শীর্ণ, বেশি লম্বাটে হয়ে নেমে এসেছে চিবুকের কাছটায়···

১০

কফি খাওয়ার সময়ে কথাবার্তা হচ্ছিল—যেমন প্রায়ই হয়ে থাকে।

মেয়েলি কথাবার্তার ধরনটাই এই। কফি খাওয়াটা উপলক্ষ মাত্র। গাল-গল্পটাই আসল। কথা শুনে মনে হয়—প্রসঙ্গের চেয়ে পদ্ধতিটাই বুঝি বেশি দামী। কথাবার্তার মধ্যে কোনো যুক্তি বা পূর্বাপর সঙ্গতি থাকুক আর নাই থাকুক, অনেকক্ষণ ধরে সেটা চলে। বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তার অভাবটুকু অধিকাংশ সময়েই পুষিয়ে নেওয়া হয় বাক্য আর শ্লেষের চাতুরী দিয়ে।

বারান্দায় কফি খাওয়ার টেবিলে যে-মেয়েলি আলাপ-আলোচনা চলছিল, সেটা বেশির ভাগই অসংলগ্ন। একজন বৃদ্ধা যদি একটা কথা তোলেন, অপর জন তার থেকে একটা ফ্যাঁকড়া বার করেন, চলে যান অন্যতর অবান্তর প্রসঙ্গে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কিছুক্ষণ পরে আবার পুরানো কথাতেই ফিরে আসেন নানা অর্থহীন মন্তব্যের মধ্য দিয়ে। চলে আবার কথা-কাটাকাটি।

এতক্ষণ দুই বেয়ানে তাই চালাচ্ছিলেন। দু'জনে দু'দিকে বসে পরস্পরকে ঠোক্কর দিচ্ছিলেন। সুবিধা ও সুযোগমত একজন আর একজনের গায়ে ছুঁচ ফোটাচ্ছিলেন।

ইউজিন যখন বারান্দায় এসে ঢুকল কফি খেতে, তখন তার মন উত্তেজিত, অবসন্ন। লিজা মাঝখানে পড়ে খুব কৌশলের সঙ্গে লগি ঠেলছিল। সরু খালে অজস্র ঘোলা জল আর দু' দিকে পাড়ের কাছে যথেষ্ট কাদা আর পাঁক। কোনো মতে, সঙ্কীর্ণ একটুখানি বাক্য-স্রোতের

টানে, লিজা ছ'দিক বাঁচিয়ে কাউকে না চটিয়ে আর কাদা না ঘেঁটে, ঠেলছিল লগি ফুটো নৌকোয় বসে প্রাণপণে, সন্তর্পণে।

ভারি বিরক্ত লাগল লিজার। দুই বুড়ীতে কেন যে নিত্য-নিয়মিত অনর্থক কথা-কাটাকাটি করেন, দেখা হলেই শ্লেষবাণে পরস্পরকে জর্জরিত করতে থাকেন—বুঝে পায় না লিজা। মাঝখানে পড়ে ছ'জনকেই খুশি রাখতে লিজার হয় প্রাণান্ত।

স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে লিজা আন্দাজ করে নেয় কিছুটা। অনুমান করে নেয় তার বিরক্তির কারণ। তাই নিজের বিরক্তিটা চাপা দিয়ে মুখে একটু হাসি টেনে বলে লিজা—"ভারি খারাপ লাগছে আমার। তুমি ফিরে এলে, অথচ তোমার ঘর এখনও সাফ হ'ল না। তোমার ফেরবার আগেই ঘর মুছে পরিষ্কার করে রাখার কথা…"

সকলের দিকে চেয়ে, একটু থেমে আবার বলে: "কিন্তু কি করব বল? ধোয়া-মোছা অনেক দিন হয় নি। ঘর-দোরে এমনি জঞ্জাল জমেছে যে বলবার নয়…আগে থেকেই আমি বন্দোবস্ত করতে চাই…নইলে আর হবে না…"

ইউজিন বললে: "যাক্ গে—তুমি ভালো ঘুমিয়েছিলে তো? আমি তো সেই কখন ভোর বেলায় উঠে চলে গেছি"….

"হ্যাঁ—ঘুম ভালোই হয়েছিল। শরীর আমার ভালোই আছে।" কথার মাঝখানে লিজার মা ফোড়ন দিলেন:

"শরীর ভালো থাকবে কি করে ওর? একে তো এই অবস্থা। তার ওপর গুমোট চলছে অসহ্য। আর জানলাগুলো তো সব পুবমুখো। ভোর হতে না হতেই রোদ এসে পড়ে। আর বেলা যত বাড়ে, রোদও চড়া হয়। ঘর তেতে আগুন।" একটু থেমে ভার্ভারা আলিক্সভ্‌না বলে আবার, "জানালায় তো আর পর্দার বালাই নেই। আমার ঘরে কিন্তু ভিনিশিয়ন পর্দা। দরকার হলে, মোটা কাপড়ের ঝাঁপ ঝুলানো হত যাতে সূর্যের তাত না ঢুকতে পারে…."

মেরী পাভলোভনা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে জবাব দেন:

"কিন্তু দশটার পর থেকে তো রোদ্দুর সরে যায়! বাড়ি তখন ছায়ার মধ্যে পড়ে। আর আশপাশে বাগানের গাছ...."

"ঐ জন্যেই তো আরো খারাপ। বাড়িটা অস্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। ছায়ার আওতায় থাকলে রোদ্দুর ঢুক্‌বে কেমন করে? ভিজে, স্যাঁৎসেতে ঘর...অসুখ-বিসুখ তো হবেই।" ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না বলেই চলেন।

চড়া রোদ্দুরে বাড়ি গরম হয়ে ওঠে বলে নালিশ জানিয়ে পর মুহূর্তেই স্বাস্থ্যকর আলো আর হাওয়ার অভাবে বাড়িটা রীতিমত খারাপ বলে নিন্দা করা, এ দুটোর মধ্যে-যে কোনো পূর্বাপর সঙ্গতি নেই, ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না সেই সহজ অযৌক্তিকতাটুকু নিজেই ধরতে পারেন না। আপন মনেই বলে যান অসংলগ্ন কথা—কেউ শুনুক আর না শুনুক—"আমাদের বাড়িতে কিন্তু অন্য নিয়ম। আমাদের যিনি দেখেন, তিনি মস্ত বড় ডাক্তার। তিনি কি বলেন জানেন? তাঁর মত হচ্ছে যে, রোগীকে ভাল করে না জানলে রোগ ধরা শক্ত। আগে রোগীকে ভাল করে চিনতে হবে, তবে তো রোগ নির্ণয় আর বিচার। মস্ত নামকরা ডাক্তার তিনি—তাঁর মতামত তো আর ফেলনা নয়। আমরা এই ভাবেই তৈরি হয়েছি, জীবন কাটিয়েছি। ডাক্তারের মতামত অগ্রাহ্য করতে কখনো শিখি নি। আর কতো বড় ডাক্তার...ফি'র টাকাও চাট্টিখানি নয়—শুনলে অবাক্ হয়ে যাবেন··· আমাদের কাছে ভিজিট নেন একশো রুবল। তাও বিশেষ চেনাশুনা আর খাতিরের জন্যে। লিজার বাবা কিন্তু অন্য রকম মানুষ ছিলেন···উনি ডাক্তারীতে বিশ্বাস করতেন না। যত বড় ডাক্তারই হোক্—ওদের ওপর কোনো আস্থা ছিল না তাঁর। তবে আমার জন্যে টাকা ঢাল্‌তে কখনো কুণ্ঠিত হন নি।"

"যিনি ভালো লোক, তিনি তো হবেনই ঐ রকম। যেখানে স্ত্রীর স্বাস্থ্য আর শিশুর জীবন নিয়ে টানাটানি, সেখানে কি টাকা খরচের প্রশ্ন ওঠে? ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিন্তায় তিনি তো ব্যস্ত হবেনই···"

মেরী পাভলোভনা বেয়ানের কথায় সায় দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান।

ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না মেরীর নরম সুরে মনে মনে একটু খুশি হয়ে

ওঠেন। তবু দমবার পাত্রী নন। বক্তব্যটা তাঁর এখনো শেষ হয় নি···
···তাই কথার সূত্রটা টেনে আবার বকতে শুরু করেন—"হ্যাঁ,···শুধু ভালো মানুষ হলেই হয় না। হাত আর মন দরাজ হওয়া চাই। তবে, যে স্ত্রীর নিজের টাকার জোর আছে···অর্থ-সঙ্গতি আছে, তাকে আর স্বামীর ওপর তেমন নির্ভর করে থাকতে হয় না···" ভার্ভারা আঁড়চোখে সবার দিকে তাকান। ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ হাসির রেখা। গর্বের প্রসন্ন স্মিত হাসি। তারপর লিজার দিকে চেয়ে বলেন, "আর কি জানেন—যে ভালো স্ত্রী, সে স্বামীর মতেই মত দিয়ে থাকে। আমার নিজের তাই শিক্ষা, আর লিজাকেও আমি সেই শিক্ষাই দিয়েছি। তবে এতো কথা বলছি, মানে, লিজার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না বলে,···গেল বার অসুখের পর থেকেই ওর দেহটা দুর্বল হয়ে পড়েছে···"

"না, মা, আমার কিছুই হয় নি।" লিজা জোর দিয়ে বলে ওঠে। "দিব্বি তো আছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি। খারাপ আবার দেখলে কোন্‌খানটায়? যাক্ গে—কিন্তু তোমার তো দুধ-মালাই ফুটিয়ে দেওয়া হয় নি। দেখছি·· "

"না ; আমার লাগবে না। কাঁচা দুধ আর ঠাণ্ডা ক্রীমেই চলবে···"

"লিজা, তোমার মাকে আমিও বলেছিলুম"···মেরী পাভলোভনা তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন একটু অপ্রস্তুতভাবে। "বলেছিলুম, গরম দুধ-মালাইয়ের কথা। কিন্তু উনি তো নিতে চাইলেন না···"

"নাঃ, আজ আর কিছু দরকার নেই হাঙ্গামার।"

যেন একটা অপ্রীতিকর আলোচনা থামিয়ে দিতে চান, সেই রকম ভঙ্গিতে কথাটা শেষ করেন ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না। কণ্ঠে তাঁর উদার ক্ষমাশীলতার কমনীয়তা। বেয়ান ঠাকুরুণের কৈফিৎটুকু যেন নিতান্তই অনাবশ্যক···বিজয়িনীর মত গ্রীবা ঘুরিয়ে জামাইয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। জিজ্ঞাসা করেন, "তারপর, ইউজিন, আজকের খবর বল দিকিনি। তোমার ক্ষেতে ফস্‌ফেট ছড়ান হ'ল?"

লিজা দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ক্রীম আনবার জন্যে।

"আমার কিন্তু আর ক্রীম চলবে না। সত্যিই আর দরকার নেই।"

ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না চেঁচিয়ে বলেন। লিজা শুনেও শোনে না।

"লিজা, লিজা—আস্তে চলো। অতো ছুটে যেয়ো না..."

মেরী পাভলোভনাও বলে ওঠেন সঙ্গে সঙ্গে। তারপর বেয়ানের দিকে চেয়ে বলেন, "এরকম অবস্থায় ওর জোরে জোরে চলাফেরা কিংবা ছুটোছুটি করা মোটেই উচিত নয়। ওতে খারাপ হয়...হঠাৎ একটা কিছু গণ্ডগোল বেধে যেতে আর কতক্ষণ!"

"কিছুতেই কিছু হয় না," ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না গম্ভীর কণ্ঠে রায় দেন। "খারাপ কিছুতেই হয় না, যদি মনে শান্তি থাকে।" কথাটা এমন সুরে, এমন হেঁয়ালীর ধাঁচে বললেন ভার্ভারা যে বাইরের যে-কোনো লোক সেখানে উপস্থিত থাকলে নিশ্চয়ই মনে করে বসত, একটা কিছু ব্যাপার আছে। মনের গোপনে অশান্তি সম্পর্কে একটা কিছু তির্যক্ ইঙ্গিত করা হচ্ছে। অথচ ব্যাপারটা মোটেই ঘোরালো নয়। ভার্ভারা নিজেই ভালো করে জানেন যে, তাঁর মন্তব্য অকারণ এবং নিষ্প্রয়োজন। তাঁর উক্তির পিছনে কোনো সত্যই নেই। তবু ভারিক্কি চালে সবজান্তা সুরে কথা বলা তাঁর অভ্যাস। নইলে মতামতের গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য যায় কমে। সহজ কথার সঙ্গে অবাস্তব কথা জড়িয়ে, ঘুরিয়ে, ফেনিয়ে বলাটাই তাঁর মতে বিজ্ঞতা ও মর্যাদার পরিচয়।

লিজা ফিরে এল ক্রীম্ নিয়ে। ইউজিন কফি খাওয়া শেষ করে বসে রইল মুখ গোমড়া করে। মেজাজ তার অপ্রসন্ন। এ রকম বৃদ্ধার বাঁকা-বাঁকা কথা আর শ্লেষ-নিপুণ অন্তর-টিপুনিতে সে অবিশ্যি অভ্যস্ত। কিন্তু আজ বড় বিশ্রী লাগছে ইউজিনের। মাথা নেই, মুণ্ডু নেই—খালি বজর-বজর! এতো বাজে কথাও মানুষ অকারণে বকতে পারে! কি যে লাভ হয় ওদের, ঈশ্বর জানেন!

ইউজিন চাইছিল একটু চুপচাপ। চাইছিল স্তব্ধতা, শান্তি। খুঁজছিল আপন মনে নির্জন চিন্তার একটুখানি অবসর। মনটা আজ বিক্ষুব্ধ হয়ে রয়েছে। ঘর-ধোয়া ব্যাপার নিয়ে এইমাত্র যা ঘটে গেল, স্টীপানিডার

প্রসঙ্গে যেসব চিন্তা মাথায় এসে বাসা বেঁধেছে,—তার ফলাফলটা কি, ব্যাপারটা কতো দূর গড়াতে পারে—এই সব ভাবনাই এখন তার মন জুড়ে রয়েছে। তাই দুই বেয়ানের সেয়ানা বোকামি তার অসহ্য লাগছে। নিভৃত চিন্তাস্রোতে রীতিমত বাধা পড়ছে।

কফি খাওরা শেষ করে ভার্ভারা আলেক্সিভ্না উঠে গেলেন বারান্দা থেকে। মুখখানা ভারি ভারি। বসে রইলেন মেরী পাভলোভনা আর ইউজিন ও লিজা।

পরস্পর একটু মুখ চাওয়চাওয়ি হ'ল মাত্র। তারপর আবার কথাবার্তা শুরু হ'ল। বেশ সহজ, সরল কথাবার্তা···। কথাবার্তা চলল বটে কিন্তু জমল না। লিজার মনটা সূক্ষ্ম, দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ। তাই চট্ করে বুঝে নিলে, স্বামীর কোথায় কি যেন হয়েছে। কোনো একটা চিন্তা ইউজিনের মনকে পেয়ে বসেছে, ক্লিষ্ট করে তুলেছে। স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করল লিজা, "কি হয়েছে তোমার, বলো তো? কোনো খারাপ খবর পেয়েছ নাকি?"

লিজার আকস্মিক প্রশ্ন একটু বিচলিত বোধ করে ইউজিন। এর জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। একটু সামলে নিয়ে জবাব দেয়, "নাঃ, কিছু হয় নি তো।"

প্রত্যুত্তরে সন্তুষ্ট হতে পারল না লিজা। মাঝখান থেকে তার নিজেরই দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেল। ইউজিনের যে কিছু হয়েছে এবং বেশ কিছু হয়েছে, সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই। ইউজিনের চোখে-মুখে একটা ক্লেশকর ভাবনার ছাপ এতোই সুস্পষ্ট যে, ভুল করবার কারণ থাকতে পারে না। কি সেই ব্যাপার—যার চিন্তায় সে এতোক্ষণ মগ্ন? যে-চিন্তার উত্তাপে ইউজিনের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, ললাট কুঞ্চিত আর ভ্রূ-কুটিল দৃষ্টি? উত্তেজনার নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে, স্পষ্টই বুঝতে পারে লিজা, যেমন পরিষ্কার বোঝা যায় দুধে মাছি পড়েছে। কিন্তু ইউজিন সেটা এড়িয়ে যেতে চায়, চাপ্তে চায়···কি এমন গোপনীয় ব্যাপার—যেটা কষ্ট দেয়, দুশ্চিন্তায় ফেলে, সহজ ও সুস্থ মানুষকে বিব্রত, এমন কি উৎপীড়িত করে তোলে, অথচ মুখ ফুটে বলবার নয়···?

লিজা ঘটা করে ভাবতে বসে। কড়া নজর রাখে ইউজিনের মুখের ওপর। সূক্ষ্ম সংবেদনায় আর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে যেন ইউজিনের ভাবান্তরের প্রকৃত তাৎপর্য ধরে ফেলবে সে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে যে যার ঘরে চলে গেল।

এই সময়টা বিশ্রামের। সকলেরই অবসর। হাতে কোনো কাজ থাকে না। ইউজিন চলে গেল তার পড়বার ঘরে, যেমন সে গিয়ে থাকে প্রত্যেক দিন, দুপুর বেলায়।

অন্যদিন লাইব্রেরি থেকে এক-আধখানা বই টেনে নাড়ে-চাড়ে ইউজিন। আজ আর কিছু ভালো লাগছে না তার। বইও খুলল না, চিঠি-পত্র যা থাকে লেখবার এই সময়টা তা-ও লিখল না। খালি বসে রইল চুপ্‌চাপ। একটার পর একটা সিগারেট ধরায়, অন্যমনস্কভাবে খেয়ে যায়। আর ভাবে। সে ভাবনার যেন অন্ত নেই।

বিয়ে হয়ে যাবার পর থেকে ইউজিনের ধারণা জন্মেছিল যে, মন তার কুভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অন্য স্ত্রীলোক-ঘটিত কোনো চিন্তাই তার মনে আর ছায়াপাত করতে পারবে না। নিজে থেকে প্রশ্রয় দেওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু আজ এ কি হ'ল? কামনার দুষ্ট ক্ষত তা হলে কি এতোদিন চাপা পড়ে ছিল? সুবিধা-সুযোগ বুঝে আবার আত্মপ্রকাশ করেছে? যে-অস্বস্তিকর ব্যাপার তার জীবন থেকে ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বলে সে ইতিমধ্যে আত্মপ্রসাদ অনুভব করছিল, সেই ব্যাপারের অপ্রত্যাশিত পুনরাবির্ভাবে ইউজিন রীতিমত সন্ত্রস্ত, আতঙ্কিত হয়ে উঠল।

বিয়ের পর থেকে এ ভাবটা এতোদিন তার হয় নি। অবদমিত ক্ষুধার অছিলা ছিল না কিছুই। নিজের স্ত্রীর ছাড়া এ ধরনের দেহাসক্তি বা যৌন আকর্ষণ ইউজিনকে টানতে পারে নি। না স্টীপানিডা—যে স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রাগ্‌-বিবাহিত জীবনে ঘটেছিল একটা অবৈধ মিলন, না অন্য কোনো তৃতীয় রমণী। বিয়ের আগে দেহের যে-চাঞ্চল্য, মনের গভীর

অপ্রসাদ থেকে থেকে নাড়া দিয়ে যেত, লিজাকে কাছে পাওয়ার পর থেকে সে ধরনের মনোভাব ইউজিনকে আর পীড়িত করে নি।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিল ইউজিন। ভেবেছিল—এতোদিনে তার মুক্তি হ'ল। দেহানুরক্তির প্রচণ্ড জাছুমন্ত্র কেটে গিয়েছে ভেবে তার আনন্দের সীমা ছিল না।

কিন্তু আজ? হঠাৎ এই যে দেখা হয়ে গেল ছু'জনের, ঘটনার ফেরে, হয়তো এর কোনো অর্থ নেই, পিছনে নেই সুবিদিত পরিকল্পনা। নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপার উভয়ের এই আকস্মিক সাক্ষাৎ। আপাতদৃষ্টিতে এটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ হয়তো নয়, অন্তত গুরুত্ব আরোপ করা চলে না। তবু....তবু ইউজিন বুঝতে পারল, তাকে বুঝতে হ'ল স্থির মুহূর্তে আত্ম-বিশ্লেষণ করে—সে আজও মুক্ত নয়। দেহ-আবেদনের উর্ধ্বে সে উঠতে পারে নি।

মন তার পীড়িত, ছুশ্চিন্তায় খিন্ন। কিন্তু ইউজিনের মানসিক অবসাদের কারণটা হ'ল অন্য। স্টীপানিডাকে সে যে আবার কাছে পেতে চায়, উপভোগ করতে চায় তার চির-নবীন দেহ-সৌন্দর্যকে অথবা হাল্কা মানসিক ছুর্বলতার কাছে ইউজিন পরাজয় স্বীকার করে নিজেকে ছেড়ে দিতে চায়—এই চিন্তাটাই তার মন-খারাপের প্রকৃত কারণ নয়। কেন না, স্টীপানিডাকে আবার অঙ্কশায়িনী করে নেওয়া সে কল্পনাতেও আনতে পারে না। ভাবতেই পারে না, কেমন করে সে আবার নিজেকে নিজের কাছে এতোখানি খেলো করে ফেলবে।

ইউজিনের ছুশ্চিন্তার কারণটা হ'ল স্বতন্ত্র। তার অবসাদ আসছে সূক্ষ্ম ও নির্মম বিচার-বুদ্ধি থেকে।

মনের গোপন গহনে যে কুভাবটা এখনও টিকে রয়েছে, এইটেই হ'ল তার আসল উদ্বেগ। অবচেতন সত্তায় প্রাথমিক জৈব প্রবৃত্তি সুপ্ত হয়ে থাকলে এখনও যে বলবৎ আছে—এইখানেই ইউজিনের আতঙ্ক ঘনিয়ে ওঠে। সাবধানে থাকতে হবে তাকে, অত্যন্ত সন্তর্পণে—যেন অতর্কিত আক্রমণে তাকে কাবু করে না ফেলে....কড়া লাগামে টেনে রাখা দরকার।

চেষ্টা করলে, মনের জোর থাকলে ও ভাবটাকে দমন করে ফেলা এমন

কি শক্ত কাজ ? ইউজিন ভাবে। দমন করতেই হবে, যে-কোনো উপায়ে ....অঙ্কুর অবস্থায় বীজশুদ্ধ উন্মূলিত করা চাই। আর তা করবার মত মনের দৃঢ়তা এবং আত্মপ্রত্যয় আছে ইউজিনের, সে কথা সে জানে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কোনো দ্বিধা নেই তার মনে।

বসে বসে সিগারেট টানে আর ভাবে ইউজিন। মনের জোর যেন জোয়ার বইয়ে দেয়। খুশিতে গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, উঠে পাইচারী শুরু করে।

পোড়া সিগারেটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে আসে ইউজিন। ওহোঃ, কাজ তো এখনও বাকি। এতক্ষণ অন্যমনস্ক চিন্তায় খানিকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। একখানা চিঠির জবাব দেওয়া হচ্ছে না বহুদিন, সেটা লিখে ফেলতে হয় এই বেলা। আর, একখানা কাগজে দলিলের একটা খসড়া তৈরি করতে হবে। দেরি করে লাভ নেই। চেয়ারটা টেনে নিয়ে লেখবার টেবিলে ইউজিন ঝুঁকে পড়ে বসে, শুরু করে দেয় কাজ।

লিখতে লিখতে আর কাজ করতে করতে মনের চাঞ্চল্য আর দুশ্চিন্তার কথা ভুলেই যায় ইউজিন! লেখা শেষ করে টেবিল থেকে সে উঠে পড়ল। তারপর চলল আস্তাবলের দিকে। ঘোড়াগুলোকে সে একবার নিজে দেখে রোজই, এই সময়ে।

আর কি আশ্চর্য—যেন দৈবের চক্রান্ত! ঘটনাগুলো যেন আগে থাকতে সব সাজানো থাকে। তারপর যোগাযোগ হয়ে যায়, একত্র এসে জড়ো হয়। কেমন বেমালুম মিলে গিয়ে একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে! সন্দেহ হয় যেন যোগসাজস।

ইউজিন ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় পড়ল। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেই গাড়ি-বারান্দা পেরিয়েছে, অমনি কোথা থেকে কি যেন একটা ঘটে গেল। দুর্ভাগ্য ইউজিনের যেন ওৎ পেতে বসে ছিল। বাঁ দিক দিয়ে দেয়ালের বাঁক থেকে হঠাৎ যেন বেরিয়ে এল লাল রঙের স্কার্ট আর লাল রঙের রেশমী রুমালখানা। আকস্মিক দৈব ঘটনাই হোক, আর ইচ্ছে করে

চোখের সামনে এসে দাঁড়ানোই হোক, ব্যাপারটা ঘটে গেল এক লহমায়। তলিয়ে দেখবার অবকাশ হোল না। চলে গেল সামনে দিয়ে ইউজিনের, হন্‌হনিয়ে। তাড়াতাড়ি যাবার চেষ্টায় হাত দু'খানা দুলছে। সর্বাঙ্গে কেমন একটা দোলন-নাচের ভঙ্গী। শুধু সামনে দিয়ে চলেই গেল না, দেখিয়ে গেল বেশ একটু ভঙ্গিমা। ডান দিকে কয়েক পা গিয়ে, হঠাৎ ছুটতে লাগল আস্তে আস্তে—সামনে যে-পরিচারিকাটি যাচ্ছিল, তাকে ধরবার জন্যে। দেখালো যেন কর্মব্যস্ত ভাবখানা। কিন্তু ওরি মধ্যে বেশ রঙ্গ-ভরা সঙ্কোচ। ছলনাময়ীর অবলীলা।

আবার ভেসে উঠল চোখের সামনে পুরানো দিনের সেই অবিস্মরণীয় ছবি। একটি হলদে দুপুব···বুড়ো দানিয়েলেব ছোট্ট কুঁড়েঘরখানার পিছনে ঢেউখেলানো পোড়ো জমিব খোন্দল···অদূরে কাঁটাবন···আশে-পাশে দু-চারটে প্লেন গাছ···ছায়ায় ঘেরা একটুখানি পরিষ্কার নিভৃত জায়গা। ···আর সেইখানে, পরিচিত পোশাকে, উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে স্টীপা'নিডা···মুখে কি যেন একটা পাতা চিবুচ্ছে।

কল্পনায়, মানসচক্ষে ছবিটা আশ্চর্যরকমের স্পষ্ট আর জীবন্ত হয়ে যেন এগিয়ে আসে ইউজিনের বুকের কাছে। যেন নিঃশ্বাস আর বুকের স্পন্দন শোনা যায়। মুখে-চোখে হাসিব ঝিলিক আর ধবধবে শাদা দাঁতের পুরন্ত ঠোঁটের টানটোনগুলো কি এক ইন্দ্রিয়জ উন্মাদনা যে জাগায়, তা বলবার নয়। দেহটা ইউজিনের যেন শিরশিরিয়ে ওঠে। হাত মুঠো করে, শরীরটাকে টান করে শক্ত হয়ে খানিক দাঁড়ায় ইউজিন। তারপর আপন মনেই বলে ওঠে: "নাঃ, অসম্ভব। এভাবে আর গড়াতে দেওয়া উচিত নয়···"

স্ত্রীলোক দুজন প্রাচীরের আড়ালে চলে গেল। একটুখানি অপেক্ষা করে ইউজিন সোজা চলল কাছারী-বাড়ির দিকে। মন তার কঠিন।

দুপুর বেলায় খাওয়ার জন্যে থাকে নির্দিষ্ট খানিকটা সময়। এখন

বিশ্রামের ঘণ্টা। এ সময়ে সরকার মশাইকে পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই, মনে মনে আশা করে ইউজিন।

পাওয়াও গেল। দুপুর বেলার খাওয়া সেরে মাধ্যাহ্নিক তন্দ্রাটুকু উপভোগ করে সবে উঠেছেন সরকার মশাই। আড়ামোড়া ভেঙ্গে আর গোটা কয়েক হাই তুলে দেহের জড়তাটুকু কাটিয়ে নিচ্ছেন। একজন চাষী হাত-পা নেড়ে অনেক কথাই বোঝাচ্ছে তাঁকে। সরকার মশাই অলসভাবে কথাগুলো আধ-বোজা চোখে শুনছেন বলে মনে হল।

"ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্……।" ইউজিন একটু উচ্চকণ্ঠেই হাঁক দিলে।

শশব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলেন সরকার মশাই। বল্লেন, "আমায় ডাকছেন, হুজুর ?"

"হ্যাঁ, দরকার আছে একটু আপনার সঙ্গে…"

"বলুন, হুজুর…"

"আপনার কাজ সেরে নিন আগে…কি যেন বলছিলেন ওকে…?"

চাষীর দিকে ফিরে তাকালেন সরকার মশাই।

বললেন, "ওটাকে তুলে নিয়ে আয় না মাঠ থেকে…"

"বড্ড ভারী যে বাবু…" চাষীটা বলে সরকার মশাইকে।

"কি হয়েছে ?" জিজ্ঞাসা করে ইউজিন।

"কিছু না—একটা গাইয়ের বাচ্চা হয়ে পড়েছে মাঠের মধ্যে, হুজুর। এখুনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি…ঘোড়া জুতে মাল-টানা গাড়ি-খানা পাঠিয়ে দিচ্ছি…গাই আর বাছুরটাকে তুলে নিয়ে আসুক। ওরে কে আছিস ? নিকোলাচ্ লাইসুখ্‌কে বলে দে না, গাড়িটা বার করুক·· "

চাষীটা নিজেই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল কাছারী-বাড়ি থেকে, খবরটা পোঁছে দিতে। সরকার মশাইয়ের হুকুম…খোদ্ মনিব স্বয়ং দাঁড়িয়ে কাছারী-ঘরে। ব্যাপারটা ভীষণ জরুরী।

"আপনি জানেন কিনা জানি না, সরকার মশাই…" কথাটা উত্থাপন করতে গিয়েই ইউজিন লজ্জায় আরক্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে নিজের সঙ্কোচ। তবু জড়তা কাটিয়ে জোর করেই বলে…"হয়তো আপনি শুনে

থাকবেন, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্, যে আমি—বিয়ের আগে একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলুম। মানে ঠিক সোজা পথে থাকতে পারি নি…"

হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে থাকে ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্। এমন ভালো মনিবের জন্যে একটু দুঃখ বোধ না করে পারে না। বলে, "আপনি কি স্টীপানিডার কথা বলছেন?"

"হ্যাঁ…তা দেখুন, ওকে বাড়িব ঠিকে কাজে নিযুক্ত করাটা ঠিক উচিত হয় নি, নয় কি? মানে, বাড়ির মধ্যে ও হামেশাই যাতায়াত করছে · আমার পক্ষে সেটা একটু বিশেষ সঙ্কোচেব কারণ, ভারী বিশ্রী লাগছে ব্যাপারটা—"

"আমার মনে হয় ছোট নায়েব ভানিয়াই ওকে ব্যবস্থা করে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে…"

"হ্যাঁ…একটু দেখবেন তা হলে ··আর—"

নিজের সঙ্কোচ ঢাকবার জন্যে ইউজিন কথাটা তাড়াতাড়ি উল্‌টে দিয়ে বলে, "আর বাকি ফস্‌ফেটগুলো এইবাব জমিতে ছড়িয়ে দিলে হয় না… কি বলেন?"

"এখনি যাচ্ছি ক্ষেতে, গিয়ে বন্দোবস্ত কবছি…আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন…।" কথাটা শেষ হল এখানেই।

ইউজিনেব উত্তেজনা এইবার কমে যায়। শান্ত হয়ে আসে মন। ইউজিন ভাবে, বছরাবধিকাল যদি কেটে গিয়ে থাকে স্টীপানিডার অদর্শনে, তা হলে বাকিটাও কাটবে। ও চলে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে নিশ্চয়ই।

"তা ছাড়া" ইউজিন মনে মনে বিচার কবে, "ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্ ছোট নায়েব আইভানকে এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই বলবে। আইভান তখন স্টীপানিডাকে ডেকে বলবেই। তা হলেই ও বুঝবে যে, আমি চাই না… দেখা-সাক্ষাৎ তখন বন্ধ হয়ে যাবে। মানে সম্ভবই হবে না…"

ভেবে খুশি হয় ইউজিন। জোর করে লজ্জার মাথা খেয়ে সরকার মশাইয়ের কাছে গিয়ে সে যে অনুরোধ জানাতে পেরেছে, তাতে সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্-এর সামনে এই ব্যক্তিগত

প্রসঙ্গ উত্থাপন করাটা খুব সহজ হয় নি। 'কিন্তু সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়ে তাকে বলে আসা সত্যি মনের দৃঢ়তার পরিচয়। ইউজিন সেটা পেরেছে। আবার পিছ্‌লে পড়ার আগেই সে সাবধান হয়েছে। আর ওসব কিছু হতে দেবে না সে। গোড়া মেরে ব্যবস্থা করে এসেছে, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্‌-এর কাছে—যাতে স্টীপানিডা এ বাড়িতে আর না ঢোকে।

"ভালোই হ'ল" ইউজিন ভাবে, "অনেক ভালো। ও রকম ধোঁকার চেয়ে এ হাজার গুণে ভালো হ'ল। মনের মধ্যে ছুনিয়ার লজ্জা, সঙ্কোচ, দ্বিধা আর সন্দেহ নিয়ে বাস করার চাইতে নিজের হাতে কাটান-ছেঁড়ান করে দেওয়াই ভালো। এক মুহূর্তের সঙ্কোচ জয় করে চিরজীবনের পরিতাপ দূর করা ভালো নয় কি? নিশ্চয়ই ভালো..." ইউজিন শান্ত হয়ে আসে। উদ্বেগ কেটে গিয়ে মন আত্মপ্রসাদে পূর্ণ হয়, আর অতীত পাপস্মৃতির চিন্তাতেও গা'টা যেন শিউরে ওঠে।

এই ভাবে আরও কিছুদূর গড়াতে দিলে ব্যাপারটা কি রকম ঘোরালো হয়ে উঠত? পথটা কি পিছল হয়ে উঠত না? মনে মনে কল্পনা করে ইউজিন। অদূর ভবিষ্যতে অধঃপতনের নিশ্চিত সম্ভাবনার স্মৃতি যেন সারা গায়ে শিউরানি লাগিয়ে দেয়। বড় জোর বেঁচে গেল ইউজিন এ যাত্রা।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্‌-এর সঙ্গে এইসব কথাবার্তা বলার ফলে ইউজিনের মন এক হিসেবে অনেকটা শান্ত হয়ে এল।

অপর কোনো ব্যক্তির সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের উল্লেখ রীতিমত অবাঞ্ছনীয় প্রসঙ্গ। কিন্তু সেই নিতান্ত স্বাভাবিক লজ্জা-সঙ্কোচ কাটিয়ে, অথচ গাম্ভীর্য অবলম্বন করে সরকার মশাইয়ের কাছে স্টীপানিডার কথাটা যে তুলতে হল, সেটা একান্তই নিরুপায় হয়ে। মনের জোর এনে কাজটা করতে হল ইউজিনকে। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কিছুটা আত্মপ্রকাশ না করে উপায় ছিল না। কিন্তু ফল তাতে ভালোই হ'ল। মনের মধ্যে অহরহ যে অস্বস্তি আর অশান্তি খচ্‌ খচ্‌ করছিল কাঁটার মতন, কিছুদিনের জন্য অন্তত সেটা দূর হল। এতো বড় একটা অপ্রীতিকর ব্যাপারের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে একটা কিছু হেস্তনেস্ত করা দরকার।

ইউজিন মনে-মনে ভাবল—'যা হোক্, ব্যাপারটা এইখানেই শেষ!'

ইউজিনের মুখের দিকে তাকিয়ে লিজা চট্ করে বুঝে নেয় ইউজিন এখন বেশ শান্ত হয়ে এসেছে, মানসিক উত্তেজনা তার দূর হয়েছে। এমন কি, একটু ভালো করে নজর করলেই ধরা যায় যে ইউজিনের মনে আজকাল যেন আরো খুশি-খুশি ভাব। লিজা ভাবে, আমাদের মায়েদের এই নিত্য কথা কাটাকাটি আর হুল-ফোটানোর জ্বালায় ইউজিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। আর সত্যি! কান ঝালাপালা হয়ে যায় ওদের তর্ক আর শ্লেষ শুনতে শুনতে। কার আর ভালো লাগে এই সব নীচতা! যে নিজের কাজে সর্বদাই ব্যস্ত, কারুর সাতে-পাঁচে থাকা ভালোবাসে না, যার অন্তঃকরণ পবিত্র আর উদার, তার পক্ষে এইসব মেয়েলি ঝগড়া, ভব্যতাহীন দোষারোপ আব অকাবণ বক্রোক্তি সহ্য কবা কঠিন।

পরের দিন হ'ল ট্রিনিটি রবিবার।

আকাশ ঝক্‌ঝকে, বাতাসও পরিষ্কার। কোথাও এতোটুকু মেঘের মালিন্য নেই। গ্রামের মেয়েরা, বেশির ভাগ চাষীর ঘরের বৌ-ঝিরা, দলে দলে বেরিয়েছে বনের পথে। ফুল আব পাতা দিয়ে তারা বড় বড় মালা গাঁথবে। এই সময়কাব এই নিয়ম,—গ্রামের প্রথা, লোকাচার।

কিন্তু বনের মধ্যে ঢোকবার আগে তারা এসে জমায়েত হল মনিব-বাড়ির আঙিনায়। এসে জুড়ে দিল গান, শুরু করে দিল নাচ। মেরী পাভলোভনা আর ভার্ভারা আলেক্সিভনা, দুই বেয়ানই বেশ ভব্যসভ্য হয়ে ঝক্‌ঝকে পোশাকে বেরিয়ে এলেন গাড়ি-বারান্দায়। হাতে বেঁটে ছাতা, রোদ আটকাবার জন্যে। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন তাঁরা ভিড়ের কাছে, যেখানে গ্রামের মেয়েরা চক্রাকারে দাঁড়িয়ে গান ধরেছিল।

ইউজিনের সঙ্গে যে-মামাটি কিছুদিন হল বাস করছিলেন, তিনিও লোভ সংবরণ করতে পারলেন না। ঝুনো লোক—স্ফূর্তিবাজ আর মদ্যপায়ী! মেয়েদের সংসর্গে কোনোদিনই তাঁর অরুচি নেই। এই সুযোগে, একটা

রঙচঙে ঢিলে-ঢালা রেশমী চীনা কোট পরে তিনিও এগিয়ে এলেন। ইচ্ছেটা, মেয়েদের সঙ্গে নাচ-গানে ভিড়ে পড়েন।

দূর থেকে দেখাচ্ছিল বেশ। উৎসব উপলক্ষ্যে যেমন হয়ে থাকে, এক পাল তরুণী আর কিশোরীর দল চক্‌চকে রঙীন পোশাক পরে বিচিত্র, বর্ণবহুল এক জনতার সৃষ্টি করে রেখেছে। তারাই হ'ল সকলের লক্ষ্যবস্তু, প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল। আবার এদের চারদিক ঘিরে জটলা করে আছে এক-একটি ছোট দল,—এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে যেন বিচ্ছিন্ন, কক্ষচ্যুত গ্রহ-উপগ্রহের মতন। কোনও দলে বা মেয়েরা পরস্পর হাত ধরাধরি করে ঘুরপাক খাচ্ছে। খস্‌খস্ করে শব্দ হচ্ছে তাদের নতুন ছাপা ডিজাইনের পোশাকের। কোথাও বা ছোট ছেলেরা ছুটোছুটি করছে, পরস্পরের পিছু ধাওয়া করছে, অকারণে হেসেই লুটোপুটি খাচ্ছে। আবার ওদের মধ্যে যারা বড়, সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে এমন ছোকরার দল, তারা গাঢ় নীল কিংবা কালো কোট ও টুপি আর লাল কামিজ পরে বেশ গুরুগম্ভীর চালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মুখ থেকে থু-থু করে ফেলে দিচ্ছে সূর্যমুখী ফুলের বীচি। ভাবটা যেন প্রাপ্তবয়স্ক গোছের। আর এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সমীহভরে বাড়ির চাকর-বাকর আর বাইরের লোক। ওরা দেখতে এসেছে তামাসা। স্ফূর্তি আর মজা দেখবার কৌতূহলে ওদের চোখে-মুখে আগ্রহেব দীপ্তি। দৃষ্টি রয়েছে সকলেরই মধ্যস্থলের নৃত্য-চক্রটির ওপর।

মেরী পাভলোভনা লিজার মা'র সঙ্গে এগিয়ে গেলেন অনেকটা, মাঝখানে যেসব মেয়েরা নাচের জন্য তৈরী হচ্ছিল, তাদের কাছাকাছি। লিজাও গেল তাঁদের সঙ্গে। পরনে হাল্‌কা নীল রঙের পোশাক, মাথার চুলে দুলে দুলে উঠছে ফিকে নীল রঙেরই রেশমী ফিতে। জামার হাতাগুলো বেশ বড় ও ঢিলে গোছের। নড়লে চড়লে লিজার ধব্‌ধবে শাদা, দীর্ঘ হাত দু'খানি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমন কি হাতের কনুই পর্যন্ত। বাহু তার মাংসল নয়, কনুইয়ের কাছটায় উঁচু হাড় নজরে পড়ে।

ইউজিনের ইচ্ছে ছিল না যে, ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু

সবাই যখন একে একে বেরিয়ে এল, তখন একলা ঘরের কোণে লুকিয়ে বসে থাকার কোনো মানে হয় না। বরঞ্চ উল্‌টে খারাপ দেখায়। তাই গুটি-গুটি সেও এসে দাঁড়াল গাড়িবারান্দার নীচে। মুখে একটা সিগ্‌রেট ধরানো, একটু কেমন অন্যমনস্ক চেহারা। যেন কিছুই হয় নি, এই ভাবটা। আর একটু এগিয়ে এসে আশে-পাশে জনতার দিকে তাকাল। ছেলে-বুড়োর দল মনিবের উপস্থিতিতে উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে তাদের গ্রাম্য অভিনন্দন জানাল। ইউজিনও মাথা হেলিয়ে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করল। তারপর কাছেই দাঁড়িয়েছিল যে ছোক্‌রা, তার সঙ্গে আজে-বাজে কথা জুড়ে দিল নিছক সময় কাটানোর জন্যে।

ওদিকে মেয়েরা হঠাৎ সমস্বরে এবং তারস্বরেই একটা নাচের গান গেয়ে উঠল। ধীরে ধীরে নাচ জমে উঠল। একবার করে তারা পরস্পরের আঙুল ছোঁয়াছুঁয়ি করে আর নাচের তালে তালে হাততালি দিয়ে ওঠে।

লিজা প্রথমটায় হাততালির অর্থ বুঝতে পারে নি, ধরতে পারে নি আমন্ত্রণের ইঙ্গিত। একজন ছোকরা লিজার কাছে এগিয়ে এসে জানাল যে, মেয়েরা ইউজিনকে নাচের আসরে নিমন্ত্রণ করছে। ওরা চায় মনিবকে। অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? প্রধান দর্শক হিসেবে অন্তত তিনি কাছে এসে দাঁড়ান।

লিজা মুখ ফিরিয়ে ইউজিনকে ইঙ্গিত করল। ইউজিন সরে আসতেই লিজা বলে উঠল, "সত্যি, তুমি অত দূরে-দূরে রয়েছ কেন? আজ ওদের উৎসব, স্ফূর্তির দিন। বাড়ি বয়ে এসেছে, নাচ-গান করছে। ওরা চায় তুমি দেখ ওদের নাচ।"

তারপর একটি মেয়ের নাচে বিশেষ প্রীত হয়ে লিজা আবার বলে ওঠে, "আর, দেখ দেখ, ঐ মেয়েটি কেমন নাচছে। বড় ভালো দেখাচ্ছে ওকে, না?"

মেয়েটি স্টীপানিডা। পরনে একটা উজ্জ্বল হলুদ রঙের স্কার্ট। গায়ে হাতকাটা ভেলভেটের ব্লাউজ। মাথায় চমৎকার ভঙ্গীতে একখানা রেশমী রুমাল বাঁধা। নৃত্যের তালে তালে উচ্ছল দেহ আর উজ্জ্বল পোশাকের

রেখায়িত ভঙ্গিমা লিজার মুগ্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। স্বামীকে ডেকে বলে, "দেখেছ? ঐ—যে! বেশ বড়-সড় চেহারা খুশিতে উপ্‌ছে উঠছে যেন। মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। দেখে মনে হয় না—যেন দুরন্ত ওর জীবনী-শক্তি, আমোদে আর উত্তেজনায় ভরপুর? আর চমৎকার নাচছে—যাই বলো তুমি…"

ইউজিন কিছুই বলে না। মানে, বলবার মত মানসিক অবস্থা তখন নয়। চোখের সামনে যেন ধোঁয়া…কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ইউজিন। নৃত্যমণ্ডলী যেন অস্পষ্ট কুয়াশার কুণ্ডলী। একটা ঘূর্ণি-গতি……আর কিছু নজরে পড়ে না…।

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ"…ইউজিন বলে ওঠে, কিছু না দেখে, না ভেবেই। অসহায় নির্বোধের মতন একই উক্তি তার মুখে। বার বার, অর্থহীন, "হ্যাঁ—হ্যাঁ—বেশ ভালো", নাক থেকে পাঁসনে জোড়াটা খোলে, মোছে আবার লাগায় অন্যমনস্কভাবে। মনে-মনে বলে ঃ "ওর হাত থেকে দেখছি ছাড়ান পাওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। কি করি!"

স্টীপানিডার মুখের দিকে ভাল করে তাকাতে পারে না ইউজিন। যেন তার সাহস গেছে নিঃশেষ হয়ে, ব্যক্তিত্ব গেছে ফুরিয়ে। দুর্বল আর অসহায় লাগে নিজেকে। মুখ তুলে খোলাখুলি ওর দিকে চাইতে ভয় করে। দুনিয়ার অপরাধীর লজ্জা এসে ভর করে মনের ওপর। চোখ নীচু করে রাখে, পাছে স্টীপানিডার দুর্নিবার আকর্ষণ উদগ্র মোহ বিস্তার করে তাকে কামনার জালে আবার বন্দী করে ফেলে।

তবু ওরি মধ্যে এক-আধবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয় ইউজিন। হঠাৎ স্টীপানিডার একটা অতি-পরিচিত গতিভঙ্গী ইউজিনের অপাঙ্গদৃষ্টিতে ধরা পড়ে। চুরি করে চাওয়াটাই তখন যেন বেশি মিষ্টি লাগে…স্টীপানিডাকেও যেন আরো বেশি সুন্দর মনে হয়…মনে হয় যেন ও অনেক দূরের, বড় অচেনা, কখনো যেন আগে দেখ নি ইউজিন…কি রকম নতুন-নতুন লাগে স্টীপানিডাকে…

স্টীপানিডার চোখেও কেমন ঝলমলে দীপ্তি…লাস্যের লীলা ধরা পড়ে

যায় ইউজিনের চকিত, মুগ্ধ চাহনিতে। স্টীপানিডাও মাঝে মাঝে কটাক্ষ-দৃষ্টিতে দেখে নিচ্ছে ইউজিনকে, বুঝে ফেলেছে তার চাপা মনোভাব। ইউজিন যে একটু দূর থেকে তাকেই দেখছে সুবিধা-সুযোগ মত—একমাত্র তাকেই—লুকিয়ে-চুরিয়ে স্টীপানিডার প্রতিটি গতিভঙ্গী অনুধাবন করছে, সেটা তার আবিষ্ট দৃষ্টি থেকেই মালুম হয়। চকিত এবং তির্যক চাহনির অর্থভেদ করতে দেরি হয় না।

ইউজিন যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার এই নীরবে দাঁড়িয়ে থাকাটা কেমন যেন দৃষ্টিকটু লাগে নিজেরই কাছে। ইউজিন সামলে নিতে চায় নিজেকে। সংবরণ করে তার অবাধ্য, প্রমত্ত দৃষ্টিকে। পাশ থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নার কণ্ঠস্বর শুনতে পায় ইউজিন। শাশুড়ী কি যেন বলছেন তাকে···'দেখো বাবা!' 'কি বলছেন?' বলে ইউজিন জবাব দেবার জন্যে মুখ ফিরিয়েছিল ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নার দিকে। কিন্তু তাঁর সেই কৃত্রিম, কপট ভদ্রতা আর আন্তরিকতাবর্জিত অকারণ অর্থহীন বাক্যস্রোতের কথা স্মরণ করে সারা গা-টা যেন ঘিন ঘিন করে ইউজিনের··· বিরক্তিতে টাটিয়ে ওঠে।

হঠাৎ কথাটা শেষ না করেই মুখ ফিরিয়ে নেয় ইউজিন। তারপর উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করে। বলা নেই, কওয়া নেই, সোজা বাড়ি পেরিয়ে, গাড়ি-বারান্দার নীচে দিয়ে সরাসরি গিয়ে ঢুকল বাড়ির মধ্যে।

এই যে আকস্মিকভাবে ইউজিন চলে এল সকলের মধ্যিখান থেকে, নিজেকে গুটিয়ে নিল সন্তর্পণে—যাতে স্টীপানিডাকে আর দেখতে না হয়—আর বেশিক্ষণ চোখোচোখি না হয় তার সঙ্গে, তার কারণ হল এই যে, ইউজিন তার মনের ওপর এই ভীষণ চাপ, উত্তেজনার গুরুভার আর সহ্য করতে পারছিল না।

কিন্তু মজা এই যে, দোতলায় উঠে ইউজিন বা'রদিকের জানালার কাছে এগিয়ে গেল। কেন যে গেল আর কি করে গেল, তা সে নিজেই জানে না, ভেবেও বলতে পারে না। একটা যেন ভূতগ্রস্ত মানুষ, নিজের হাত-পায়ের

স্বাধীন গতি সহসা লুপ্ত হয়ে গেছে। আশ্চর্য! যতক্ষণ মেয়েরা গাড়ি-বারান্দার কাছটায় জটলা করে রইল, ইউজিনও ওপরে জানালার পাশটিতে ঠায় চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিষ্পলক তার দৃষ্টি—চোখে সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। দেখছে তো দেখছেই—বিশ্বের বিস্ময় আর অরণ্যের আগুন এসে লেগেছে তার চোখে। দেখছে তো দেখেই চলেছে স্টীপানিডাকে। এক লহমার জন্যেও চোখ ফেরাতে পারছে না—তনু-মন সমস্ত নিবদ্ধ হয়ে আছে অখণ্ড, একাগ্রভাবে একটি সঞ্চারিণী মূর্তির ওপর। ব্যগ্র লোলুপ দৃষ্টি, কৃপণের মতন যেন সব শুষে নিতে চায়···

বাড়িতে এখন কেউ নেই। ইউজিনের গতিবিধি দেখবার মত কোন লোক কোথাও নেই। ছুটল ইউজিন—এক রকম ছুটেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে ধীর পদক্ষেপে বারান্দায় এসে পৌঁছল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল, কেউ কোথাও আছে কিনা, তাকে নজর করছে কিনা। তারপর কিছুই যেন হয় নি, একটু বাগানের দিকটায় ঘুরে আসছে—এমনি ভাবখানা দেখিয়ে খুব ধীরে-সুস্থে, যত্ন করে একটা সিগারেট বার করে মুখে ধরল। গুটি-গুটি চলল বাগানের দিকে। কোন্ পথ দিয়ে বেরুল স্টীপানিডা? হঠাৎ অদৃশ্য হলই বা কোন্ পথে? বাগানের দিকে এল কি? উত্তেজিত, অস্থির চিত্তে এগিয়ে চলে ইউজিন।

সরু পথটা ধরে শুকনো পাতাগুলো মর্-মর্ করে মাড়িয়ে যায় ইউজিন। অশান্ত, বিক্ষিপ্ত তার মন, কিন্তু অভ্রান্ত, নিশ্চিত তার পদক্ষেপ। দু'কদম যেতে না যেতেই ঘন গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি যায় থেমে।

গাছের আড়াল থেকে দেখা যায় লাল আর হলদের আবছা আভাস। এগিয়ে আসে আর একটু···ঐ যে···কি যেন গোলাপী গোছের সরে গেল না! নীচের দিকটা ঘোর হলদে। আর ছোট ছোট কাঁটাওলা পাতার ফাঁক দিয়ে মনে হচ্ছে, একটা যেন লাল রঙের রেশমী কাপড় উঁচু করে খোঁপার ওপর দিয়ে জড়ানো—চট্ করে নড়ে গেল! আরও একটু এগিয়ে যায় ইউজিন। এবারে নজরে পড়ে ভেলভেটিন জামার রংটা। হ্যাঁ, হাত-

কাটা ব্লাউজই বটে। শাদা বাহুর একটুখানি নগ্ন অংশ দেখা যাচ্ছে। সঙ্গে আর একজন স্ত্রীলোক। কোথায় যেন চলেছে ওরা।

ইউজিন ভাবে, "কোথায় যাচ্ছে—কে জানে!"

তারপর হঠাৎ যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেলে ইউজিন। সংযমের শেষ বাঁধনটুকুও খসে পড়ে। সারা দেহ জ্বলতে থাকে অত্যুগ্র কামনায়—যেন একখানা হাত তার হৃৎপিণ্ডটাকে এসে আঁকড়ে ধরেছে। দেহ আর মনের জ্বলুনি থামতে আর চায় না। থরথর করে কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। হাঁটুর কাছটায় দুর্বল লাগে। একবার এদিক-ওদিক চোখ দুটো ঘুরিয়ে নেয়। চোখ দুটো যেন আর কারুর, দৃষ্টিটাও যেন অন্য মানুষের···তারপর সহসা স্টীপানিডার দিকে এগিয়ে যায় ইউজিন—তাড়াতাড়ি।

"ইউজিন ইভানিস্। ইউজিন ইভানিস্। আপনার কাছে এসেছি হুজুর"···ইউজিনের কানে ভেসে আসে এক কণ্ঠস্বর।

পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে, বুড়ো স্যামোখিন হাঁপাতে হাঁপাতে তার দিকেই আসছে। বৃদ্ধ মজুর স্যামোখিন ইউজিনেরই আদেশ অনুসারে বাগানের পিছন দিকে একটা কুয়ো খুঁড়ছে।

স্যামোখিনকে দেখে যেন চৈতন্য ফিরে এল ইউজিনের। নিজেকে সংযত করে নিল সে। উদ্যত পদক্ষেপ থামিয়ে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ইউজিন। তারপর স্যামোখিনের কাছে এগিয়ে এসে বুড়োর সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ইউজিনের দৃষ্টি চলে যায় তার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধানে। নজর রাখে, কোন্ দিকে যাচ্ছে ওরা। দেখতে পেল, স্টীপানিডা আর সেই স্ত্রীলোকটি ঢালু জমি বেয়ে নীচের দিকে নেমে গেল কুয়োর কাছটায়।

সত্যি ওখানে কিছু দরকার আছে কিনা কিংবা মিছামিছি কুয়ো পর্যন্ত গেল ছল করে,—তা বলা শক্ত। তবে ঐখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দু'জনে কি যেন বলাবলি করল। তারপর ফিরে এল আস্তে আস্তে···পরস্পর কথা

বলতে বলতে। ওদের ধরন-ধারন দেখলে মনে হয় যেন কি একটা জরুরী কাজে ওরা ব্যস্ত ছিল এতোক্ষণ। কাজ শেষ করে ফিরছে।

কাছাকাছি এসে দু'জনেই জোরে জোরে হাঁটতে লাগল। ছুটেই চলল একরকম। নাচের আসরে ফিরে গিয়ে যোগদান করতে হবে আবার—বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গিনীরা অপেক্ষা করে আছে··· ।

১৩

স্যামোখিনের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বাড়ির দিকে ফিরল ইউজিন।

মনটা বিষণ্ণ, বিশ্রীরকমের ভারি হয়ে আছে। যেন এইমাত্র কাউকে খুন করেছে কিংবা কোন সাংঘাতিক অন্যায় করে ফিরছে। মন খারাপ হওয়ার প্রধান কারণ হল, প্রথমত, স্টীপানিডা তার মনোভাব আঁচ করে নিয়েছে। ধরে ফেলেছে ইউজিন আবার তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তাই ঘুর-ঘুর করে ঘুরছে পিছু-পিছু। স্টীপানিডা সেটা বুঝেছে এবং নিজেও সেটা চায় বলেই খানিকটা এগিয়ে আসছে—যেন মেলে ধরেছে আপনাকে। আর ঐ স্ত্রীলোকটি আনা প্রোখোরোভা। স্টীপানিডার সঙ্গিনী। কাজেই সে-ও সব জেনে ফেলেছে—বুঝতে পারছে প্রতিটি ঘটনার, নড়া-চড়ার অর্থ। কি বিশ্রী লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু তারও চেয়ে বড় কথা হল ইউজিনের মানসিক অবস্থা। সে যে বিজিত, পরাস্ত অদৃষ্টের কাছে—এইখানেই তার আফ্‌শোস, চরম লজ্জা। নিজের ওপর কর্তৃত্ব যে তার ফুরিয়েছে, অদম্য ইচ্ছা-শক্তি গেছে নিঃশেষ হয়ে—এইটেই আত্মার শ্রেষ্ঠ অবমাননা। নিজের খেয়াল-খুশি মত কাজ করার ক্ষমতা তার আর নেই, অপর কোনো একটা অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তির অমোঘ ইঙ্গিতে তার সকল কর্ম আর প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত হতে চলেছে। সেই অঙ্গুলি-সঙ্কেতই এখন তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আত্মশক্তির অধিকারী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কোনো বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি থাকতে পারে? এতোদিন সে যে ডুবে যায় নি জন্মের

মত—এটা নেহাৎই দৈব ঘটনা, সৌভাগ্য। নইলে অধঃপতনের পথ তো সামনেই পড়ে রয়েছে। নিজেই এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে প্রশস্ত তোরণের নীচে—সামনে সুদৃশ্য পথ। প্রলোভনে মসৃণ, উত্তেজিত অনুমানে আর কল্পনায় স্নিগ্ধ, মধুর। ভাগ্য নিতান্তই সুপ্রসন্ন,—তাই অঘটন কিছু ঘটে নি ইতিমধ্যে। কিন্তু ঘটতে আর কতক্ষণ দেরি? আজ না হয় কাল একটা কিছু সাংঘাতিক ঘটে যেতে পারে। অগ্নিগিরির গহ্বরের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে ইউজিন। বিস্ফোরণ আর অগ্নিস্রাবে ভস্মীভূত হতেই হবে একদিন …আজ না হয় কাল!

হ্যাঁ—ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বলা যায় একে? সম্পূর্ণরূপে তলিয়ে যাওয়া—একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়া…ইউজিন ভেবে পায় না, এইরকম বয়ে যাওয়াকে আর কি ভাষায় প্রকাশ করা যায়। অভিধানে আর তো কোনো কথা যোগায় না।

সকলের সজাগ দৃষ্টির সম্মুখে, গ্রামেরই একটা কৃষক-রমণীর সঙ্গে এই রকম একটা যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে নিজের স্ত্রীর কাছে বিশ্বাসঘাতক হওয়া —একে নষ্ট হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কি বলা চলে? আর যে স্ত্রীর প্রতি কোনো বিরুদ্ধ, বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা শুধু অসঙ্গত নয়—একেবারে অসম্ভব। লিজার কাছে কি সাফাই, কি কৈফিয়ৎ দিতে পারে সে? একেই বলে অধঃপতন। সম্পূর্ণ, নিশ্ছিদ্র অবনতি—একটুও ফাঁক নেই। আত্মস্ফালনের তিলমাত্র অবকাশ নেই। নিজের কাছে এতটা হেয়, অশ্রদ্ধেয় হয়ে বাঁচতে হবে তাকে সারাটা জীবন। নাঃ, কোনো ওজরই খাটে না! যে-স্ত্রীর তরফ থেকে এতটুকু ত্রুটির সন্ধান, ভালোবাসার অভাব, কসুরের খোঁজ পাওয়া যায় না—তার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে নির্মম কৃতঘ্নের মত বেঁচে থাকবে কি করে ইউজিন? অসম্ভব। জাহান্নামে যাওয়াটা এমন কিছু কঠিন, কষ্টসাধ্য কৃতিত্ব নয়। কিন্তু আত্মধিক্কারের অসহ্য অশান্তির নিত্য বিষক্রিয়ায় প্রতিটি মুহূর্তের সম্মুখীন হয়ে বাঁচবে কি করে মানুষ? নাঃ— একটা কিছু করতেই হবে, কোনো উপায়ে নিজেকে এই সাংঘাতিক মোহ-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে নিতেই হবে। নইলে চলবে না।

"হায় ভগবান ! এ কি কাজ আমি করতে বসেছি ! কি করে উদ্ধার পাবো ? ঈশ্বর—আমার মনে বল দাও, শক্তি দাও যেন নিজেকে মুক্ত করতে পারি। নইলে এই ভাবে আর কতদিন চলবে ? শেষপর্যন্ত আমি কি তলিয়ে যাবো, ডুবে যাবো একেবারে ?" নিজের মনে মনে বলে ওঠে ইউজিন। আক্ষেপে, অসহায় বোধে মন আর দেহ নুয়ে পড়ে, ভেঙ্গে পড়ে।

আবার নতুন করে মনে জোর আনে ইউজিন। শাসনে মনকে সংযত করতে চেষ্টা করে। ভাবে, "কিছুই কি করা সম্ভব নয় এখন ? অবস্থা কি এমনি দাঁড়িয়েছে যে আমার আয়ত্তের বাইরে ? কিছুই করবার নেই ? কিন্তু নিশ্চেষ্ট, নিশ্চল হয়ে মেনে নেওয়াও তো চলে না !"

ইউজিনের পৌরুষ জাগ্রত হয়ে ওঠে। বোঝায় নিজের মনকে : "না—নাঃ—একটা কিছু করতেই হবে। হ্যাঁ—ঠিক্—ঠিক্, স্টীপানিডার কথা আর ভাববো না। একেবারেই ভাববো না…"

মনের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেয় ইউজিন। যেন জোর করে ঠেলে বার করে দিতে চায় স্টীপানিডার প্রসঙ্গ। হুম্‌কি দেখায় মনকে আর বলে : "ওর কথা একদম ভাবা চলবে না—কিছুতেই নয়।"

সঙ্গে সঙ্গে উদয় হয় সেই এক চিন্তা, একই প্রসঙ্গ। ভেসে ওঠে স্টীপানিডার হাস্যময়ী মূর্তি…চোখের সামনে জেগে ওঠে প্লেন গাছের নীচে ছায়া-শীতল জায়গাটুকু…।

কোথায় কি একটা বইয়ে যেন পড়েছিল ইউজিন এক সন্ন্যাসীর কথা। রোগের উপশমের জন্যে একটি স্ত্রীলোক একবার গিয়েছিল সেই সন্ন্যাসীর কাছে। স্ত্রীলোকটিকে দেখে তাঁর মনে জাগল দুর্বার কামনা। অথচ রোগিণীর গায়ে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে। মহা মুস্কিল ! দক্ষিণ হাতটি প্রসারিত করতে গিয়ে সাধু বিচার করে দেখলেন, এ কি সাংঘাতিক অবস্থা ! যে হাত দেবতার আশীর্বাদ বিতরণ করতে উদ্যত, সেই হাতই প্রলুব্ধ মুষ্টিতে আঁকড়াতে চায় রমণীয় দেহ ! একটু থমকে গিয়ে ভেবে নিলেন। তারপর ডান হাত স্ত্রীলোকটির মাথার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বাঁ

হাতটি ঢুকিয়ে দিলেন কাছে রাখা জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্যে। আঙ্গুলগুলো ঝলসে কুঁকড়ে বীভৎস হয়ে গেল!

ইউজিন ভাবতে লাগল সন্ন্যাসীর কথা। ইচ্ছাশক্তির ওপর অদ্ভুত এই কর্তৃত্ব। যতই ভাবে ইউজিন, মনে বল পায়। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বলে, "হ্যাঁ, পারবো। শোচনীয় অধঃপতনের আগে, একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবার আগে আঙ্গুলগুলো পুড়িয়ে ফেলতে আমি প্রস্তুত।"

চারিদিকে একেবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় ইউজিন। দেখে ঘর নির্জন কি-না। তারপর দেশলাই জ্বেলে একটা মোমবাতি ধরিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে একটা আঙ্গুল এগিয়ে নিয়ে আসে জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কাছে। তারপর জোর করে ঢুকিয়ে দেয় আঙ্গুলটা আগুনের মধ্যে।

"ভাবো এবার···ভাবো ওর কথা! আর ভাববে?"

নিজেকেই বিদ্রূপ করে ইউজিন। আঙ্গুলে জ্বলুনি ধরবামাত্রই তাড়াতাড়ি হাতটা সরিয়ে নেয়। ধোঁয়ার কালো দাগ পড়েছে সবে, এখনও পুড়তে শুরু করে নি।

হো হো করে হেসে ওঠে ইউজিন আপন মনেই। দেশলাইয়ের বাক্সটা সজোরে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর ভাবে—"কি ছেলেমানুষি আর বোকামি করছি! মাথা খারাপ হয়ে গেল দেখ্‌ছি।"

নাঃ—এভাবে হবে না কাজ। আঙ্গুল পুড়িয়ে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন নেই। তবে একটা কিছু করতেই হবে—করা দরকার—নইলে এ রকম অহরহ দুশ্চিন্তার দায় তাকে ক্লান্ত উন্মত্ত করে ফেলবে।

এর চেয়ে কোথাও চলে যাওয়া ভালো। মানে, যেতেই হবে ইউজিনকে। কিংবা স্টীপানিডাকে সরিয়ে দিতে হবে বেমালুম কোনো এক দূর জায়গায়। যাতে পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎ আর না হয়···সম্ভাবনাও না থাকে।

হ্যাঁ, স্টীপানিডাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কি করে? ওর স্বামীকে কিছু টাকা দিয়ে বলতে হবে—এখান থেকে চলে যাও। শহরে গিয়ে বাস করো কিংবা দূরান্তরে, কোন একটা গ্রামে গিয়ে নতুন ঘর বাঁধো। অবিশ্যি জানাজানি হয়ে যাবে ব্যাপারটা—তা ঠিক্।

লোকে ঠিক আঁচ করে নেবে, মানে বার করবে খুঁজে। অতিরঞ্জিত হয়ে পাঁচ কানে ঘোরাঘুরি করে কথাটা অযথা বেড়ে যাবে নিশ্চয়ই। কিন্তু তাতে কী? অপ্রীতিকর কানাঘুষো শুনতে মোটেই ভালো লাগবে না অবিশ্যি। কিন্তু উপায় কী? এই প্রত্যাসন্ন বিপদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া আর আত্মবিলোপের চেয়ে তো সেটা খারাপ নয়! একদিকে নিশ্চিত বিনাশ অপর দিকে উদ্ধারের একটা প্রত্যাশা। কোন্‌টা ভালো?

নাঃ—করতেই হবে। ইউজিন নিজের মনকে বোঝায়। মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করে। এ প্রস্তাবটা পাড়তেই হবে কোনো গতিকে।

যতক্ষণ ভাবছে ইউজিন, মনে মনে এই সব নিয়ে এন্তাম করছে—চোখ দুটো তার রয়েছে স্টীপানিডার ওপরেই। একটি বারও, এই অস্বস্তিকর অথচ পরিষ্কার আত্মচিন্তার মধ্যেও, তার দৃষ্টি নড়ে নি, স্টীপানিডাকে ছেড়ে অন্য কোথাও।

হঠাৎ সমস্ত চিন্তার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়—ভাবনার সূত্রটা ছিঁড়ে যায় টুকরো-টুকুরো হয়ে। ইউজিন নিজেকেই প্রশ্ন করে ওঠেঃ "কোথায় যাচ্ছে ও? কোন্‌ দিকে চল্‌ল আবার?"

বোঝা গেল, স্টীপানিডাও ইতিমধ্যে ইউজিনকে দেখেছে। বুঝেছে তার অনন্যদৃষ্টির অর্থ। ঠাহর করে নিয়েছে ইউজিন কেন চুপ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে দোতলার জানলাটির পাশে।

ওপর পানে একবার তাকিয়েছিল স্টীপানিডা। তারপর পাশের স্ত্রীলোকটির হাত ধরে চলল বাগানের দিকে আবার হনহনিয়ে। দ্রুত গতিভঙ্গীতে ডান হাতখানা তুলছে। চলে যাবার সময় একটা কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে গেলে ইউজিনের দিকে…

ইউজিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর কেন, কি বৃত্তান্ত, কিছু না ভেবে কিছু না স্থির করেই ইউজিন চলল কাছারী ঘরের দিকে। হয়তো এতোক্ষণ যে মতলব আঁটছিল স্টীপানিডাকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া সম্পর্কে, সেই পুরানো কথা চিন্তাসূত্র আবার ফিরে পেল ইউজিন… তাড়াতাড়ি চল্‌ল এগিয়ে।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্ বসে ছিল নিজের কামরায়। গায়ে তার ছুটির পোশাক। বেশ একটু উৎসব আর সাজ-সজ্জার ঘটা। মাথার চুল তেল-চুকচুকে। পরিপাটি করে আঁচড়ানো এবং সিঁথি-কাটা। ঘরের মধ্যে ভ্যাসিলির স্ত্রী, আরেকজন অতিথি। অতিথির গলায় একখানা দামী রুমাল জড়ানো—রেশমী রুমাল, দেখলে মনে হয় প্রাচ্য দেশের তৈরি জিনিস। ওরা সবাই টেবিলে বসে একত্রে চা-পান করছিল।

ইউজিন একটু দূর থেকেই হাঁক দিলে ঃ

"ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্, একবার আসতে হবে এদিকে। আপনার সঙ্গে দরকার ছিল একটু…"

"এই যে আসুন।" বলে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্। "ভেতরে আসুন না হুজুর, আমাদের চা-খাওয়া হয়ে গেছে।"

"না, না, ভেতরে আর যাবো না। আপনি একটু বেরিয়ে আসুন। ছু'-একটা কথা বলেই আমি চলে যাবো।"

"আচ্ছা, আসছি আমি এক্ষুণি, টুপিটা আবার কোথায় গেল! ও তানিয়া, স্যামোভাবটা (স্টোভ) নিভিয়ে দিস্ বাছা।" বলেই এগিয়ে এল ভ্যাসিলি। মুখখানা হাসি-হাসি, যেন খুশি উপছে উঠছে। চোখে কৌতূহলের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ইউজিনের মনে হল, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্ এতক্ষণ মদ্যপান করছিল। এ অবস্থায় তার কাছে কোন কথা না পাড়াই ভালো। কিন্তু পরমুহূর্তেই ইউজিন ভেবে দেখলে, তাতে বিশেষ ক্ষতি হবে না। সুরার প্রভাব বরঞ্চ এক হিসেবে কার্যকরী হতে পারে। ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্-এর মন যদি রসার্দ্র এবং ভাবপ্রবণ থাকে, তাহলে, ইউজিনের সঙ্কট-অবস্থায় তার পূর্ণ মাত্রায় সহানুভূতি থাকবে।

ভরসা করেই বলে ফেলল ইউজিন, "ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্! আপনার কাছে সেই কথাটাই আবার বলতে এসেছি—মানে, ঐ স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে…"

"কেন, কি হল আবার তাকে নিয়ে?" ভ্যাসিলি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা

করে মনিবকে। বলে, "আমি তো মানা করে দিয়েছি যেন ওকে আর কাজ না দেওয়া হয়!"

"নাঃ—সে কথা নয়। আমি জিনিসটা অন্যভাবে চিন্তা করে দেখেছি।" ইউজিন একটু থেমে, গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে থাকে, "আর—সেই সম্বন্ধেই আমি আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করতে চাই। মনে হচ্ছে, আপনার কাছ থেকে সে সু-পরামর্শ পাওয়া যাবে। আচ্ছা, ওদের সমস্ত পরিবারকে এখান থেকে কোনোগতিকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া যায় না? কেমন হয়, যদি বরাবরের মতন অন্য কোথাও··· ?"

"সে কি করে সম্ভব?" ভ্যাসিলি চিন্তিত সুরে প্রশ্ন করে। তার বলার ধরন থেকে ইউজিনের সন্দেহ হল যে, ভ্যাসিলি প্রস্তাবটিকে ঠিক সমর্থন করতে পারছে না। তাই কণ্ঠস্বরে অসম্মতি আর বিদ্রূপের আভাস। ভ্যাসিলি আবার বলে, "কোথায় পাঠাবেন ওদের?"

ইউজিন একটু কুণ্ঠিত সুরে জবাব দেয়, "ভাবছিলুম কি···ওদের কিছু টাকা ধরে দিলে কেমন হয়? কিংবা কিছু জমি—ভালো জমি—যদি কোল্‌টোভস্কি অঞ্চলে ওদের দিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ওরা গিয়ে সেখানে নতুন করে ঘর তুলতে পারে, বসবাস করতে পারে। আর ওকেও এধারে ঘেঁষতে হবে না। চোখের সামনে এই যে অনবরত···"

"কিন্তু, হুজুর, ওদের সরানো যাবে কি? মানে, বলা মাত্রই এতো দিনের পুরানো গেরস্থালী, ঘর-দোর, চেনা-শুনো আর বহু দিনের স্মৃতি-সম্পর্ক সব কিছু ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হুট করে ওরা যেতে চাইবে কি? যাওয়া মানেই, এখানকার মাটির গভীরে যে শিকড় নেমে আছে সেটাকে সজোরে উপড়ে ফেলা! আমার তো মনে হয় না যে, ওরা রাজী হবে। আর সেটা সম্ভবও নয়। ওরা যদি চলে যেতে আপত্তি জানায়, সেটা অন্যায্য নয়। তা ছাড়া, দেখুন কথাটা ভেবে—ওদের খামোকা আপনি সরাতে চাইছেন কেন? ও যদি থাকেই গ্রামে, তাতে আপনার অসুবিধেটা কি? আপনার কি ক্ষতি ও করতে পা ়, আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না··· ।"

"আঃ, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্‌—আপনি একটা সামান্য সহজ কথা ধরতে

পারছেন না কেন? আমার স্ত্রী যদি এই ব্যাপারটা জেনে ফেলেন, ঘুণাক্ষরেও যদি কানা-ঘুষোয় খবরটা তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছয়, তা হলে কি হবে? সেটা ভেবে দেখুন…”

“কিন্তু, হুজুর, তিনি জানবেন কি করে, তাঁর কাছে লাগাতে যাবার মতন মানুষ কই? কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে—আমি তা জানতে চাই…”

“ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্! বলতে না হয় কেউ এগিয়ে না এল। কিন্তু, সমস্তক্ষণ, অহরহ, এই সন্দেহ আর ভয়—ধরা পড়ার দুর্ভাবনা নিয়ে আমি কাঁহাতক টিকে থাকি, বলুন! এই দুশ্চিন্তা কি পুষে রাখার সামগ্রী? এর চেয়ে যে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভালো। তা ছাড়া, হেস্ত-নেস্ত না হলে,—একটা ক্রমাগত অস্বস্তি বাড়তে বাড়তে…”

“হুজুব, আপনি অযথা ভয় পাচ্ছেন আব উত্তেজিত হচ্ছেন। সত্যি। যদি কিছু না মনে করেন, তা হলে বলি—এটা বাড়াবাড়ি। মানুষের জীবনে কার না ভুল-চুক হয়? বলি, এমন লোক কে আছে—এই গ্রামেই হোক আব অন্যত্র কোথাও হোক—যার জীবন নিষ্কলঙ্ক, একদম পরিষ্কার, পবিত্র? তা কি কখনো হয়, না সম্ভব? আর আপনার অতীত জীবন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবার মতন দুঃসাহস কাব হবে—আমি সেটা জানতে চাই। নুড়ো আগুন জ্বেলে দেব না তার মুখে? আপনি মিছিমিছি একটা অহেতুক ভয়ে উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। বলুন তো—দেশের রাজা কিংবা ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে, বুকে হাত দিয়ে, কেউ বলতে পারে যে তার জীবনে কোনো গোপন ঘটনা ঘটে নি, কোনো স্খলন হয় নি…?”

“হতে পারে। আপনি যা বলছেন, ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্, হয়তো তা সত্যি। কিন্তু, তবু—ওকে সরিয়ে দেওয়া দরকার। গোড়া মেরে কাজ করাই ভালো। কোনো অপ্রীতিকর ব্যাপারের ছিট রাখতে আমি চাই না। ওর স্বামীর কাছে কথাটা একবার আপনি পেড়েই দেখুন না…পারবেন না?” ইউজিন অনুনয়ের সুরেই অনুরোধ জানায় ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্‌কে।

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্ চুপ করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ মনিবের মুখের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বলে, “নাঃ হুজুর, ওতে

কোনো ফল হবে না। ওর স্বামীর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে কোনো লাভ নেই। মাঝখান থেকে অকারণে নিজেকেই খাটো হতে হবে। আর একটা কথা, ইউজিন ইভানিচ্…আপনাকে জিজ্ঞাসা করি—আপনার হল কি? ও তো অনেক দিনের কথা—কে আর মনে রেখেছে, বলুন? ও সব ধুয়ে মুছে গেছে। কতো কি তো ঘটে, পুরানো হয়ে যায়—মানুষ ভুলেও যায়। আপনার সম্বন্ধে কে এমন কু-কথা রটাবে, শুনি? সবাই তো দেখছে আপনাকে—আপনার হাল-চাল, আপনার কাজ-কর্ম, ঘরোয়া জীবন…!"

"তা হোক, তবু, আপনি একবার যান। গিয়ে কথাই বলে দেখুন না, ওর স্বামীর সঙ্গে……"

"বেশ! যাবো। যা বলছেন, তাই হবে।"

ভ্যাসিলি নিকোলাইচ্-এর সঙ্গে কথাবার্তা বলে ইউজিনের মন কিছু পরিমাণে শান্ত হল। স্টীপানিডাকে দেখে অবধি তার মনের মধ্যে আজ যে প্রচণ্ড আলোড়ন জেগে উঠেছে, সেটা যেন অনেকখানি কমে এল। ইউজিন অবিশ্যি জানে যে, এ প্রসঙ্গ অর্থহীন। ভ্যাসিলিকে সে অনুরোধ করেছে বটে। কিন্তু বিশেষ কিছু লাভ যে হবে না এটা সে নিজেও আঁচ করেছে। তবু ভ্যাসিলির সঙ্গে এই সব কথা আলোচনা করে একটা বিষয়ে অন্তত সে আশ্বস্ত বোধ করে। উত্তেজনার বশে তার মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছে। নইলে সামান্য একটা ঘটনা থেকে সে এতোখানি বিপদের আশঙ্কা করবে কেন? কিছুই এমন ঘটে নি আজকে—যাতে ভবিষ্যতের আতঙ্কে সেই ঘটনাকে এতটা অযথা গুরুত্ব আর অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয়! স্টীপানিডার সঙ্গে তার কি কোন নীরব বোঝাপড়া হয়েছে? মোটেই নয়। পূর্বনির্দেশ আর সঙ্কেত অনুসারে সে কি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? অসম্ভব। তবে…?

ইউজিন ভাবে, "আমার কি দোষ? আমি তো একটু বাগানের দিকে বেরিয়েছিলুম—বেড়াবার জন্যে। পায়চারি করছিলুম। ঠিক একই সময়ে

স্টীপানিডাও ছুটে যাচ্ছিল ঐ দিকে, হয়তো দরকারী কোনো কাজে। পরস্পর দেখা হবার মত সুযোগ ঘটে গিয়েছিল। এটা তো আর অছিলা নয়! যোগাযোগ, একেই বলে আকস্মিক যোগাযোগ। তা ছাড়া আর কি?"

কাছারি-ঘর থেকে বাড়ি-মুখো রওনা হয় ইউজিন।

পথে আসতে আসতে অনেক কথাই ভাবে। মনকে বোঝায়, চোখ ঠারে। এ ব্যাপারের মধ্যে তার নিজের কোন হাত নেই—এই কথাটাই বার বার মনের মধ্যে গেঁথে নেবার চেষ্টা করে ইউজিন। উত্তেজনার তীব্রতা আস্তে আস্তে কমে আসে—মনটাও আবার একটু করে স্বাভাবিক প্রশান্তি খুঁজে পায় যেন।

১৪

দুপুরবেলার খাওয়া-দাওয়া পর্ব চুকে গেছে।

সেই দিনেরই ঘটনা।

লিজা মাঠের দিকে যাচ্ছিল বাগানটা ঘুরে। বাগানের স্নিগ্ধ ছায়ায় ঘোরাফেরা করে লিজার মনটা ভারি প্রসন্ন লাগছিল। হঠাৎ মনে পড়ল —মাঠে যেতে হবে। কথা ছিল ইউজিন তাকে ক্লোভারের ক্ষেত দেখাবে। দূরে দেখা যাচ্ছে—সারা মাঠটা যেন ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। অন্যমনস্ক-ভাবে হাঁটছিল লিজা! যেতে যেতে, একটা ভুল করে বসল—হঠাৎ সামনের একটা ছোট্ট নালা পার হতে গিয়ে একটা পা পড়ল বে-কায়দায়। সামান্য একটা খানা পার হওয়া এমন কিছু চিন্তার ব্যাপার নয়। কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলেই যতটুকু লাফ দেওয়া দরকার তা হল না। ভুল পদক্ষেপের জন্যে ডান পা'টা পড়ে গেল ঢালুর মুখে। আর ধুপ করে পড়ল লিজা, খানার মধ্যেই। কাত্ হয়ে পড়েছিল—এমন কিছু লাগবার কথাও নয় তার। কিন্তু উঃ করে চেঁচিয়ে উঠতেই ইউজিন শুনতে পেল। এগিয়ে এসে তাড়াতাড়ি দেখল, লিজার মুখে শুধু ভয়েরই চিহ্ন নয়, ব্যথাও। মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে এক মুহূর্তে। তুলতে গেল ইউজিন

হাত বাড়িয়ে। কিন্তু লিজা ইশারা করে বারণ করল। সে দেখতে পেয়েছিল, মা আসছেন। এখুনি আবার সমালোচনা শুরু হবে, দিতে হবে কৈফিয়ৎ···ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে উঠল লিজা।

কিন্তু পারল না। উঠতে গিয়ে সুবিধা করতে পারল না। একটু দুর্বল লজ্জার হাসি হেসে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, তুমি একটু দাঁড়াও তো।"

আর একবার চেষ্টা করল নিজে নিজে, মাটিতে দু' হাত রেখে উঠতে গেল। পারল না। অপরাধীর মত ভীতচকিত দৃষ্টিতে ইউজিনের দিকে তাকিয়ে বলল, "হঠাৎ পা-টা কেমন যেন মচকে গেল···তাই···"

পেছন থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর জেগে উঠল, "এ যে হবে, আমি জানতুম। বরাবরই বলে আসছি। এই অবস্থায় কেউ এত জোরে চলাফেরা করে—খানা-খোঁদল লাফিয়ে বেড়ায় ? এখন বোঝ !"

বিরক্তিতে গর-গর করে ওঠেন ভার্ভারা আলেক্সিভনা।

"না, মা ! কিছুই হয় নি। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে—এই তো উঠছি আমি। কি আবার হবে···?"

ইউজিনের প্রসারিত হাতখানা ধরে টপ করে উঠে পড়ে লিজা, মনের জোরে। কিছুই যেন হয় নি—এই ভাব। কিন্তু দাঁড়িয়ে ওঠা মাত্রই তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে ওঠে। ভয়ে মুখ পাংশু হয়ে যায়। তারপর···ভার্ভারা আলেক্সিভনার দিকে তাকায়। মুখখানা এগিয়ে নিয়ে মার কানে কানে ফিস ফিস করে বলে···"শরীরটা কি রকম যেন করছে, মা !"

"এঁ্যা,—করেছ কি ?" ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না ভয়ার্ত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠেন, "এখন উপায় ! কতোবার বলেছি না পই পই করে—অমন ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক বেড়িয়ো না ! এখন কাণ্ড বাধিয়ে বসলে তো ! দাঁড়াও দাঁড়াও—আগে চাকর-বাকরদের ডাকি। হেঁটে যাওয়া তোমার হতেই পারে না—নড়ো না একদম !"

ইউজিন লিজার পিঠে ও কোমরে হাত বুলোয় গভীর স্নেহভরে। মুখ নীচু করে বলে সান্ত্বনার সুরে, "ভয় পেয়ো না। ভয় কিসের ? আমি

তো রয়েছি—তোমায় পাঁজাকোলা করে আমি একাই নিয়ে যেতে পারব।”

তারপর একটু কুঁজো হয়ে বাঁ হাত রাখে লিজার কোমরের কাছে। ডান হাতটা হাঁটুর নীচে জড়িয়ে ঝাঁ করে তুলে নিল লিজাকে নিজের বুকের কাছে। এমন কিছু ভারি নয় লিজা। ওকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে বাড়ির দিকে এগোয় ইউজিন। ক্ষণে ক্ষণে তাকায় লিজাব মুখে। দেখে, ওব মুখে ও চোখে ভয়ার্ত বেদনার ক্লিষ্ট ছাপ। লিজার মুখের এই চেহারা কোনোদিন ভুলতে পারে নি ইউজিন—যন্ত্রণার এই অব্যক্ত উচ্ছ্বাস, বেদনার শুদ্ধ ও সংহত এই অমানুষিক পাংশু আভাস।

স্বামী তাকে অনায়াসে কোলে করে নিয়ে চলেছে—এই চিন্তায়, গর্বে ও আনন্দে লিজার ছোট্ট বুকখানি ভরপুর, যদিও থেকে থেকে বেদনায় তার মুখখানা সিঁটিয়ে উঠছে। মুখটা এগিয়ে নিয়ে আসে ইউজিনের মুখের কাছে, অধব দিয়ে স্পর্শ করে স্বামীর মসৃণ ও শীতল কপোল। আস্তে আস্তে বলে, “কত কষ্ট হচ্ছে তোমার! বুড়ো ধাড়ীকে কোলে নিয়ে—ছিঃ ছিঃ। আর ভারীও তো কম নই। ঐ দেখো, মা তো ছুটতে শুরু কবেছে, বারণ করো না…”

লিজার ইচ্ছেটা মা যেন ফিরে দেখেন—কতো অনায়াসে সাবলীল ভঙ্গিতে ইউজিন তাকে পরম আদরে বুকের কাছটিতে নিয়ে, একটুও না হাঁপিয়ে, চলেছে সহজ পদক্ষেপে।

ইউজিন চেঁচিয়ে উঠল পিছন থেকে। ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নাকে ডেকে বলল, “ছোটবার দরকার নেই। চাকবদের ডাকতে হবে না—আমি তো নিয়ে যাচ্ছি লিজাকে…”

ভার্ভারা তখন রীতিমত উত্তেজিত। একটু থেমে পড়ে আরো হাঁক-ডাক শুরু করে দেন, “ও মা! সে কি কথা! তুমি বয়ে নিয়ে যাবে কি করে! তারপর ফেলে দাও লিজাকে…মজাটা টের পাবেখ’ন…তোমার কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই, বাছা! মেয়েটা যদি হাত ফসকে একবার

মাটিতে ঠুকে যায়, তা হলে হুমড়ি খেয়ে যে মারা পড়বে। তখন আর বাঁচতে হবে না···তোমার কি ইচ্ছে, ও মরুক !”

“কিন্তু আমি তো বেশ ভালো ভাবেই নিয়ে যাচ্ছি লিজাকে···” ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ জানায় ইউজিন। শাশুড়ির উত্তেজিত, বিচার-বুদ্ধিহীন, অনর্গল বাক্যস্রোতে শেষ পর্যন্ত সে অভিভূত হয়ে পড়ে। তবু বলে ঃ

“আপনি শুধু শুধু ব্যস্ত হচ্ছেন। আমি ঠিক নিয়ে যেতে পারব, বাড়ি পর্যন্ত।”

“নাঃ নাঃ—তা হয় না, হতেই পারে না···” ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না বিরক্তিতে আর উত্তেজনায় হাত-পা নেড়ে যেন নাচতে থাকেন। বলেন, “মেয়েটাকে মেরে ফেলো আর কি ! মেরে ফেলেই তুমি নিশ্চিন্দি হতে চাও—নাঃ নাঃ, তা আমি করতে দেব না···লিজাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে না তোমাকে···” কথা শেষ না করেই ছুটে চলে যান সরু পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে।

স্মিত-লজ্জিত হাসিতে সমগ্র মুখখানা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে লিজার। ইউজিনের মুখের দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুত ভাবে বলে ঃ

“একেবারে পাগল ! তুমি কান দিয়ো না ওঁর কথায়।”

তারপর একটু গম্ভীর হয়ে যায়। একটা দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে মুখে। অন্যমনস্ক ভাবে বলে ইউজিনকে ঃ

“শুধু শুধু ভাবনা কোরো না। ও কিছু নয়—সেরে যাবে'খন।”

ইউজিনও গম্ভীর গলায় জবাব দেয়, “হুঁ। গেল বারের মতন গণ্ডগোল না হয়ে যায়···”

“না, না—আমি সে কথা বলছি না।” লিজা বলে ওঠে তাড়াতাড়ি, “ও ঠিক আছে। আমি বলছিলুম, মা'র কথা। মানে, যা কাণ্ড করছেন এখন—এ ভাবটা বেশিক্ষণ থাকবে না। ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন শীগ্‌গিরই··· আর দেখো—তোমার বোধ হয় কষ্ট হচ্ছে। একটু থেমে জিরিয়ে নিলে হ'ত না ?”

"না—এর জন্য আবার বিশ্রাম কিসের? আমার তো একটুও কষ্ট বোধ হচ্ছে না।"

ঠিক কষ্ট না লাগলেও একটু ভারি বোধ হচ্ছিল বৈ কি। কিন্তু লিজার সামনে ইউজিন সেটা স্বীকার করতে চাইল না। বাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে চলল লিজাকে। নিজস্ব প্রিয় ভার আর কারুর হাতে তুলে দিতে মন সরে না ইউজিনের। পরম যত্নে, সন্তর্পণেই লিজাকে বহন করে চলে। মাঝ পথে ঝি আর রাঁধুনি বামুন এসে পড়ে। ভার্ভারা আলেক্সিভ্না ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে আগে ভাগেই ওদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। মনিবের সামনে এসে দাঁড়ায় তারা। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসে, গিন্নীকে নিয়ে যেতে সাহায্য করবার জন্যে। কিন্তু ইউজিন ঘাড় নেড়ে বারণ করে, ইশারা করে সরে যেতে। একাই বয়ে নিয়ে যায় লিজাকে শোবার ঘর পর্যন্ত। তারপর সোজা ঘরে ঢুকে সরাসরি বিছানায় শুইয়ে দেয়। শুইয়ে দিয়ে কোমরটা সোজা করে চিতিয়ে দাঁড়ায়।

"নাও, এবার হয়েছে তো বাহাদুরি! এখন এসো গে। বাইবে বসে একটু বিশ্রাম করে নাও।"

তারপর হঠাৎ ইউজিনের হাতখানা টেনে নিয়ে বুকের কাছটায় রাখে। তুলে ধরে হাতখানার ওপরে একটি আল্‌গা চুম্বন রেখে বলে, "তুমি এবারে একটু বিশ্রাম করো লক্ষ্মীটি। কিচ্ছু ভেবো না—কিছুই হবে না আমার। অ্যানুসকা তো রয়েছে আমার কাছে—ওতে আমাতে ঠিক সামলে নেব'খন।"

মেরী পাভলোভনা থাকতেন বাড়ির একটি কোণে, স্বতন্ত্র অংশে। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তিনিও দৌড়ে এলেন।

সবাই মিলে তখন তাড়াতাড়ি লিজার জামা-কাপড় ছাড়িয়ে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিল চটপট।

ইউজিন বাইরে গিয়ে বসেছিল এতক্ষণ বৈঠকখানায়। হাতে একখানা বই; মনটা কিন্তু অন্য দিকে। ভার্ভারা আলেক্সিভ্না পাশ দিয়ে চলে

যাচ্ছিলেন। মুখখানা তাঁর এতই থমথমে প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের ব্যঞ্জনায় গম্ভীর যে ইউজিন সাহস করে তাঁর সঙ্গে কথাই বলতে ভরসা পেল না। তবু মরীয়া হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "দেখুন, ও কেমন আছে এখন? কি হয়েছে?"

"কেমন আছে, কি হয়েছে? আহা!" ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না প্রায় ভেংচে ওঠেন জামাইকে, "এখন জিজ্ঞেস করে আর কি হবে? যখন স্ত্রীকে খানা ডিঙ্গিয়েছিলে, তখন মনে ছিল না? চেয়েছিলে বোধ হয় একটা কিছু কাণ্ড বাধুক!"

সর্বদেহ জ্বলে ওঠে ইউজিনের ঘৃণায় আর বিরক্তিতে। অনেক কষ্টে আত্মদমন করে বলে, "কি আশ্চর্য! সোজা কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনার সঙ্গে সাধারণ কথাবার্তা বলা তো দেখছি অসম্ভব হয়ে উঠল। যদি অপরকে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথা বলে, নির্যাতন করে, জীবন তার বিষাক্ত করে দিতে চান শ্লেষ আর গঞ্জনায়—" ইউজিন বলতে যাচ্ছিল,—"তা হলে অন্য কোথাও যান, এ বাড়িতে ও সব করবেন না!" কিন্তু অমানুষিক ধৈর্য ও সংযম ইউজিনের, বহু আয়াসে জিহ্বাকে সংযত করে নিয়ে বলে, "তা হলে আপনার মনে কিছুতেই ব্যথা লাগে না, বুঝতে হবে। আঘাত পাবার মতন হৃদয় আপনার নেই।"

"যা হবার তাই হয়েছে! এখন আর চারা নেই।" বোমার মতন ফেটে পড়েন ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না।

বিচারকের গম্ভীর রায় দিয়ে একটুখানি যেন প্রসন্ন দেখায় ভার্ভারাকে। তারপর বিজয়িনীর মতন দৃপ্ত পদক্ষেপে, মাথার টুপিটা নেড়ে বসিয়ে দিয়ে ঘর থেকে খট্ খট্ করে বেরিয়ে যান।

ইউজিন দেখে—স্তম্ভিত হয়ে রোষ-কষায়িত নয়নে দেখতে থাকে পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতার অপসৃয়মাণ মূর্তিখানি।

লিজা যখন হোঁচট খেয়ে পড়ল, বাইরে থেকে বোঝা যায় নি কিছুই। মনে হয়েছিল এমনি পা ফসকে পড়েছে—লাগে নি তেমন। কিন্তু দেখা গেল, সত্যিই লিজার পড়াটা হয়েছিল বিশ্রী রকমের অ্যাকসিডেণ্ট। এত দিন ধরে সাবধানে, সতর্ক ভাবে থেকে—স্বামী, শাশুড়ি আর মায়ের কড়া

নজরে বন্দী থেকেও ঘটে গেল এমন ধারা একটা আকস্মিক ঘটনা। বেকায়দায় পা ফস্‌কে গিয়ে ওপর পা পর্যন্ত মুচড়ে গিয়েছিল। এখন কোমর থেকে বেদনা উঠছে। দ্বিতীয়বার সন্তাননাশের সমূহ সম্ভাবনা।

সবাই জানে, এ সময়ে করবার কিছুই নেই। চুপ করে শুয়ে থাকা কেবল—নড়া-চড়া বন্ধ। যদি সম্পূর্ণ বিশ্রামে আর নড়া-চড়া-রহিত অবস্থায় শুইয়ে রেখে কোনো গতিকে সামলে যায়!

তবু একজন ডাক্তার ডেকে দেখিয়ে নেওয়া ভালো। সবাই মিলে তাই স্থিব করলেন।

ইউজিন পড়বার ঘরে গিয়ে চিঠি লিখতে বসল ডাক্তারকে ঃ

"প্রিয় ডাঃ নিকোলাই সেমিওনিস্‌,

আমাদের পরিবারের সঙ্গে আপনার সৌজন্য-সম্পর্ক বহুদিনের। বরাবরই আপনার কাছ থেকে আমরা সদয় ব্যবহার পেয়ে এসেছি। আশা করি এবারেও বঞ্চিত হব না। সম্প্রতি আমার স্ত্রী শয্যাশায়ী। অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় আছি। অবিলম্বেই আপনার সাহায্যের প্রয়োজন। আশা করি, পত্রপাঠ এখানে চলে আসতে দ্বিধা কববেন না।

গুণমুগ্ধ, ইউজিন আর্তেনিভ।"

চিঠিটা শেষ করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ইউজিন আস্তাবলের দিকে। ঘোড়া আর গাড়ির তদারক করতে হবে।

ঘোড়ার সাজ পরিয়ে, গাড়িতে জুতে তবে ডাক্তারকে আনতে যেতে হবে। তারপর আবার তাঁকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। অনেক কাজ বাকি। সহিস ও কোচম্যানকে তাগাদা না দিলে সকাল সকাল বেরুনো অসম্ভব।

তা ছাড়া হৈ-হুজ্জুত, তাড়াতাড়ি করে এসব কাজ হয় না মফঃস্বলে। এ তো আর শহর নয় যে, সময়ে-অসময়ে দু দণ্ডের মধ্যে সব তৈরী হয়ে যাবে। তার ওপর জমিদারিটাও ছোট। ইউজিনের লোকবলও বেশি নেই। এ অবস্থায় ধীরেসুস্থে বিবেচনা করে কাজ করতে হয়। তাই কোনো কিছুর বিলি-বন্দোবস্ত করতে গেলে একটু দেরি হওয়া স্বাভাবিক।

তবু ওরি মধ্যে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি মন স্থির করে ফেলে ইউজিন চলে গেল আস্তাবলের দিকে। কোচম্যানকে দিয়ে গাড়ি বার করিয়ে ঘোড়া জুতে রওনা করিয়ে দিল। যাবার সময়ে হাতে চিঠিখানা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিল রাস্তার নিশানা—যাতে ভুল না হয়, দেরি না হয়ে যায়।

সমস্ত ব্যবস্থা সেরে, ইউজিন যখন বাড়ি ফিরল তখন রাত হয়ে এসেছে। ন'টা বেজে গিয়েছে।

ঘরে ঢুকে ইউজিন দেখল লিজা চুপচাপ শুয়ে আছে বিছানায়। কোনো ছটফটানি নেই। জিজ্ঞাসা করল কাছে এসে, "এখন কেমন আছো? একটু ভালো বোধ করছ···?"

একটু ক্ষীণ হাসি হেসে লিজা জবাব দিল, "বেশ ভালোই আছি। এখন আর কোনো ব্যথা নেই···"

অদূরেই বসে আছেন ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না। কৌচে বসে কি একটা বুন্‌ছেন লাল রঙের। বোধ হয়, বাচ্ছাদের গায়ে দেবার জন্যে ছোট্ট এক-খানা পশমী চাদর। পাশেই টেবিলের ওপর বড় ল্যাম্পটা। পাছে লিজার চোখে আলো লাগে, তাই কয়েকখানা বড় কাগজ, গানের স্বরলিপির শীট্‌ই হবে বোধ হয়—ল্যাম্পের গায়ে হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। লিজার বিছানার দিক্‌টায় আবছা আলো। ঘরের কোণ অন্ধকার। আর ল্যাম্পের সমস্ত আলোটা গিয়ে পড়েছে লিজার মায়ের মুখে।

সে মুখ একবার দেখলে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। ইউজিন ঘরে ঢুকে লিজার সঙ্গে যখন কথা কইছিল, তখন নজর করে নি। এখন মুখ ফিরিয়ে দেখল, ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে পশম বুনছেন। মেয়ে-জামাইকে যেন দেখতেই পাচ্ছেন না। মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর। একটা ভুরু উঁচু হয়ে আছে, ধনুকের ছিলার মতন। মর্মভেদী প্রশ্নের বাণ—নিক্ষেপের অপেক্ষা মাত্র। মুখের ভাবখানা এই: যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু এরপরে সন্ধি অসম্ভব। অন্য লোকে যাই বলুক, আর যাই করুক, শান্তি-স্থাপনের প্রসঙ্গ বর্তমানে অবান্তর, অকল্পনীয়। তবে নিজের কর্তব্য

তিনি যথারীতি করে যাবেন, যতক্ষণ আছেন এ বাড়িতে। তার এক চুল নড়-চড় হবে না—এতটুকু ত্রুটি হতে দেবেন না। অসুস্থ মেয়ে আগলে তিনি বসে থাকবেন···দরকার হলে সারা রাত।

ইউজিন অবিশ্যি শাশুড়ী ঠাকরুণের এ-ভাবটা ভালো করেই লক্ষ করেছিল। কিন্তু দেখেও সে দেখল না। কারণ দেখলেই বিপদ। তাই এমন ভাবখানা সে দেখাল যেন কিছুই হয় নি। বেশ সহজ সুস্থভাবে, প্রশান্ত মনে এবং প্রফুল্ল চিত্তে সে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে লাগল। হঠাৎ নিজে থেকেই কথা তুলল, বলল, "কাবুশ্‌কা নামে মাদী ঘোড়াটা চমৎকার ছোটে। ছোট্ট গাড়িখানাতে যখন বাঁয়া জুড়ি হিসেবে তাকে জুতে দেওয়া হ'ল, রাশ টেনে তাকে সামলানোই মুস্কিল হচ্ছিল। 'গ্যালপ' করে ছুটে বেরুবার জন্যে সে তখন অস্থির।" গাড়ি জুতবার আগে ইউজিনকে ঘোড়া নির্বাচন করতে হয়েছিল। কেননা, যে দুটো সবচেয়ে তেজী এবং দৌড়ানোয় ওস্তাদ, তাদেরই পছন্দ করা দরকার। চটপট যাবে আর আসবে ডাক্তারকে নিয়ে।

"হ্যাঁ—তা তো বটেই। চমৎকার ব্যবস্থা তোমার!" ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না এতক্ষণে মুখ খোলেন ফোড়ন কাটবার জন্যে। "যে সময়ে মানুষের প্রাণ নিয়ে টানানানি—অবিলম্বে সাহায্যের দরকার—সেই সময়ে তোমার ঘোড়-দৌড়ের শখ! ঘোড়াদের পরখ্ করা আর দৌড় শেখানোর কি এই সময়? যত্তো অ-দ্ভু-ত খেয়াল তোমার। আশা করি, ডাক্তার-বাবুকেও যথারীতি খানায় ফেলা হবে···।" বলেই ভার্ভারা পাতলা ঠোঁট দু'টি একত্র বন্ধ করেন। হাতের পশম-বোনার কাজটা মুখ টিপে পরীক্ষা করেন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে। সেলাইটা এগিয়ে নিয়ে এসে আলোর কাছে রাখেন, দেখেন ঠিক হচ্ছে কিনা। মুখে একটিও কথা নেই। মোক্ষম উত্তর দিয়ে চশমার ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ, সূচ্যগ্র দৃষ্টি হানেন সেলাইয়ের কাঁটা দুটোর ওপর। নীরবে কাজ চলতে থাকে দ্রুত নিপুণ হাতে।

ইউজিন শাশুড়ীর অপ্রত্যাশিত নির্মম মন্তব্যে একটু হকচকিয়ে যায়। স্বচ্ছন্দ কথার ধারা ব্যাঘাত পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। তবু সামলে নিয়ে বলে,

"বাঃ, আপনি তো সবই জানেন—দেখেছেন। গাড়ি তো পাঠাতেই হত। ঘোড়া না জুতলে গাড়ি কি হাওয়ায় উড়ে যাবে? ডাক্তারকে যখন খবর দিয়ে আনিয়ে নেওয়াই স্থির হ'ল, তখন যা বন্দোবস্ত করা দরকার, তাই করেছি। অন্তত যা করা উচিত, ভালো বলে বুঝেছি,—সেই মতই ব্যবস্থা করেছি···এতে অপরাধটা কি করলুম ?"

"হ্যাঁ···খুব মনে আছে আমার। মনে আবার থাকবে না? তোমার বাড়িতে একবার আসবার সময়ে গেটের খিলানের নীচে তোমার পক্ষীরাজরা গাড়িশুদ্ধ কি ঝাঁকুনিটাই দিয়েছিল আমায়! সামনের পা উঁচু করে, লেজ নেড়ে সে কি সাংঘাতিক লম্ফ-ঝম্ফ! কি চমৎকার গ্যালপ্! খুব মনে আছে তোমার ঘোড়াদের কেরদানি। নাকালের একশেষ—পুড়ে মরি আর কি!"

কথাটা অবিশ্যি বাড়াবাড়ি···মোটেই সত্যি নয়। ব্যাপারটা আগাগোড়াই কল্পনা। ভার্ভারা আলেক্সিভ্না ভীতু মানুষ। আসলে তাঁর ভয়টাই অহেতুক।

তাই ইউজিন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে বসে অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে। বলে, "কিন্তু ব্যাপারটা তা তো নয়..."

কথাটা না বললেই হত ভালো। কেননা, প্রতিবাদের উত্তরে বেরিয়ে আসে তীব্রতর শ্লেষ—অভ্রান্ত, তীক্ষ্ণ বক্রোক্তি।

"যা বলে থাকি, সেটা মিছে নয়।" ভার্ভারা আলেক্সিভ্না সঙ্গে সঙ্গে ঠোক্কর দিয়ে বলে ওঠেন, "এই তো সেদিন প্রিন্সকে তাই বলছিলুম···যারা মুখে এক, পেটে এক···হয়কে নয় করে—তাদের সঙ্গে বাস করা কঠিন। সব সইতে পারি। কিন্তু কপটতা আর মিথ্যে কথা আমি একদম বরদাস্ত করতে পারি না—ঐ আমার মস্ত বদ্‌রোগ···"

ইউজিন চুপ করে শোনে। তারপর বলে ওঠে, "হুঁ, তবে এ বিষয়ে যদি কাউকে সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়ে থাকে, তা হলে সে আমি···কিন্তু আপনি....?"

ভার্ভারা তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, "সে তো দেখাই যাচ্ছে···"

"কি বলছেন ?"

"কিছু না। সেলাইয়ের ঘর গুণছি···"

ইউজিন এতোক্ষণ দূর থেকেই কথা বলছিল। দাঁড়িয়েছিল লিজার বিছানার পাশে। ভার্ভারার কথাবার্তা শুনে সে গুম হয়ে রইল।

লিজা শুয়েশুয়ে স্বামীকে দেখছিল। তাকিয়ে ছিল তার মুখের পানে। মুখের ওপর যে ছায়া পড়ল, তা দেখে মনে কষ্ট পেল লিজা। কম্বলের ভেতর থেকে আস্তে আস্তে হাতটি বাড়িয়ে স্বামীর হাতখানি অলক্ষ্যে টেনে নিল নিজের হাতের মধ্যে। তারপর ইউজিনের হাতখানার ওপর একটু চাপ দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। অর্থটা এই : দয়া করে মা'র কথায় কান দিয়ো না। আমার মুখ চেয়ে একটু সহ্য করো, ধৈর্য ধরো। মা যাই বকুন, আমাদের দু'জনের ভালোবাসায় ভাঙন ধরাতে পারবেন না তো !

লিজার পরিষ্কার, অর্থপূর্ণ দৃষ্টির উত্তরে ইউজিন ঝুঁকে পড়ে বিছানায়। ফিস ফিস করে জবাব দেয়, "ও কিছু নয়—তুমি ভেবো না আমি আর কথা না বললেই হল। কে ওঁর কথায় কান দিচ্ছে··· !"

লিজার প্রসারিত দীর্ঘ হাতখানা নিজের ওষ্ঠের ওপর রাখে ইউজিন। হাতখানা নামিয়ে দিয়ে গভীর স্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় মাথায়। ধীরে ধীরে ঝুঁকে পড়ে লিজার ঢলোঢলো চোখের কাছে—যে চোখের দুই তটে ভালোবাসা উদ্বেল হয়ে ছাপিয়ে পড়েছে। প্রগাঢ় অনুরাগের মতন কি একটা অদ্ভুত, অবর্ণনীয় অনুভূতি ছেয়ে যায় ইউজিনের সর্ব অঙ্গে। পুলকরঞ্জিত অধর দিয়ে স্পর্শ করে লিজার সেই অপরূপ দৃষ্টি। আবেশে মুদিত হয়ে আসে লিজার ঘন চোখ দু'টি।

ভয়েভয়ে কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইউজিন : "কেমন লাগছে এখন ? একটু ভালো বোধ করছ কি ? আচ্ছা দেখো, তোমার কি মনে হয়, গেল বারের মতন আবার হবে নাকি ?"

"বলতে ভয় করছে আমার। জানি না কি কপালে আছে···" নিজেরই অজ্ঞাতসারে লিজার দৃষ্টি চলে যায় কম্বলে ঢাকা পেটের দিকে। নিঃশ্বাস

ফেলে বলে, "আমার মনে হচ্ছে—বিশেষ কিছু চোট লাগে নি। বেঁচে আছে—আর, বোধ হয় বেঁচে থাকবে ··"

তারপর একটু থেমে আবার বলে, "আচ্ছা—সত্যিই যদি কিছু গোলমাল হয়ে যায়—তা হলে কি হবে? বার বার এমনি করে ব্যর্থতার দুর্ভোগ আমি কেমন করে সহ্য করতে পারবো? ভাবতেও গা শিউরে ওঠে আমার···" হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চকিতে চোখ মুছে নেয় লিজা।

লিজা বার বার জেদ করতে লাগল ইউজিন অন্য ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুক। কিন্তু ইউজিন শুনল না। জোর করেই সে লিজার ঘরে রাত্তিরে শু'ল। সারারাত ঘুমোতেই পারল না ভালো করে। মনে ভয় সর্বক্ষণ—যদি কিছু দরকার হয় লিজার, ডেকে জবাব না পেয়ে শেষকালে নিজেই যদি উঠে পড়ে বিছানা ছেড়ে। অস্বস্তিতে আর উত্তেজনায় ইউজিনের মাথাটা ধরে ছিল। দু'চোখের পাতা বুজল না। শুয়ে শুয়ে ঠায় জেগে রইল সমস্তটি রাত।

কিন্তু ভালোয় ভালোয় রাত কেটে গেল। লিজার ঘুম ভালই হয়েছিল। একটি বারও ওঠে নি সে রাত্তিরে। আর যদি ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্যে লোক না পাঠানো হত, তা হলে হয়তো লিজা নিজেই উঠে পড়ত সকাল বেলায়। এক রকম জোর করেই তাকে চুপচাপ বিছানায় শুইয়ে রাখা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন ভোজন-পর্বের আগেই ডাক্তার এসে পৌঁছুলেন।

বলা বাহুল্য, আসা মাত্রই তাঁকে রোগিণীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'ল। রোগিণীকে পরীক্ষা করে তিনি যা বলে গেলেন, মোটামুটি তার সারমর্ম হ'ল এই: যদি বেদনা প্রভৃতি উপসর্গগুলো আবার দেখা দেয় এবং ঘন ঘন হতে থাকে, তা হলে অবিশ্যি ভয়ের ক' । কিন্তু এখনও পর্যন্ত যখন উপসর্গগুলো আবার উৎপাত শুরু করে নি, তখন আশু বিপদের সম্ভাবনা কম—একথা বলতে পারা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও ঠিক যে, এই ধরনের ব্যাপারে

কিছু জোর করে বলা চলে না—বলা যায় না। কেননা, বর্তমানে একটু উপশম হলেও, নতুন উপসর্গ এসে জুটতে কতোক্ষণ ?

তবে—যেহেতু একদিকে যেমন ভয়ের কারণ নেই বলে মনে হচ্ছে,—যতক্ষণ পর্যন্ত বিপরীত লক্ষণগুলো দেখা না দেয়—তেমনি আবাব অপর দিকে উপসর্গের উপশম হওয়া মাত্রই বলা চলে না যে সঙ্কট-কাল কেটে গেছে,—যেহেতু বিশ্রাম এবং সম্পূর্ণ বিশ্রাম সেই বিপদের সম্ভাবনাকে চাপা দিয়ে রেখেছে মাত্র। পুরো ভরসা করে এ অবস্থায় কিছু বলা অসম্ভব। তবে বর্তমানে রোগিণীব অবস্থা দেখে কিছুটা মতামত দেওয়া চলে···কেননা, একদিকে যেমন আসন্ন বিপদের আশঙ্কা কমেছে, অপর দিকে তেমনি··· ইত্যাদি ইত্যাদি।

নানা-কারণ-দর্শিতায় পাবদর্শিতা দেখিয়ে ডাক্তারবাবু যেসব বহুমুখী মন্তব্য করলেন, তার বিস্তারিত গোলকধাঁধায় আলোক-রশ্মি বড় একটা প্রবেশ করতে পায় না। তবু ওরই মধ্যে বিশ্লেষণ-বাহুল্য সত্ত্বেও একটা ক্ষীণ আলোব রেখা যেন দেখা গেল। ডাক্তারবাবু গম্ভীব কণ্ঠে বললেন ঃ

"তবে বিশ্রাম দবকাব—সম্পূর্ণ বিশ্রাম। চলা-ফেরা, এমন কি নড়া-চড়া একদম বন্ধ। আব অনর্থক ওষুধ দেওযা আমি মোটেই পছন্দ করি না···তবে এই প্রেসক্রপশান লিখে দিচ্ছি—মিক্‌শ্চারটা আনিয়ে একবার এক্ষুনি খাইয়ে দিন বরঞ্চ। আর—হ্যাঁ ধন্যবাদ।" বলে দর্শনীর টাকাটা পকেটে পুরে নিয়ে কি যেন গভীর ভাবে ভেবে, আবার বললেন ঃ

"হ্যাঁ—সম্পূর্ণ বিশ্রামেব প্রয়োজন। যেন অন্যথা না হয়—সেটার দিকে কড়া নজর রাখবেন।"

বলে ইউজিনের দিকে ফিরে একটু ঘাড় কাৎ করে মুচকি হাসলেন।

যাবার আগে তিনি আরেকবার বিশ্রাম সম্বন্ধে কড়া নির্দেশ ও সাবধান-বাণী জানালেন আর দ্বিতীয় দফায় একটি বক্তৃতা দিলেন ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নাকে, স্ত্রীলোকের শরীর-তত্ত্ব সম্বন্ধে। ভার্ভারা খুব মনোযোগের সঙ্গেই ডাক্তারবাবুর বক্তৃতা শুনলেন, আর বড় সমজদারের মতন মাথা

নাড়তে লাগলেন। ভাবখানা এই—এ সমস্তই আমার জানা, নতুন কথা আর কি ?

ইউজিনের গাড়ি ফেরত গেল ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে। লিজাকেও শুয়ে থাকতে হ'ল বিছানায়, সপ্তাহখানেক।

১৫

এই সময়টা বেশির ভাগই ইউজিন কাটাত স্ত্রীর রোগশয্যার পাশে। নিজের কাজ-কর্ম কমিয়ে এনে, অধিকাংশ সময়টা সে ব্যয় করত লিজার ঘরে। কখনো বা বিছানার পাশে বসে গল্প জুড়ে দিত। কখনো বা একটা কিছু পড়ে শোনাতো—না হয় লিজার মন ভালো করবার জন্যে এটা-সেটা, নানান্ কথা পাড়তো। কাটছিল মন্দ নয়,—রোগশয্যায় শুয়ে থাকার স্বাভাবিক বিরক্তি সত্ত্বেও।

কিন্তু মুস্কিল বাধত—ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নাকে নিয়ে। স্বামী-স্ত্রীতে হয়তো কথা বলছে ওরা। বলা নেই, কওয়া নেই, ভার্ভারা এসে ছুম্ করে বসতেন বিছানার পাশে চেয়ার একখানা টেনে নিয়ে। বাস্—ওদের কথা যেত ফুরিয়ে। লিজা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত,—মা'র কথা-বার্তা হাল-চাল তার অজানা নয়। আর ইউজিনের দেহ-মন টাটিয়ে উঠত ভার্ভারার অর্থহীন কথা-কাটাকাটিতে। কখন কি ভাবে কোন্ কথার সূত্রে—হয়তো নিতান্তই অবাস্তব প্রসঙ্গে,—তিনি বেঁকে বসবেন, শুরু করবেন বাঁকা কথা আর অন্তরজ্বলুনি ঠেস, তার কিছুই স্থিরতা নেই। ইউজিন চেষ্টা করত নিপুণভাবে, তাঁর অতর্কিত আক্রমণগুলোকে এড়িয়ে যেতে। কিন্তু সুবিধা করতে পারত না। ভার্ভারার অদম্য প্রাণ-শক্তি আর প্রকাশ-শক্তির দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে ভেসে যেত ইউজিনের পুরুষোচিত স্থৈর্য। এক এক সময়ে ধৈর্যচ্যুতি হত। কিন্তু অনেক কষ্টে, লিজার মুখ চেয়ে নিজেকে সামলে নিত ইউজিন। চেষ্টা করত শাশুড়ীর অকারণ, মারাত্মক শ্লেষগুলোকে লঘুভাবে নিতে। সুস্থ মনে বাঁচতে হলে, গুরুতর মনান্তরের হেতুকে হাসি-ঠাট্টায় পরিণত করা ছাড়া আর কি উপায় আছে··· ?

কিন্তু বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকবার উপায় ছিল না ইউজিনের। মানে,—সে থাকতে পেত না। প্রথমত, লিজা ভয়ানক রাগ করত, ঠেলে তাকে পাঠিয়ে দিত বাইরে। বলত, "ও কি! পুরুষ মানুষ সমস্তক্ষণ ঘরে আবদ্ধ থাকবে কেন? যাও, খানিক ঘুরে এসো। চব্বিশ ঘণ্টা অসুস্থ মানুষের সঙ্গে চুপচাপ বসে থেকে থেকে শেষকালে যে নিজেই অসুখ বাধিয়ে বসবে! আমি ও-সব পছন্দ করি না। তা ছাড়া—এমন কি হয়েছে আমার··· ?"

তারপর, দ্বিতীয় কারণ হ'ল—ক্ষেতখামারের কাজ এখন পুরোদমে চলেছে। বাড়িতে এ সময়ে বসে থাকলে তার সত্যিই চলে না। প্রতি কাজেই তার উপস্থিতি ও নির্দেশের প্রয়োজন। মাঠে, বাগানে, ক্ষেতে—সর্বত্রই কাজ হচ্ছে। এদিকে ফসল কাটার শেষে নতুন করে জমি চাষ হচ্ছে, ওদিকে বাগান সাফ করা চলছে—নতুন ফল-ফুলের গাছ লাগাতে হবে—আবার গোলাবাড়িতে ঝাড়াই-মাড়াইয়ের কাজ হচ্ছে। এ সমস্ত কাজের দায়িত্ব আর ভার নেবার লোক কোথায়? জন-মজুররা তো খেটেই খালাস, তার মধ্যে অর্ধেক আবার ফাঁকির কারবার। ওদের খাটিয়ে নেওয়া দরকার। তাই সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে লিজার পাশে অষ্টপ্রহর বসে থাকলে চলে না ইউজিনের। বেরোতেই হয়।

আর সর্বত্র···সর্বক্ষণ যেখানেই যায়···যখনই কাজ-কর্ম নিয়ে ঘোরা-ফেরা করে ইউজিন,—সেই এক চিন্তা। শুধু চিন্তা নয়—স্টীপানিডার জাজ্বল্যমান, জীবন্ত মূর্তিখানি মনের পটে নিত্য-নিয়ত প্রতিফলিত হয়ে থাকে। যেটুকু ভুলে থাকে স্টীপানিডাকে, সেটুকু নেহাতই কাজের চাপে। নইলে অক্টো-পাসের মতন স্টীপানিডার উজ্জ্বল চেহারা ইউজিনের মনকে আঁকড়ে থাকে।

নাগপাশের বন্ধনে এই যে আষ্টে-পৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে থাকা—এতেও তেমন কিছু মারাত্মক ক্ষতি হয়তো হত না। কেননা, মনেরই জোরে, মনের এই বন্ধন থেকে হয়তো ইউজিন নিজেকে মুক্ত করে নিতে পারতো। কিন্তু মুস্কিল হ'ল অন্য জায়গায়। আগে আগে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে স্টীপানিডার অদর্শনে। কেননা, ইউজিনের সঙ্গে কচিৎ,

কালে-ভদ্রে দেখা হ'ত স্টীপানিডার। এখন হামেশাই দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে, চোখোচোখি হয়ে যাচ্ছে। ইউজিন যে আবার তাকে গ্রহণ করতে চায়, চায় পূর্বেকার সম্পর্ক স্থাপন করতে—এটা ক্রমশই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে স্টীপানিডার কাছে। ইউজিনের গোপন মনোভাবটা তার কাছে বেশ স্বচ্ছ এবং বোধগম্য হচ্ছে বলেই সে ইউজিনের চোখের সামনে মেলে ধরছে নিজেকে—ছলা-কৌশলে তার পথে এসে দাঁড়াচ্ছে। অবিশ্যি সামনা-সামনি, পষ্টা-পষ্টি কোন কথা হয় নি আজও উভয়ের মধ্যে। দু' তরফই নীরব এবং নির্বাক্। কেউই কোনো প্রকাশ্য প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসে নি। তাই সঙ্কেত-স্থল নির্দিষ্ট করে দু'জনে একত্র মিলতে পারে নি। কিন্তু উভয়েই স্পন্দিত প্রতীক্ষায় উন্মুখ, কম্পমান হয়ে আছে। দু' জনের 'চোখেই আগুন ঠিক্‌রে পড়ছে—স্ফুলিঙ্গবাহী দেহ-স্পর্শের অপেক্ষামাত্র।

দু'জনের একমাত্র মিলিত হবার জায়গা হ'ল বনের মধ্যে কোনো নিভৃত স্থান। একমাত্র সেইখানেই কিছুক্ষণ নির্বিঘ্নে দেখা-সাক্ষাৎ কথাবার্তা চলতে পারে। অন্যত্র শুধু বিপজ্জনক নয়—অসম্ভব।

বনের মধ্যে কাঠ কুড়োতে যায় চাষীব ঘরের বৌ-ঝিরা। সঙ্গে বড় বড় থলে বা বোরা নিয়ে যায় গরুদের খাবার ঘাস আনবার জন্যে। ইউজিন জানত এ সংবাদ। প্রায়ই দেখতে পেত মেয়ের দল যাচ্ছে বনের দিকে। তাই গোপনে সে-ও যেত বনের দিকে। রোজ রোজ ঘুরত, টহল দিত বনপথে আশায় আশায়। প্রত্যেক দিন ইউজিন প্রতিজ্ঞা করত, ও পথে আর সে যাবে না। ভাবত—আজই শেষ যাওয়া। আর প্রতিদিনই শেষ পর্যন্ত গুটিগুটি চলে যেত বনের মধ্যে। মেয়েদের সমবেত কলস্বরে চকিত হয়ে লুকিয়ে পড়ত। আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে থাকত নিস্তব্ধ প্রতীক্ষায় হয়তো কোনও ঝোপের পেছনে—যদি স্টীপানিডা এসে থাকে, দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। প্রথম মিলনের বেপথু হৃদয়ের মতই কেঁপে উঠত তার হৃৎপিণ্ড আকুল আকাঙ্ক্ষায়, অনিশ্চিত মিলনের অধীর আগ্রহে।

কেন যে ইউজিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত বনের মধ্যে ব্যগ্র প্রতীক্ষায়, স্টীপানিডা এসেছে কিনা, মেয়েদের দলের মধ্যে তার সুপরিচিত চেহারা

দেখা যায় কিনা—শুধু সেইটুকু দেখবার জন্যে,—ইউজিন তা নিজেই জানে না। বলতেই পারে না তার এই ছেলেমানুষী কৌতূহলের অর্থ। যদিই বা স্টীপানিডা থাকত ঐ দলে, দেখা হয়ে যেত একলা তার সঙ্গে—কেউ কোথাও নেই, নিভৃত বনের নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন একটি কোণে, ইউজিন কখনোই তার সামনে মুখোমুখি এগিয়ে এসে দাঁড়াতে পারত না। অন্ততঃ সে তাই মনে করে। ভাবে—যদি এমনি অভাবিত সুযোগে পরম-ঈপ্সিত দেহাধিকারিণীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া যেত, তা হলেও সে পালিয়ে যেত দূরে—অনেক দূরে।

তবু ইউজিন নিত্য হাজিরা দেয় বন-পথে। শুধু চোখের দেখা দেখতে চায় স্টীপানিডাকে···

একদিন দেখা হয়ে গেল ঘটনাচক্রে।

ইউজিন ছোট জঙ্গলটা পেরিয়ে বনের মধ্যে সরু পথটা ধরেছে। এমন সময়ে পথের বাঁকে দেখা গেল স্টীপানিডাকে।

স্টীপানিডা বেরিয়ে আসছে বন থেকে। সঙ্গে আর দু'জন স্ত্রীলোক। পিঠে একটা করে ভারী বোঝা—শুকনো ঘাসে বোঝাই। আরেকটু আগে হলে বনের মধ্যেই দেখা হয়ে যেত দু'জনার। একটুর জন্যে ফস্‌কে গেল। এখন আর কি করে হয়? দু'জন সঙ্গিনী রয়েছে। তাদের কি অছিলায় সরিয়ে দেবে স্টীপানিডা? ফিরে যাবে ইউজিনের সঙ্গে একলা বনের মধ্যে? শুধু দৃষ্টিকটু নয়—অসম্ভব।

স্টীপানিডাকে একলা কাছে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই ক্ষীণতম—এটা জেনে এবং বুঝেও ইউজিন একটা হেজেল গাছের আড়ালে সরে গেল চট্ করে। দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ নীচু ঝোপটার পিছনে। পথ থেকে তাকে যে-কোনো মুহূর্তে অপর দু'জন স্ত্রীলোক দেখে চিনে ফেলতে পারে—তা জেনেও ইউজিন নড়তে পারল না নিজের জায়গা ছেড়ে।

বলা বাহুল্য, স্টীপানিডা আর ফিরে এল না। তবু ইউজিন দাঁড়িয়ে রইল কি যেন আশায়। কি আশ্চর্য···দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুও ক্লান্তি বোধ হ'ল না তার। বরঞ্চ মনে হতে লাগল সময়টা কোথা দিয়ে যেন উড়ে গেল।

লঘুপক্ষ পাখির মতন স্টীপানিডাও যেন ভেসে চলে গেল এক নিমেষে, নীল শূন্যকে চিরে দিয়ে। তারপর—অদ্ভুত, নিঝুম নিস্তব্ধতা। খালি বুকের টিপ টিপ শব্দ শোনা যায়—আর কিছু না। সেই নিঃসীম, নিঃসঙ্গ শূন্যতাকে পূর্ণতর রূপ দেয় স্টীপানিডার বিলীয়মান মূর্তি। আর কল্পনায় কতো লোভনীয়, কতো চিত্তবিভ্রমকারী সেই মূর্তি। শব্দহীন পদক্ষেপে ইউজিনের গভীরতম সত্তার দ্বারদেশে এসে প্রতীক্ষায় ও সমর্পণের রভস-লীলায় যেন উদ্বাহু হয়ে দাঁড়ায় সেই কল্পিতা অভিসারিণী।

এ ব্যাপারটা একবার নয়,—দু'বার নয়—ঘটল পাঁচ ছ'বার। আর প্রতিবারই কামনার আবেগ যেন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল। স্টীপানিডার প্রতি এতোখানি আকর্ষণ যেন এর আগে ইউজিন এতো বেশি করে অনুভব করে নি। প্রতিবারই মনে হয়—আরো সুন্দর, ঢের বেশি সুন্দর হয়ে উঠেছে স্টীপানিডা। এই ভাবে, আবার একটু একটু করে স্টীপানিডার দুর্ভেদ্য মায়াজালে বন্দী হয়ে পড়ল ইউজিন। তার সবল ইচ্ছাশক্তি এবং দৃপ্ত পৌরুষ কখন, কী করে, ধীরে ধীরে এই আকর্ষণের কাছে পরাস্ত হ'ল,—এই দাসত্বকে প্রতিরোধ করতে একটুও তাকে সাহায্য করল না, তা ইউজিন নিজেই ভালো করে ঠাহর করতে পারল না।

মাঝে মাঝে মনে হয় ইউজিনের, সে বুঝি পাগল হয়ে গেছে। নইলে জ্ঞাতসারে, আবার এমন করে সে ডুবতে বসল কেন? বুঝতে পারে, মনের ওপর তার দৃঢ় অধিকার, কঠিন সংযম একেবারে লুপ্ত হয়েছে। বিবেচনা-বুদ্ধি সে এখনও হারায় নি—এটা ঠিক। নিজেকে এখনও সে বিচার করতে পারে দূর থেকে—নিরাসক্ত, আত্মস্থ দৃষ্টিতে। নির্মম আত্মবিশ্লেষণের বলিষ্ঠতা তার মনন-শক্তির মেরুদণ্ডকে এখনও খাড়া রেখেছে। বেশ বুঝতে পারে ইউজিন তার ব্যভিচারের কুৎসিত দুর্বলতা। কোনও সাফাই কৈফিয়ৎ নেই তার এই জঘন্য কামনার, এই অশ্রদ্ধেয় নীচ কর্ম-প্রবৃত্তির। প্রবৃত্তি তো বটেই! কেননা, সে তো জেনে-শুনে, বুঝে এবং আশা করেই রোজ বনের দিকে ছুটেছে দিশাহারা হয়ে।

ইউজিন জানে—ভালো করেই জানে—একবার অন্ধকারে স্টীপানিডার কাছে আসার অপেক্ষা মাত্র। সম্ভব হলে, অঙ্গস্পর্শ ঘটলেই সে আগুনের মতন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। নিজেকে সংযত রাখা তখন ইউজিনের অসম্ভব হয়ে উঠবে—কোনো মতেই সামলানো যাবে না। ইন্দ্রিয়জ মোহে ধৈর্যের বাঁধ যাবে ভেঙ্গে—ধ্বসে। ইউজিন এটাও জানে, ভেবে দেখেছে—এতো দিন একটা যে কিছু ঘটে যায় নি, সেটা নিতান্তই দৈব ঘটনা। স্থান-কাল-পাত্রের এবং সুযোগ-মাফিক যোগাযোগের অভাব। নিজেকে কোনও মতে এতদিন সে যে আটকে রাখতে পেরেছে সেটাতে তার নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নেই। নেহাতই লজ্জা, ভয়, চক্ষু লজ্জা। অন্য লোকে পাছে জেনে ফেলে, সেই কারণে লজ্জা। স্টীপানিডা তাকে কি ভাববে,—হাতের পুতুল মনে করবে, সেই কারণে লজ্জা। আর নিজের কাছে নিজের লজ্জা—হেয় অশ্রদ্ধেয় হয়ে যাবার স্বাভাবিক ভয়ের বাধা।

যেটা গভীরতম লজ্জাব কারণ, সেটা হ'ল এই : ইউজিন নিজেই এ যাবৎ এমন সুবিধা-সুযোগ খুঁজছে যাতে সেই লজ্জা-সঙ্কোচ চাপা পড়ে যায়। স্টীপানিডার দৈহিক সান্নিধ্য আর অন্ধকারের আশ্রয়-ভিক্ষা—সে তো তাব কাপুরুষতারই চরম নিদর্শন। তা ছাড়া, আর কি বলা যায় ? ইউজিন মনে মনে কামনা করেছে, খুঁজেছে এমন একটা পবিবেশ যেখানে পাশববৃত্তি অন্ধকারে বিবেকবুদ্ধির টুঁটি টিপে ধরে—কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—ভদ্র-শিক্ষিত মনের ন্যায্য সঙ্গত প্রতিক্রিয়া চাপা পড়ে যায় ইন্দ্রিয়ানুভূতির অসহ্য উত্তেজনায়।

তাই ইউজিন মনে মনে ভাবে, তার মতন জ্ঞান-পাপী দুনিয়ায় নেই। জানছে, বুঝছে সবই। তবু নির্ভুল পদক্ষেপে সে এগিয়ে এসেছে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতনের প্রান্তদেশে। মনে হয়—তার মতন দুর্বৃত্ত আর কেউ নেই। সমস্ত অন্তর ভরে ওঠে নিজের প্রতি নিজেরই সঞ্চিত বিতৃষ্ণার বিষে। অবুঝের মতন, অন্ধ উন্মাদের মতন যদি সে ঝাঁপ দিত, তাহলে এতটা আত্মানুশোচনার কারণ থাকত না। কিন্তু এ আত্মসমর্পণের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে সজ্ঞানে,—একরকম ইচ্ছাকৃত বলাই চলে। তাই

আত্মধিক্কার বাড়তে থাকে···সারা মন-প্রাণ দিয়েই সে ঘৃণা করে আপনাকে ···ভীষণ ভাবে ঘৃণা করে।

ইউজিন প্রাণপণ চেষ্টা করে প্রলোভনের হাত থেকে উদ্ধার পেতে। ঐকান্তিক প্রার্থনা জানায় ঈশ্বরের কাছেঃ "আমাকে শক্তি দাও, হে ভগবান্! নিশ্চিত ধ্বংস থেকে আমাকে পরিত্রাণ করো। মনে বল এনে দাও—যেন এই অন্ধ, উন্মাদ মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারি।"

প্রতিদিনই ইউজিন প্রতিজ্ঞা করত মনে মনেঃ "আর নয়। এই শেষ। আজ থেকে স্টীপানিডার সমস্ত চিন্তা, ওর প্রসঙ্গ ভুলে যাবো—মন থেকে ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবো। ওকে দেখবার জন্যে এগিয়ে যাবো না—এক পা'ও বাড়াবো না। চোখের দেখা দেখবার জন্যে এই হীন কাঙালপনা—এর চেয়ে আত্মসম্মানের হানি, নৈতিক অধঃপতনের প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না!"

প্রতিদিন ইউজিন চেষ্টা করে নিজের মনকে বোঝাতে। এই দুর্দম প্রলোভনকে জয় করবার উপায়-কৌশল খোঁজে। চেষ্টা করে—মতলব কাজে লাগাতে, নানা ফিকির-ফন্দী খাটিয়ে।

কিন্তু সমস্তই ভেস্তে যায়। তার ঐকান্তিক আগ্রহ, আত্মরক্ষার যত কিছু পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় পণ্ডশ্রমে।

ইউজিন যে-সমস্ত উপায় ঠাউরেছিল, তার মধ্যে একটি হ'ল, নিজেকে সমস্তক্ষণ কাজে ডুবিয়ে রাখা, কোনো দ্বিতীয় প্রসঙ্গের চিন্তাবকাশ যাতে একদম না পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় উপায় হ'ল—প্রচুর কায়িক পরিশ্রম আর মধ্যে মধ্যে উপবাস। নিত্য-নিয়মিত দেহশ্রমে আর উপবাস-বিধিতে দেহ-মন ক্ষীণবল হয়ে আসবে, ঘুচবে উত্তেজনা।

তৃতীয় উপায় হ'ল—কল্পনা-চিত্রের সাহায্যে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করা। পরিষ্কার ছবি আঁকত ইউজিন মনে-মনে,—যখন সবাই তার গোপন অবৈধ আকর্ষণের কথা জেনে ফেলবে, তখন কি হবে! মেরী পাভলোভনা, ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না, লিজা আর দেশের লোক যখন জানতে পারবে, তখন

কি ভয়াবহ সঙ্কট-অবস্থা দাঁড়াবে। শাশুড়ী, স্ত্রী ও মা'র সামনে—পরিচিত অনাত্মীয়দের সামনেই বা কি করে মুখ তুলে দাঁড়াবে ইউজিন ?

রোজই এই সব কথা ভাবে ইউজিন, নানা চিন্তায় ও কৌশলে নিজের মনকে দৃঢ় ও কঠিন করে তোলে। মনে হয়—একটু একটু করে যেন কাজ হচ্ছে, প্রলোভনের ধার কমে আসছে ধীরে ধীরে।

সময়ের নির্ভুল কাঁটায় আবার ঘুরে আসে সেই নিস্তব্ধ দ্বি-প্রহর। মধ্যাহ্নের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, খর আলোর তার প্রখর আশার থর থর দীপ্তি নিয়ে কাঁপে চোখের সামনে। মনে পড়ে যায় আগেকার ঘটনাগুলো। সুস্পষ্ট ছবির গভীর অবিস্মরণীয় রেখার উচ্ছল উজ্জ্বলতায় নিভৃত বনপথের কুঞ্চিত ছায়ায় তাঁদের সেই সঙ্কেতস্থল, প্রতীক্ষায় উচাটন সেই আশ্চর্য মুহূর্তগুলো···ঘাসের বোঝা পিঠে নিয়ে চলেছে স্টীপানিডা···আর অধীর আগ্রহে, উদগ্র কামনায় চোরের মতন সন্তর্পণে বনের সুঁড়ি পথে দাঁড়িয়ে সে নিজে,···লতান্তরিত দেহ, কবোঞ্চ নিঃশ্বাস···

এইভাবে কাটল পাঁচদিন। পাঁচটি দিন আর রাত-ভোর ইউজিন লড়াই চালালো নিজেরই সঙ্গে। আত্মদমন আর আত্মনিগ্রহের ক্ষতচিহ্ন যেন পরিস্ফুট হয়ে উঠল তার মুখে-চোখে, সর্ব অঙ্গে।

দূর থেকে শুধু দেখল ইউজিন স্টীপানিডাকে···একবারও মুখোমুখি হ'ল না তার সঙ্গে···।

লিজা ক্রমশঃ ভালো হয়ে উঠতে লাগল। তবে আস্তে আস্তে একটু একটু করে। অনেক দিন বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে প্রথমটা চলাফেরা করতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকত। এখন অবশ্য আর তেমন ঠেকে না। অভ্যেস হয়ে এসেছে—লিজা স্বাভাবিকভাবেই ঘোরাফেরা করে আজকাল।

তবে একটা জিনিসে মনে ভারী অস্বস্তি বোধ হয়। স্বামীর ভাবান্তরের হেতুটা সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। ইউজিনের এই আকস্মিক মানসিক পরিবর্তন সব কিছু যেন বিশ্রী, বিস্বাদ করে দেয়। সে যে ক্রমশই আনমনা

হয়ে যাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টা কি একটা দুশ্চিন্তায় অন্যমনস্ক, আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এটা স্পষ্টই দেখতে পায় লিজা। কিন্তু···কেন? কি এমন দুর্ভাবনা···? ধরতে না পেরে লিজার মন আরো খারাপ হয়ে যায়।

ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না কিছুদিন হ'ল চলে গেছেন। মেরী পাভলোভনা অবশ্য বাড়িতেই আছেন। তিনি ঘর থেকে বড় একটা বাইরে বেরোন না। আর আছেন ইউজিনের সেই দূর সম্পর্কের মামা—অতিথি হিসেবে।

দিন যেন আর কাটতে চায় না। ইউজিনের তখন সেই অর্ধোন্মাদ অবস্থা। মনটা অপ্রকৃতিস্থ। নিজের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছে। একলা একলাই থাকতে চায় বেশিক্ষণ, মন গুম্‌রে গুম্‌রে বেড়ায়।

এমন সময়ে নামল বৃষ্টি। জুন মাসটায় এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে। দুদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি আর মুহুর্মুহু বজ্রপাত। সে কী অবিশ্রান্ত ধারা-বর্ষণ আর বিদ্যুতের চমকানি! পৃথিবী যেন ঝাপসা, সজল ধূম্রজালে আগাগোড়া মোড়া। সমস্ত কাজকর্ম আপনা থেকেই বন্ধ। কে আর বেরোবে এই দুর্যোগ মাথায় করে! ক্ষেত-খামারে কেউ আর হাজিরা দেয় না। জমিতে গাড়ি করে সার নিয়ে গিয়ে ফেলা আর হয় না। জন-মজুরের দল সেই নোংরা কাদার পাঁক ঘাঁটতে নারাজ। তারা সব ঘরে বসে, জমির দিকে ভিড়তে চায় না। চাষীরাও তাই, কুঁড়েঘরে আগল এঁটে বসে আছে।

আর রাখালদের নাকালের একশেষ! গরু-বাছুরগুলোকে এই বৃষ্টির মধ্যে তাড়িয়ে গোয়ালে ঢোকানো—সে এক প্রাণান্তকর ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত কোনোরকমে তাদের মাঠ থেকে ফিরিয়ে আনা হ'ল। অন্য সব গরু-ভেড়া, যারা ঘরেই ছিল, তারাও ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়ল এই সুযোগে চরে' খাবার জন্যে। মাঠে ছুটোছুটি শুরু করে দিল সব। চাষীর বৌ-ঝিরা গায়ে একখানা করে পশমী চাদর জড়িয়ে নিয়ে খালি পায়ে জল-কাদার মধ্যেই ছুটন্ত গরু-বাছুরগুলোকে ধরবার জন্যে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে লাগল। চারিদিকেই জল। মাঠে, ক্ষেতে, রাস্তায়—

সর্বত্রই জলস্রোত। খানা-খোন্দল জলে ভরতি—নালা দিয়ে জল ছুটেছে তীব্র বেগে। ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ভাঙা ডাল-পালা, অজস্র খড়কুটো। বনে-বাগানেও সেই এক অবস্থা। ঢালু জমি বেয়ে নামছে জলের ধারা—যেন ছোট ছোট ঝরনা। সমস্ত পথঘাট ভিজে। পাতা আর ঘাসগুলোর নরম সবুজ রঙ পর্যন্ত বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ক্রমাগত জলে ধুয়ে ধুয়ে।

ইউজিন ঘরেই বসেছিল। লিজাও ছিল বসে।

কিন্তু লিজার সঙ্গ আজ যেন ক্লান্তিকর লাগছিল ইউজিনের। রীতিমত অপ্রীতিকর লাগছিল এই চুপচাপ বসে থাকা, নয়তো লিজার প্রশ্নের জবাব দেওয়া।

কি যেন হয়েছে আজকে লিজার। স্বামীর মনের অবস্থা দেখে তারও অস্বস্তি জাগে মনে। থেকে থেকে একই প্রশ্ন করে:

"কি হয়েছে বলো তো, তোমার…"

"কিছু হয় নি…কি আবার হবে?" জবাব দেয় ইউজিন। কণ্ঠস্বরে বিরক্তির ঝাঁজ ফুটে ওঠে।

লিজা হাল ছেড়ে দেয়—আর কিছু জিজ্ঞাসা করে না। স্বামীর অসহিষ্ণুতায়, তার চিন্তাপীড়িত মুখের চেহারায় কষ্ট পায় লিজা। কিন্তু স্বামীকে প্রশ্ন করে সে আর উত্যক্ত করতে চায় না। ইউজিনের মনঃকষ্টের অংশ সে যখন গ্রহণ করতে পারছে না—তখন বার বার একই কথা তুলে কোনো লাভ নেই। ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে লিজা। কিন্তু জোর করে নিজের মানসিক বিক্ষোভ নিজেই চেপে রাখে।

সকাল বেলার খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেছে।

বসেছিল লিজা আর ইউজিন, ড্রয়িং রুমে। ইউজিনের সেই মামাও ছিলেন। ভদ্রলোক এতো অজস্র বাজে কথাও বলতে পারেন! এই নিয়ে বোধ হয় একশো বার বল্‌লেন তাঁর বড় বড় আলাপীদের কথা। সমাজে, অভিজাত ঘরের, মস্ত বড় লোকদের সঙ্গে তাঁর কি রকম ঘনিষ্ঠ আলাপ, কি রকম খাতির, সেই কথা যেন আর শেষ হতে চায় না। ইউজিন ও লিজা

তাঁর এই কাল্পনিক কাহিনীগুলো বহুবারই শুনেছে এবং শুনে শুনে তাদের কান পচে গেছে। এখন ওঁর কথায় তারা কেউ কান দেয় না।

লিজা অন্যমনস্কভাবে বুনে চলেছিল। বুন্‌ছিল একটা পশমের জামা। এক এক সময়ে ভারী বিরক্ত লাগছিল তার। ক্রমাগত এই ঘ্যানর ঘ্যানর—টেনেবুনে রসিকতার প্রাণান্ত চেষ্টা—আর একই ধরনের পুরানো, সস্তা রসিকতা—মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। কিন্তু কি আর করবে লিজা? পশমের ওপর ঝুঁকে পড়ে আন্‌মনা হয়ে বুনতে থাকে। কখনো বা সোজা হয়ে বসে চুপ করে থাকে—এদিক ওদিক তাকায় আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। এক-আধটা টুকরো কথা বেরিয়ে আসে মুখ থেকে হয়তো—'কি বিশ্রী দিনটা আজ!' কিংবা 'পিঠের এই জায়গাটা কি রকম ব্যথা লাগছে, টন্‌টন করছে মধ্যে মধ্যে।' এ যেন কথা বলতে হয়, তাই বলা।

মামা মুখের কথা লুফে নিয়ে বলে ওঠেন:

"তা হ'লে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়াই ভালো।"

নিজেও উঠে পড়েন সঙ্গে সঙ্গে। এদিক ওদিক একটু ঘুরে এসে নিজের জন্যে ভড্‌কার সন্ধান করেন। গলাটা শুকিয়ে উঠেছে—একটু ভিজিয়ে নেওয়া দরকার।

কি বিশ্রী আর বিস্বাদ লাগে এই বাড়ির আবহাওয়া। কোনো বৈচিত্র্য নেই, কোনো নতুনত্ব নেই। সেই এক কথা—খাওয়া আর বসা। ব্যস্‌, ফুরিয়ে গেল দিনটা। ইউজিনের মনটা তিক্ততায় আর নৈরাশ্যে পাথরের মত ভারী হয়ে ওঠে। একবার একখানা বই নিয়ে নাড়ে চাড়ে। সেটা ফেলে দিয়ে আবার একখানা ম্যাগাজিন টেনে নেয়। চোখ রেখে লেখার ওপর পড়বার চেষ্টা করে। এক বর্ণও ঢোকে না মাথায়। সব ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ে ইউজিন, মন বসাতে না পেরে। লিজার দিকে তাকিয়ে বলে:

"যাই, একবার ঘুরে দেখে আসি। বেরোতেই তো হবে। উখো দিয়ে ঘষবার নতুন মেশিনটা এসে পড়ে আছে কাল থেকে"...

বলেই বারমুখো হয় ইউজিন। ঘরে বসে থাকা অসম্ভব।

পেছন থেকে লিজা বলে ওঠে : "ছাতা নিয়ে বেরিয়ো কিন্তু"...

ইউজিন ততক্ষণ বারান্দায় গিয়ে পড়েছে। হেঁকে জবাব দেয় :

"নাঃ—ছাতাব দবকার নেই। এখানে লেদার-কোট রয়েছে। তা ছাডা, আমি তো বেশিদূব যাচ্ছি না—এই মেশিন ঘব অবধি"...

পায়ে বুট-জোডাটা গলিয়ে নেয় ইউজিন। গায়ে লেদার কোট চড়িয়ে, বেবিয়ে পড়ে সাঁ কবে কাবখানাব দিকে। তখনও বৃষ্টি চলছে, ছাটও আছে।

বিশ গজ বাস্তা যেতে না যেতেই দেখতে পায ইউজিন—একটি স্ত্রীলোক আসছে তাব দিকেই। জলেব মধ্য দিযেই ছলাৎ ছলাৎ কবে হেঁটে আসছে। খালি পা। স্কার্টটা অনেকখানি উঁচুতে তোলা—প্রায় হাঁটু পর্যন্ত। সুগঠিত শাদা পায়ের ডিম জলে ভিজে আবো যেন ধব্ধবে শাদা দেখাচ্ছে। মাথার ওপর থেকে কাঁধ ও পিঠ পর্যন্ত পশমী চাদরে ঢাকা। চাদবেব দুইটি প্রান্ত একত্র কবে এক মুঠোয ধবা। বেশ গুটি-গুটি, কুঁজো হয়ে জলেব ছাট বাঁচিযে এগিয়ে আসছ...

"কোথায় চলেছে ?" না চিনেই জিজ্ঞাসা কবে ইউজিন। ভেবেছিল আব কেউ বুঝি।

মুখখানা ঠাহব হয নি প্রথমটা। যখন ইউজিন চিনতে পাবল তাকে, তখন আব উপায় নেই। প্রশ্ন বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে...

"বাছুর হাবিযেছে। তাই খুঁজে মরছি...তা' আপনি এই বৃষ্টিতে ? যাচ্ছেন কোথায় ?"

কথাগুলো এমন সহজ কণ্ঠে বলল স্টীপানিডা—যেন ইউজিনের সঙ্গে তার রোজই দেখা-সাক্ষাৎ, কথাবার্তা হযে থাকে। বিস্ময়ের কোন চমক নেই তাতে।

"ঐ ছাউনি ঘরটায় এসো..." হঠাৎ বলে বসল ইউজিন। নিজেই বুঝতে পাবে না সে, কেমন করে এমন কথা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল...আর কেনই বা সে দুম্ করে কথাটা বলে ফেলল।

নিজেকে সামলে নেবার সময় মেলে নি। আর কেউ যেন তার মুখ দিয়ে কথাটা বলিয়ে নিল।

থমকে দাঁড়িয়ে রইল স্টীপানিডা। হাসি-হাসি মুখে বেশ খানিকক্ষণ নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টিতে দেখে নেয় ইউজিনকে—তার মুখ আর সারা দেহখানা।

চাদরের একটা কোণ দাঁত দিয়ে খুঁটতে থাকে স্টীপানিডা। কী যেন ভাবছে ও···তারপর সহসা একটা কটাক্ষ হেনে দ্রুত পায়ে চলে যায় সোজা-সুজি বাগানের পথ পেরিয়ে ছাউনি-ঘরের দিকে।

ইউজিন কিন্তু পিছু পিছু গেল না। যে-পথ ধরে আসছিল মাঠের ওপর দিয়ে সেই পথ দিয়েই চলতে শুরু করে আবার। ইচ্ছেটা এই যে, লাইল্যাক ঝোপের কাছ বরাবর গিয়ে বাঁ-হাতি সরু পথটা ধরে ছাউনি ঘরে গিয়ে পৌঁছুবে। তবু খানিকটা ঘুর-পথ···

"হুজুর!"

পেছন থেকে কার গলার আওয়াজ শোনা গেল···

"হুজুর! গিন্নীমা ডাকছেন আপনাকে···কি জরুরী কাজ আছে। এক মিনিটের জন্যে একবার আসুন···"

ইউজিন ফিরে দাঁড়ায়। দেখে, তার বেয়ারা মিশিয়া···জলের ভেতর দিয়েই হাঁটছে জোরে জোরে মনিবকে ধরবার জন্যে।

অন্যমনস্ক, আবিষ্ট ভাবটা কেটে যায় ইউজিনের। বলে ওঠে:

"একেই বলে দৈব! এই নিয়ে দু' বার। দু' বারই তুমি আমায় বাঁচালে ভগবান্!"

ইউজিন তক্ষুনি ফিরল।

মিশিয়ার সঙ্গে ফিরে এল বাড়িতে লিজার জরুরী ডাকে।

আসবামাত্রই লিজা ইউজিনকে স্মরণ করিয়ে দিল:

"সেই যে বুড়ী মেয়ে-মানুষটির অসুখ করেছে···তুমি বললে খাবার টেবিলে বসে, ওকে ওষুধ পাঠিয়ে দেবে! কথা দিয়েছ যখন তখন দেওয়াই

উচিত। সে হয়তো আশা করে আছে···বেরোচ্ছ যখন—তখন নিয়েই যাও না নিজে, সঙ্গে করে···”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ—ভুলে গিছলুম···” ইউজিন বলে ওঠে তাড়াতাড়ি।

তুজনে মিলে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওযুধটা খুঁজে বার করে।

মিনিট পাঁচেক সময় এতেই বেরিয়ে যায়। তারপর ওষুধটা হাতে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে ইউজিন।

কিন্তু সে মন আর নেই ইউজিনের। এখন জাগছে দ্বন্দ্ব আর সংশয়··· সোজাসুজি ছাউনি-ঘরের দিকে এগিয়ে যেতে পা যেন উঠতে চায় না—ভারী হয়ে আসে। এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গিয়েছে—যার ফলে, মনের মধ্যে তুনিয়ার সঙ্কোচ আর কুণ্ঠা এসে জড়ো হয়েছে···তা ছাড়া পিছন থেকে বাড়ির কেউ যদি দেখে ফেলে, আঁচ করে···?

শুধু একটু একটু করে এগুতে থাকে ইউজিন, দ্বিধা-তুর্বল অর্ধগতিতে। তার পর বাড়িটা যখন অদৃশ্য হয়ে যায় বড় গাছগুলোব আড়ালে, ঝাঁ করে বাঁ-হাতি বাঁকা পথটা ধবে ইউজিন। তাড়াতাডি হাঁটতে শুরু করে উত্তেজনায়···শেষ পর্যন্ত পৌছয় ছাউনি-ঘরের আগলটার কাছে।

কল্পনা-নেত্রে স্পষ্ট যেন দেখতে পায় ইউজিন স্টীপানিডাকে। চোখের সামনে পরিষ্কার ভেসে ওঠে হাস্যমুখীর উজ্জ্বল, জীবন্ত ছবিখানা। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে বুঝি নীরব প্রতীক্ষায়, অপরূপ কৌতুকময় দৃষ্টি আর স্পন্দিত হৃদয় নিয়ে। আগলটা ঠেলে ব্যাকুল আগ্রহে ঢুকে পড়ে ইউজিন···

কেউ কোথাও নেই। স্টীপানিডা নেই ঘরের মধ্যে···

সে যে এসেছিল কিংবা এসে ফিরে গেছে—এমন কোনো চিহ্নই নেই ঘরে।

ইউজিন ভাবতে থাকে···

স্টীপানিডা যে এখানে আসে নি, সে তো স্পষ্টই দেখা এবং বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কেন? কি হল···?

হয়তো সে ইউজিনের কথা শুনতে পায় নি। এমনও হতে পারে, ইউজিন যে তাকে ছাউনি-ঘরে আসবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছিল, সেটা ঠিক সে

বুঝতে পারে নি। ইউজিন যেভাবে দাঁতে দাঁত চেপে অস্পষ্ট কণ্ঠে কথাটা বলেছিল, তাতে না শুনতে পাওয়ারই সম্ভাবনা বেশি।

কিন্তু স্টীপানিডা নিজেই হয়তো শেষ পর্যন্ত ইচ্ছে করে আসে নি। তার মত বদ্‌লেছে। দেহ-মনের কিংবা ইচ্ছার পরিবর্তন হওয়া কি এমনি অস্বাভাবিক? বিশেষ করে, মাঝখানে এতো দিনের ব্যবধান।

"সত্যিই তো!" ইউজিন আবার ভাবে, "আমার ভুল হয়েছে। আমারই বোঝবার ভুল···আমি বা কেন ভাবতে গেলুম যে, স্টীপানিডা আমাকে দেখেই ছুটে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার গায়ের ওপর···? এমনতর ভাবনার, অনুমান-প্রত্যাশার কি কোনো সঙ্গত কারণ আছে? মোটেই নেই;···যেহেতু—প্রথম কথা, তার স্বামী রয়েছে বর্তমান, সুস্থ শরীরে, বহাল-তবিয়তে··· আসলে আমি নিজেই মস্ত বড় বোকা, বোকারও অধম—পাষণ্ড। ঘরে রয়েছে ঘরণী—আর কত ভালো স্ত্রী সে—তবু ছুটছি আরেকজনের বৌয়ের পেছনে। চমৎকার বুদ্ধি আর রুচি আমার···!"

ছাউনি-ঘরের কোণে বেঞ্চিটায় বসে ইউজিন ভাবে নিজের কথা। নিজেকে বিশ্লেষণ করে নির্মমভাবে। নিরাশার ব্যর্থতা আর উত্তেজনার অবসন্ন শান্তি সেই আত্মচিন্তাকে যেন আরো তিক্ততায় ডুবিয়ে মারে।

বসে বসে ভাবে আর এদিক ওদিক চোখ ফেরায় ইউজিন। দেখে ছাউনি-ঘরের চালে দু-একটা ফুটো। ফুটো বেয়ে খড়ো চাল থেকে জলের ফোঁটা টিপ্‌-টিপ্‌ করে পড়ছে কাঠের মেঝের ওপর।

"কিন্তু কি ভালোই লাগত, যদি আসত স্টীপানিডা—আসত একলা এই বৃষ্টি মাথায় করে! কেউ কোথাও নেই—ফাঁকা মাঠে ঝাপসা বৃষ্টি আর অবিশ্রান্ত জোলো হাওয়া আর এই ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যিখানে সে আর আমি—একলা। যদি আরেকবার ওকে পেতুম—বুকের মধ্যে বন্দী করে রাখতুম ওকে···ছাড়তুম না···তারপর যা হবার তা-ই হত—কিচ্ছু এসে যেত না। না, ছাড়তুম না···আমার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেত না স্টীপানিডা···"

বসে বসে ভাবে ইউজিন। একলা নির্জনে বসে সেই এক কথাই ভাবে। বাইরের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর অশান্ত আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

ইউজিনের দুরন্ত কামনা হৃদয়ে দাপাদাপি শুরু করে দেয়···দেহ-মনকে ক্ষইয়ে দেওয়া সে দুর্বার কামনার অপার চিন্তা···শেষ নেই তার।

হঠাৎ মনে পড়ে যায় ইউজিনের···"তাইতো! বাইরে ঘাসের মাটিতে ওর পায়ের দাগ পড়েছে কিনা দেখলেই বোঝা যায় সে এসেছিল কিংবা আসে নি!"

বাইরে বেরিয়ে এদিক ওদিক তাকায় ইউজিন, কোনো নিশানা পাওয়া যায় কিনা। ছাউনি-ঘরের চৌকাঠের বাইরে ভিজে স্যাঁৎসেঁতে মাটি আর ঘাসে আগাছায় ঢাকা পড়ে যাওয়া সরু সুঁড়ি পথটা লক্ষ করে দেখে।

ঐ তো পরিষ্কার পদ-চিহ্ন, অনেকগুলো···পর-পর···শুধু পায়ের দাগ, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। এমন কি, যেখানটায় পিছল পথে পা হড়কে গিয়েছিল, সেখানেও একটা লম্বা টানা দাগ···

"এসেছিল তা'হলে। ভুল হয় নি···আমার। আর তো সন্দেহের কারণ নেই। ভালোই হ'ল ··" ইউজিন মন স্থির করবার চেষ্টায় শরীরটা টান করে নেয়।

"একবকম ভালোই হ'ল···হেস্তনেস্ত কবা দরকার এবারে। স্টীপানিডার সঙ্গে এরপর যখন আবার দেখা হবে, তখন আর 'কিন্তু' করার কারণ থাকবে না—সোজা চলে যাবো ওর কাছে···এ আমার নিয়তি···নিয়তির অভ্রান্ত ইঙ্গিত···" ইউজিন আবার ভালো করে নজর করে ভিজে মাটির নরম বুকে পায়ের দাগগুলো।

তারপর মাথা নেড়ে আপন মনেই বলে ওঠে:

"হ্যাঁ—যাবো ওর কাছে। যেতেই হবে। আজই—রাত্তির হলে···"

ফিরে যায় ইউজিন ছাউনি-ঘরের মধ্যে। চুপটি করে বসে থাকে অনেকক্ষণ, কোণের বেঞ্চির ওপর। রাজ্যের চিন্তা এসে ঢোকে মগজে।

ভেবে ভেবে, কল্পনায় ছবি এঁকে, আপন মনে বিড় বিড় করে বকে, ইউজিন ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে।

তারপর এক সময়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। সব যেন ঝিমিয়ে আসে।

খিন্ন দেহ, স্তিমিত আর নিস্তেজ মন নিয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে বাড়ির দিকে ফেরে ইউজিন।

হাতে এখনও ওষুধটা রয়েছে। বাড়ি ফিরবার আগে ওষুধটা সে দিয়ে আসে সেই বুড়ী মেয়ে-মানুষকে। এসেই সোজা চলে যায় নিজের ঘরে। ঘরে ঢুকে কৌচের ওপর অবসন্ন দেহটাকে এলিয়ে দেয়···চুপচাপ শুয়ে থাকে···অপেক্ষা করে ডিনারের সময়ের।

১৭

ডিনারের একটু আগে লিজা এসে ঢুকল ইউজিনের ঘরে। দেখে স্বামী শুয়ে আছে চুপচাপ। স্থির, নিস্পন্দ দেহ। অন্যমনস্ক।

লিজা ভেবেই পায় না, ইউজিনের মনে কি এতো গভীর দুঃখ থাকতে পারে যার জন্যে দিনের পর দিন সে এমনি ধারা বদলে যাচ্ছে।

নিজে থেকেই এসে কথা পাড়ে লিজা, তোলে তার প্রসবের কথা।

"আমার মনে হচ্ছে তোমার বোধ হয় ইচ্ছে নেই যে আমি মস্কো যাই··· আগে তো কথাই ছিল যে মস্কোয় বড় বড় ডাক্তার—ঐখানেই প্রসব হবে। এখন দেখছি তোমার তেমন গা নেই···তাই ঠিক্ করেছি—"

"কি ?" ইউজিন এতক্ষণ বাদে সাড়া দেয়।

"মস্কো আমি যাবো না—মানে, যাবার আর দরকার নেই। যা হবার বাড়িতেই হবে।"

ইউজিন ঠিক বুঝে নেয় লিজার মনের কথা। আসলে লিজার মনে রীতিমত ভয় আছে প্রসব ব্যাপার সম্পর্কে। সেটা অবিশ্যি খুবই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, পাছে শিশু নিপুণ যত্ন এবং অভিজ্ঞ তত্ত্বাবধানের অভাবে যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান না হয়, সে সম্বন্ধেও লিজার উদ্বেগ আছে। খুঁতখুঁতনি বলাও চলে। তাই লিজা যখন বলে বসল সে মস্কোয় যাবে না, বাড়িতেই ছেলে হবে তখন তার মনের যে-দ্বন্দ্ব চলেছে, সেটার গুরুত্ব অনুমান করা ইউজিনের

তুমি নজর করেছ, মানে, বুঝতে পেরেছ। আমার তাই মনে হয়···তোমার কি মনে হয়, সেটা অবশ্য আমি ঠিক বলতে পারি না। তবে আমার মতে তোমার এখান থেকে কিছুদিনের জন্যে সরে যাওয়া উচিত অর্থাৎ তোমাদের দুজনের মনোভাব যে-রকম আড়ষ্ট দেখছি—পরস্পর খোলাখুলি কথাবার্তা বলা যখন অসম্ভব, তখন এ ভাবে ঝুল কাটাকাটি না করে তুমি দিন কয়েকের জন্যে অন্য কোথাও বরং ঘুরে এসো। অবিশ্যি—জমি-কারখানা এ সমস্ত ছেড়ে যাওয়া তোমার পক্ষে খুবই অসুবিধের ব্যাপার। চাষ-বাস আর চিনির ব্যবসা তুমি বেশ ভালো ভাবেই গোড়াপত্তন করেছো আর যত্ন নিয়ে বিলি-বন্দোবস্ত করে ব্যবসা গড়ে তুলেছো। এ সবের ভার অন্য কারুর ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে কোথাও যাওয়া যে কঠিন ব্যাপার—তাও বুঝছি। কিন্তু কি করতে চাও—তুমিই বলো! তাই তোমায় পরামর্শ দিচ্ছি—আর সকলেই বলবে, এটা সুপরামর্শ যে, তুমি বেরিয়ে পড়ো। আর···"

একটু থেমে, চিন্তা করে ইউজিনের মামা বললেন:

"যদি যাও, তো ক্রাইমিয়া ঘুরে এসো। চমৎকার জল-হাওয়া আর স্বাস্থ্যটাও এ সময়ে ভালো। ওখানে চমৎকার একটা পানাগার আছে—একবার যেয়ো সেখানে। দেখবে কি এলাহি ব্যাপার···আর পানীয় সম্বন্ধে শেষ কথা···মানে, মুখে বলে শেষ করা যায় না। যদি যাও তো আর দেরি কোরো না···ঠিক সময় হ'ল এই....সেরা আঙুরের মরশুম···"

"মামা!" চকিত এবং ত্রস্ত সুরে ইউজিন বলে ওঠে,—"মামা, একটা কথা বলতে চাই আপনাকে। গোপন কথা! অত্যন্ত গোপন···কাউকে না বলে চেপে রাখতে পারবেন?" কপালে হাত বুলিয়ে নেয় ইউজিন। আর্ত, পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে তার মুখ। একটু থেমে আবার বলে: "ভয়ানক লজ্জার কথা কিন্তু···আমার নিজের পক্ষে গভীর গ্লানিকর—কথাটা গোপন রাখতে পারবেন তো?"

ইউজিনের মুখে-চোখে যে উদ্বেগ আর আগ্রহের ব্যাকুলতা, তাতে মামাও রীতিমত হকচকিয়ে গেলেন।

তারপর একটু সামলে নিয়ে এক গাল হেসে বললেন গদগদ ভাবে, "কি যে বলো তার ঠিক নেই! আমার পেট থেকে কথা বেরোবে?"

"না, তাই বলছি—মামা। কিছু মনে করবেন না···এই ব্যাপারে আপনার কাছ থেকে আমি সাহায্য পেতে পারি। পেতে পারি নয়—সাহায্য ভিক্ষা করছি। আপনি আমায় এখনো বাঁচাতে পারেন···"

কথাগুলো বলে ফেলেই ইউজিনের মনে যেন তৃপ্তির আমেজ লাগে। মনোভাবটা তার এখন অদ্ভুত। যে মামাকে সে নিতান্তই অপদার্থ ভাবে, যার প্রতি কোনোদিনই সে শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতে পারে নি, মদ্যপায়ী অকর্মণ্য আর বক্তৃতাবাজ বলে যার সঙ্গ বিরক্তিকর বলেই এ যাবৎ ঠেকেছে ইউজিনের কাছে, তার সামনে নিজের ব্যক্তিগত জীবনের গোপন রহস্য ফাঁস করে দেওয়া, আত্মাবমাননায় নিজেকে হেয় প্রতিপন্ন করা—এমন একটা মানুষের চোখে নতিস্বীকার করার মধ্যে যে একটা বিশেষ ধরনের গ্লানি-মিশ্রিত আনন্দ আছে, সেই চিন্তাটাই এখন ইউজিনের মনে সাময়িক শান্তির প্রলেপ টেনে দেয়। আশ্চর্য!

ইউজিনের আত্মধিক্কার এতো প্রবল হয়ে উঠেছে যে না বললেই নয়। কিছু রেখে-ঢেকে সে বলবে না। দোষক্ষালনের বিন্দুমাত্র অপচেষ্টা না করে সে সম্পূর্ণরূপেই আত্মপ্রকাশ করবে মামার কাছে। কতোখানি অমার্জনীয় তার পাপ আর কতোখানি অপবিত্র তার সচেতন কামনা—সেটা উদ্ঘাটিত হয়ে যাক—খুলে যাক তার বাইরের ভদ্র মুখোশটা। কঠিন শাস্তির প্রয়োজন তার মনের—একেবারে নির্মম, ক্ষমাহীন···

মনের চাপা আনন্দে ফুলতে লাগলেন মামামশায়।

ইউজিনের পারিবারিক জীবনে যে একটা গভীর রহস্য আছে, তারই গন্ধে তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠল। তার ওপর সেই রহস্যটা যে রীতিমত গ্লানিকর—লজ্জার বস্তু, আর ইউজিন সে কথাটা জানাবার জন্যে তাকে ধরেছে, এখনি বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে,—অধিকন্তু অপরের ব্যক্তি-

গত সমস্যা নিয়ে তিনি যে একটু মোড়লী করবার সুযোগ পাবেন—এই চিন্তাতেই তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

বহু প্রত্যাশিত খবরটি শোনবার অধীর আগ্রহ কোনোমতে চেপে উদার এবং উদাস কণ্ঠে মামা বললেনঃ "কি যে বলো তুমি! তুমি তো জানো, ইউজিন, আমি তোমায় কতটা আপন বলে ভাবি···কতোখানি টান তোমার ওপর! মুখে অবিশ্যি কিছু···"

ইউজিন বাধা দিয়ে বলে ওঠেঃ "প্রথমেই বলে রাখি—আমাকে সকলে যা ভাবে, আমি তা নই। আসলে আমি কৃতঘ্ন, নরাধম। আমার মতন পাপিষ্ঠ খুব কমই আছে···"

"আঃ—ওসব বাজে কথা যেতে দাও! তুমি কি যেন বলতে চাইছিলে···?" মুখের ভাবে মনে হয়, তিনি যেন ভীষণ ব্যথিত হচ্ছেন···ইউজিনের আত্ম-নিন্দা যেন নিতান্তই অবান্তব। ওসব কথা শুনতে তাঁর ঘোর অরুচি।

"কি বলছেন—মামা আপনি? কৃতঘ্ন নবাধম নই আমি! তবে কে, বলুন? লিজার স্বামী আমি—লিজার মতন স্ত্রী, ক'জনের ভাগ্যে জোটে—জানেন আপনি?" বলতে বলতে ইউজিন উত্তেজিত হয়ে পড়ে, গলার আওয়াজ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে—"লিজার সঙ্গে যে মিশেছে, যে ওকে একবার চিনেছে, সে-ই জানে কতো মহৎ ওর অন্তঃকরণ—কতো পবিত্র তার মন। এতো উদার যার প্রেম, আমার মতন লোকের ওপর যার এতো প্রগাঢ় শ্রদ্ধা—তার স্বামী হয়ে আমি—হ্যাঁ আমিই—ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকের মতন একটা চাষীর ঘরের মেয়েমানুষের পেছনে ছুটছি—চাইছি তাকে লুব্ধদৃষ্টিতে···"

···"সে কি? এ তো আমার বিশ্বাসই হয় না···" মামা আর্তস্বরে বলেন। কণ্ঠে তাঁর অপার্থিব বিস্ময়। "কেন তুমি এ কাজ করতে চাও···? সত্যি, এ অসম্ভব কথা ইউজিন। মানে, তুমি কি বলতে চাও, তুমি সত্যিই লিজার প্রতি সাংঘাতিক অন্যায় করে ফেলেছো···?"

"হ্যাঁ, এক রকম তাই। কুৎসিত সম্পর্ক স্থাপনেব মতই অকথ্য পাপ করেছি আমি। শেষ ধাপে নেমে এসেছি—ঝাঁপ দিতেও প্রস্তুত। দিই নি

যে কেন, তা জানি না নিজেই। তবে যেটুকু বাকি আছে, তার জন্য কোনো কৃতিত্ব নেই আমার। মানে···আমার ওপর সেটুকু নির্ভর করে নি। স্থান-কালের অভাব-অসুবিধা বলেই হয়তো বাধা পেয়েছিলুম···অবস্থান্তরে ঘটে ওঠে নি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আমার দেহ-মন তো তৈরিই ছিল, এখনও তৈরি আছে—উন্মুখ হয়ে আছে সমস্তক্ষণ! কি যে হতে পারত···আর বারুদে আগুন লেগে গেলে কি সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ড বেধে যেত—তা বলতে পারি না···"

"আচ্ছা—আচ্ছা হয়েছে! এখন বলো তো আমায়, কি করে—"

"ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম: বিয়ের আগে একটা বোকামির কাজ করে ফেলেছিলুম। আমাদেরই এই গ্রামের একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক আমার হয়েছিল। মানে, কিছুদিনের জন্যে তার ওপর আমার ভারি নজর ও টান পড়েছিল। দু'জনে হামেশাই একত্র এসে মিলতুম—অবিশ্যি গোপনে—জঙ্গলে, নির্জন মাঠের মধ্যে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ চলত···"

মামার মুখ-চোখ এইবার বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগ্রহভরে তিনি প্রশ্ন করলেন: "আচ্ছা, মেয়েমানুষটি দেখতে-শুনতে কেমন? বেশ সুন্দর?"

ইউজিন আপন মনেই তার কাহিনী বলে যাচ্ছিল, অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে। হঠাৎ মামার এই লঘুচিত্ত, কৌতূহলী প্রশ্নে তার চমক ভাঙল। বিরক্তিতে তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল···

কিন্তু উপায় কি? নাচতে নেমে আর ঘোমটা দেওয়া চলে না। নিজে থেকেই ইউজিন আত্মপ্রকাশ করেছে। অপরের সাহায্য আর উপদেশ তার কাছে এখন এতই মূল্যবান, প্রয়োজনীয় যে বিরক্ত হলে চলবে না। নিজের কেলেঙ্কারি সবিস্তারে বলবার জন্যে প্রথমে কেউ তো তাকে সাধ্য-সাধনা করে নি! অতএব স্বাভাবিক বিরক্তিটুকু হজম করে নিতে হয় ইউজিনকে। ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবে হাত নেড়ে কথাটা যেন উড়িয়ে দিতে চায়। কৌশলে মামার প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে গিয়ে ইউজিন আবার তার কাহিনী শুরু করে:

"আমি অবিশ্যি এটাকে মোটেই গুরুতর ভাবে নিই নি। অর্থাৎ আমাদের

এই সম্পর্কটা যে নিতান্তই সাময়িক—মনে আমার এই ধারণাই ছিল। মাঝে-মিশেলে দু'জনের দেখা-শুনো হয়—একটা জৈব আকর্ষণে দু'জনে গোপনে মিলিত হই, এই পর্যন্ত। শীঘ্রই এই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেওয়া দরকার—সেটা বুঝতুম। বেশি দিন এটার জের চলা উচিত নয়, তা হলেই মুস্কিল। মনে মনে তাই আঁচ করে রেখেছিলুম, এটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যখন নয়—তখন স্ত্রীলোকটিকে বাবণ করে দিলেই হবে, আর যেন সে না আসে…"

একটু থেমে আবার ইউজিন বলতে শুরু করল :

"বিয়ের আগে সব ভেঙে দিয়েছিলুম নিজ হাতে—যাতে পরবর্তী জীবনে কোনো গণ্ডগোল বা জটিলতার সৃষ্টি না হয়…"

বলতে বলতে ইউজিন নিজেই চমকে ওঠে নিজের কণ্ঠস্বরে। কেমন ধীরে—কেমন সংযতভাবে এখন সে নিজের অবস্থা বর্ণনা করে যাচ্ছে। কি বকম আশ্চর্য লাগে, যেন আর কেউ বলে যাচ্ছে…

"তারপর…একদিন কেমন কবে জানি না…কেন যে আবাব ওকে দেখলুম! সে ঠিক বোঝাতে পারবো না আপনাকে…কি যে হয়ে গেল আমার…এক এক সময়ে মনে হয় সব ভোজবাজি…জাদুমন্ত্রের সম্মোহনী শক্তিতে বিশ্বাস হয়—মনে হয় 'অস্তিত্ব' বলে কোনো জিনিস নেই…আমার সমস্ত সত্তা দুর্বল, অসহায় হয়ে গলিত হয়ে গেল। দেখলুম তাকে…আর দেখবামাত্রই কোথা থেকে এক জঘন্য কামনার বিষকীট এসে বাসা বাঁধল আমার গোপন অন্তস্তলে। কায়েম হয়ে বসল সেখানে…নড়বার নাম নেই… ধীরে ধীরে কুরে কুরে খেতে লাগল আমাকে…এখনও সে খাচ্ছে…আর সে কি অসহ্য যন্ত্রণা, অশান্তি…আমি কিছুই করতে পারি না।

"এক এক সময়ে নিজেকে যাচ্ছে-তাই ভাষায় গালাগাল দিই…মনকে চোখ রাঙাই—এ কি হচ্ছে! কিছুতেই কিছু হয় না…মনে মনে বুঝতুম ঠিকই, কি সাংঘাতিক হচ্ছে আমার এই কদর্য আচরণ—মানে, যে পথে পা বাড়িয়ে আছি, যে কাজ করতে যাচ্ছি, তার পরিণতি কি ভয়াবহ রকমের কুৎসিত—সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণই সচেতন ছিলুম এবং আছিও। তবু, তবু

বারে-বারেই, ঘুরে-ফিরে লোলুপ আগ্রহে আমি সেই দিকেই ছুটে চলেছি। সামলাতে পারছি না নিজেকে এতো দিন যে তার বেশি কিছু হয় নি, আবার সেই কুৎসিত দেহ-সম্পর্কে লিপ্ত হই নি, সেটা নিতান্তই দৈবানুগ্রহ। যে-কোনো মুহূর্তেই আমি তলিয়ে যেতে পারতুম—যাই নি ঘটনা-চক্রে, ঈশ্বরের কৃপায়। এই কালই তো যাচ্ছিলুম তার কাছে। দুর্বার আকর্ষণে ছুটেছিলুম···একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যেত কাল্‌কে। হঠাৎ ফিরে এলুম—লিজা লোক দিয়ে আমায় ডেকে পাঠিয়েছিল···"

মামা অবাক হয়ে শুনছিলেন এতোক্ষণ। এইবার বললেন :

"কি আশ্চর্য এই বৃষ্টির মধ্যে? তুমুল বৃষ্টি আর দুর্যোগ মাথায় করে?"

"হ্যাঁ—দুর্যোগের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিলুম"—ক্লান্ত স্বরে বলে ইউজিন। "আর, এই মনের ঝড় সহ্য করবার মত আমার শক্তিও নেই···বড় পরিশ্রান্ত আমি, নিত্য-নিয়ত এই নিজের সঙ্গে নিজে যুদ্ধ চালিয়ে হয়রান হয়ে পড়েছি—মামা! তাই মন স্থির করেছিলুম—আপনার কাছে এসে অকপটে সমস্ত কথা স্বীকার করব, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। বলুন তো, মামা, কি করা যায় এখন···?"

"কি যে পরামর্শ তোমায় দিই তাই ভাবছি—" মামা সত্যিই এবারে গম্ভীর হয়ে কথা বলেন। "তবে এটা ঠিক—নিজের জমিদারীতে বসে এই রকম কোন ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়া শুধু অবাঞ্ছিত নয়, অন্যায়ও বলতে পার···সবাই জেনে ফেলবে···এসব কথা চাপাচুপি দিয়ে বন্ধ করা যায় না···ঠিক বেরিয়ে পড়বে। তখন? লিজার শরীর এখন যে কতো দুর্বল তা তুমি জান, আমিও দেখছি···ওকে কোন রকম আঘাত দেওয়া উচিত হবে না, ওকে বাঁচান দরকার! এতোখানি শক্‌ ও সহ্য করতে পারবে কি? তা হলে···কিন্তু আমি ভাবছি—নিজের জমিদারীতে গ্রামের মধ্যে এসব কেন? অন্য কোথাও···"

ইউজিনের কানে কে যেন গরম সীসে ঢেলে দেয়।

মামার কথা শুনেও শুনতে পায় নি এমন ভান করে ইউজিন। কথা এড়িয়ে যাবার জন্যে, তার যেটা প্রধান বক্তব্য ছিল সেইটেই আবার টেনে

আনে ঃ "হ্যাঁ, আমাকে বাঁচান আপনি—আমার হাত থেকেই আমাকে বাঁচান—এই ভিক্ষা চাইছি—নিজের কবলে নিজেই পড়ে গেছি—এখন কোনোমতে তা থেকে রেহাই পেলে বাঁচি। আর দেখুন···আজ না হয় উদ্ধার পেলুম এ সঙ্কট থেকে, অভাবিত ঘটনার ফেরে বাধা পড়ে গেল। কিন্তু··· কাল ? না হয় পরশু ? কিংবা অন্য কোনো সময়ে—যখন বাধা দেবার কেউ থাকবে না—যখন আকস্মিক একটা ঘটনা এসে আমার কামনার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না,—তখন ? তখন কি হবে ? আর তা ছাড়া ···স্ত্রীলোকটি তো সব জানতে পেরেছে···বুঝতে পেরেছে আমার মনের অবস্থা। দোহাই আপনার—আমাকে একলা ছেড়ে দেবেন না,—আমি মারা পড়ব। বাঁচান আমাকে, যে-কোনো উপায়ে হোক বাঁচান !"

ইউজিনের কণ্ঠস্বরে যে-কাতরতা ফুটে ওঠে, তাতে বিপদের আশঙ্কা সম্বন্ধে মামার মনে কোনো সন্দেহই থাকে না। জিজ্ঞাসা করেন ঃ

"আচ্ছা, সে হবে'খন। এখন কথার জবাব দাও দিকি—সতিই কি তুমি তাকে ভালোবাসো—এত ভালোবাসা যে, তাকে নইলে তোমার চলে না ?"

"মোটেই না" ইউজিন তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। "মোটেই তা নয়। আপনি যেভাবে দেখছেন, সেটা ভুল। ভালোবাসার কাঙাল হয়েছি বলে আমার এ দুরবস্থা হয় নি। হয়েছে অন্য কারণে। কোথা থেকে একটা অদৃশ্য শক্তি এসে আমাকে আঁকড়ে ধরেছে,—সে কি সাংঘাতিক মোহিনী শক্তি, তা বলতে পারি না। থেকে থেকে আমার টুঁটি টিপে ধরছে। তা থেকে আমার নিস্তার নেই। সে শক্তির বিরুদ্ধে আমি কম যুদ্ধ করি নি। কিন্তু আমি ক্লান্ত, পরাস্ত। হার মেনেছি তার কাছে। মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো মনের জোর আর আমার নেই। কি যে হয়েছে আমার, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। কে যেন আমার দেহ-মনের সমস্ত বল শোষণ করে নিয়েছে। আমি জীর্ণ, অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ে আছি। কেন আমার এমন হ'ল ! বলতে পারেন মামা ? কি করি এখন ? হয়তো ক্রমশ আবার সেই শক্তি আমি ফিরে পাব,—তখন রাহু-মুক্ত হয়ে এমন দুর্বল,

অসহায় আর থাকব না—ওসব ঝেড়ে ফেলতে পারব—কি বলেন আপনি ? আপনার কি মনে হয়—পারব না ?”

মামা বললেন : “যা বলছিলুম তোমায়, তাই কর। চলো, এক সঙ্গে ক্রাইমিয়া ঘুরে আসা যাক। তোমার মন ভালো হবে, স্বাস্থ্যও ফিরবে …কি বল ?”

“রাজি আছি। আমি তো চলে যেতেই চাই…তবে আর দেরি নয়। আপনি সঙ্গে থাকবেন—ভালোই হ'ল। কথায়-বার্তায় অন্যমনস্ক থাকব …অন্য চিন্তার অবকাশ থাকবে না…”

১৮

মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আর অশান্তি প্রতি মুহূর্তে ইউজিনকে অতিষ্ঠ করে তুলছিল, তার জীবনকে বিষাক্ত করে দিচ্ছিল, তা থেকে কিছুটা যেন মুক্তি পেল সে এইবার। খানিকটা সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে চলাফেরা করবার মতন মনের ধৈর্য আবার ফিরে এল।

ধীরস্থির ভাবে আবার যে ইউজিন কাজ-কর্ম করবার সামর্থ্য খুঁজে পেল—তার প্রধান কারণ হ'ল, মনের কথা খোলসা করে আরেকজন মানুষের কাছে সে বলতে পেরেছে। মনের মধ্যে একটি বিষকীট গোপনে পালন করার যে-নিদারুণ অস্বস্তি আর যন্ত্রণা, তা ইউজিন ভালোভাবেই ভোগ করেছে। সে কথা কাউকে বলবার নয়, অথচ ঝেড়ে ফেলার নয়—দিনের পর দিন, যে দুশ্চিন্তার বিষে দেহের প্রতিটি কোষ জর্জর হয়ে ওঠে, সে কথাটা যদি ভরসা করে, মনের সাহস ও শক্তি সঞ্চয় করে দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে বলে ফেলা যায়, মন তখন খানিকটা আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পায় বৈ কি ! মামার সঙ্গে মন খুলে কথাবার্তা কওয়ার ফলে ইউজিনের শরীরটাও যেন ঝরঝরে হয়ে ওঠে। শুধু কথা বলার জন্যে বা গ্লানিকর গোপন রহস্য-উদ্‌ঘাটনের জন্যে যে এই স্বচ্ছন্দ ভাবটা আসছে, ঠিক তা নয়। ভীষণ দুর্যোগ উপেক্ষা করে ইউজিন যখন স্টীপানিডার পিছু ধাওয়া

করেছিল, যে দিন 'হয় এস্‌পার, নয় ওস্‌পার' ভেবে সে শেষ ধাপে নেমে এসেছিল ঝাঁপ দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে—সেই দিনের পর থেকে মনের মধ্যে অহরহ যে বিবেকের দংশন চলছিল, চলছিল ক্রমাগত আত্মধিক্কারের পালা, সেই অপরিসীম গ্লানি আর লজ্জাবোধ তার উত্তপ্ত মস্তিষ্ককে অনেকখানি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে। কঠিন উপবাস পালনের পর বিহিত প্রায়শ্চিত্তের পর চিত্তে নামে যে সংযমশুদ্ধ অবসন্ন প্রশান্তি, এ যেন অনেকটা তাই।

ঠিক হ'ল যে, ইউজিন আর তারা মামা—দু'জনে ইয়াল্‌টা যাত্রা করবেন, হপ্তাখানেকের মধ্যে।

যাবাব আগে অনেক হাঙ্গামা। যাব বললেই চট্‌ কবে বেরিয়ে পড়া যায় না—যদি থাকে পিছুটান: জমিজমা, কাবখানা, ব্যবসা, বাড়ি-ঘর তদারকের জন্যে ব্যবস্থাব প্রয়োজন। ইউজিন কিছুদিনের জন্যে অনুপস্থিত থাকবে। তার অবর্তমানে যা-কিছু কবণীয—যা-কিছু দবকাব হতে পারে, তার সমস্ত বন্দোবস্তই করতে হ'ল ইউজিনকে। বিদেশে যেতে হলে টাকা তোলা দবকাব। ইউজিনকে যেতে হ'ল শহবে। তাবপব বিষয়-আশয়ের ব্যাপার, ঝামেলা অনেক। তাব যথারীতি তত্ত্বাবধানেব জন্যে বাড়িতে আব কাছারীতেও সবিশেষ নির্দেশ দিতে হ'ল বার বার।

সময়টা কাটল মন্দ নয়। সাংসাবিক কাজে, বৈষয়িক পরামর্শে আর আত্মবক্ষাব জন্য বিদেশ-যাত্রার বন্দোবস্তে দিনগুলো কেটে গেল তাডাতাড়ি। আবার—অনেক, অনেক দিন পরে ইউজিন তার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আর স্ফূর্তি ফিরে পেল। স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার হ'ল হৃদ্য এবং আন্তরিক। লিজার সঙ্গে কথাবার্তায় আর সেই বিরক্তিকর অসহিষ্ণুতা কিংবা অকারণ উত্তেজনা হয় না। নৈতিক শৈথিল্যটুকু কেটে গিয়ে মনে আসে নবজাগরণের জোয়ার···তার মৃদু কলোচ্ছ্বাস শুনতে পায় ইউজিন···হৃদয়-মন স্নিগ্ধ, আর্দ্র হয়ে ওঠে নতুন আশায়, আত্মবিশ্বাসে··· ।

তাই সেই বৃষ্টির পর থেকে স্টীপানিডার সঙ্গে ইউজিন আর একবারও সাক্ষাৎ করল না। সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়ল সফরে, চলে গেল ক্রিমিয়ায়।

সেখানে ছু'মাস কাটাল ইউজিন। লিজার সংসর্গে, আনন্দে আর স্বস্তিতে এই ছুটি মাস যেন মধু-যামিনী…লঘুপক্ষ দিনগুলো কোথা দিয়ে কেমন করে উড়ে যায়, ইউজিন ঠাহর পায় না। অনির্বেদ, গ্লানিশূন্য মনে সে চারদিকে তাকায়, দেখে কত নতুন জিনিস, নতুন মানুষ, নতুন দৃশ্য! বাইরের অপরিচিত দৃশ্য-জগৎ মনে তার অজস্র রঙ আর নতুন ছাপ ফেলে যায়। মুছে দেয় পুরাতন গ্লানি আর দুশ্চিন্তা। আকাশ-বাতাসের স্বাস্থ্যকর সবল মার্জনায় দেহ-মন শুদ্ধ স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। মনের ভিতরটা পর্যন্ত এমন পরিষ্কার, ঝকঝকে হয়ে ওঠে যে, ইউজিনের মনে হয়, সাম্প্রতিক অতীতের বিভীষিকা, বিষ-স্মৃতি সব ধুয়ে-মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই সেদিনের দুশ্চিন্তা, মানসিক যন্ত্রণা যেন বহুযুগ-বিস্মৃত ঘটনা, বুঝি আর কারুর জীবনে ঘটেছিল। ইউজিন এখন যেন স্বতন্ত্র মানুষ, আত্মস্থ…নিরাসক্ত।

ক্রিমিয়াতে ওদের অনেকের সঙ্গে দেখা হ'ল। যারা পুরানো আলাপী, তাদের সঙ্গে পরিচয়টা আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়া গেল। জমে উঠল ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। আবার অনেকের সঙ্গে নতুন চেনাশুনা হ'ল। এই সব চেনা-পরিচয়ের ফলে, নতুন আর পুরানো বন্ধুদের নিয়ে লিজার ও ইউজিনের প্রবাস-জীবনের দিনগুলো কাটতে লাগল বেশ আরামে আর আনন্দে। জীবনটা যেন একটানা ছুটি—কোনো দায়িত্ব নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। কৈফিয়ত দেবার মতন কেউ নেই, নিজের মনের কাছে হুমকি খাওয়ার ভয় নেই। তা' ছাড়া প্রবাসে এসে ইউজিন অনেক কিছু দেখল আর শিখল।

ক্রিমিয়াতে থাকতে ইউজিনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাদেরই অঞ্চলের একজন বিখ্যাত পদস্থ কর্মচারীর। অভিজাত, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক—তাঁর পদবী হ'ল 'মার্শাল অব দি নোবিলিটি'। তাঁর সঙ্গে ইউজিনের সদ্ভাব অল্প দিনের মধ্যেই জমে উঠল। খাসা মানুষটি। বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত। উদার-নৈতিক মত আর মনের প্রসার আছে বলেই ইউজিন তাঁকে হৃদ্যতার সঙ্গে

গ্রহণ করল। ভদ্রলোক নিজেও বেশ অমায়িক। আভিজাত্য এবং উচ্চ পদের দম্ভ তাঁকে একটি কঠিন, সরকারী বস্তুপিণ্ডে পরিণত করতে পারে নি। ইউজিনের সঙ্গে আলাপ হওয়া মাত্রই তিনি বুঝেছিলেন—এই রকম লোকই কাজের হয়। কর্মনিষ্ঠ, দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান—এই রকম মানুষই তিনি পছন্দ করেন তাঁর পার্টির কাজের জন্যে। তাই তিনিও উৎসাহভরে ইউজিনকে কাছে টানলেন, তালিম দিতে লাগলেন তাকে পার্টিতে ঢোকাবার জন্যে। ইউজিনের সামনেও একটা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশা পরিস্ফুট হয়ে দাঁড়াল। এমন একজন রাজপুরুষ—রাজনীতির ক্ষেত্রে যাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অনেকখানি—তাঁর শিক্ষায়, সহৃদয়তায় এবং আনুকূল্যে ইউজিনও হয়তো পলিটিক্সক্ষেত্রে প্রবেশ করে নিজের আসন তৈরি করে নিতে পারবে।

আগস্ট মাসের শেষাশেষি লিজার একটি কন্যা-সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল।

চমৎকার ফুটফুটে, সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান শিশু। মনের মধ্যে যে-বিপদ আর ভয়ের আশঙ্কা ছিল—তার কিছুই হ'ল না সৌভাগ্যক্রমে। গতবারে, প্রথম সন্তানটি গর্ভাবস্থায় নষ্ট হয়ে যাবার ফলে, সবাই যেমন এবারে সন্ত্রস্ত হয়েছিল, ডাক্তারী পরামর্শ আর সযত্ন পরিচর্যায় লিজাকে যেমন করে ঘিরে রাখা হয়েছিল, তার তুলনায় অত্যন্ত সুখ-প্রসব বলতে হবে বই কি। প্রসবের সময়ে লিজার বিশেষ কোনো কষ্ট হয় নি। ইউজিনকেও তেমন কিছু ঝামেলা পোহাতে হয় নি। সহজ, সুস্থ এবং স্বাভাবিক ভাবেই এল লিজার মাতৃত্ব।

সেপ্টেম্বর মাসে ওরা সবাই দেশে ফিরল। চারজনই একসঙ্গে। লিজা, ইউজিন, সদ্যোজাত শিশু-কন্যা আর ধাত্রী। ধাত্রীর প্রয়োজন হয়েছিল নবজাত শিশুকে স্তন্যদানের জন্যে। লিজার বুকে দুধ হ'ল না তেমন। তাই বাচ্ছাটিকে লালন-পালন করবার জন্যে ধাত্রী নিযুক্ত করতে হ'ল।

ইউজিন বাড়ি ফিরল—একেবারে নতুন, স্বতন্ত্র মানুষ হয়ে। মনে তার সুখ ও স্ফূর্তি। অনভ্যস্ত পিতৃত্বের নতুন উত্তেজনা আর ভবিষ্যতের জীবন-

কল্পনায় একটা সচেতন, আশান্বিত মনোভাব—এ দুয়ের মাঝখানে তার পুরানো জীবনের যত কিছু দুর্ভাবনা, মালিন্য অপসারিত হয়ে গেল। তন্দ্রাশেষে দারুণতম দুঃস্বপ্নের বিভীষিকা যেমন মন হাল্কা ভাবে নেয়, ভয়কে জয় করে জাগ্রত সত্তার বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশে—ইউজিনও তেমনি ভুলে যায় অতীত জীবনের ভয়াবহ গ্লানি। মোহমুক্ত দেহ-মন নবীন চেতনার আশ্বাসে, বর্তমান পরিবর্তনের অকাট্য প্রমাণে উল্লসিত উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। ছায়াগ্রাহী, প্রলাপসঞ্চারী, বিকৃত মনের দ্বন্দ্ব-নির্যাতন অন্তিম যবনিকায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। নবজীবনের পাদপীঠে স্পন্দিত হতে থাকে সুস্থ প্রশান্তির আলোকছন্দ।

লিজার দুর্বল, কৃশকায় মূর্তি ইউজিনের মনে অজস্র প্রীতি-করুণার সঞ্চার করে।

সন্তান-সম্ভাবিতা স্ত্রী প্রসবকালীন যে-গুরু বেদনা সহ্য করে নীরবে, পত্নী-বৎসল স্বামী তার অনেকখানি অংশ গ্রহণ করে, মনে-মনে সে যাতনা ভোগ করে আর হৃদয় পূর্ণ হয়ে ওঠে সমবেদনায়, নূতন ধরনের ভালোবাসায়। লিজার মুখে যে-পাণ্ডুর ক্লান্তির স্পর্শ রয়েছে এখনো, ইউজিন সেটা লক্ষ করে আর তার সমস্ত অন্তর অসীম স্নেহরসে সিঞ্চিত হয়ে ওঠে।

শিশুটির ওপর ইউজিনের অবিশ্যি এখনও তেমন মমত্ববোধ জন্মায় নি, জন্মাবার কথাও নয়। তবে তাকে কোলে নিয়ে ইউজিনের কেমন যেন একটা নতুন ভাব আসে মনে—বেশ একটা প্রীতিকর কৌতুকের আমেজ। ক্ষুদে-ক্ষুদে হাত-পা মেলে বাচ্ছা যখন কোলে শুয়ে নড়া-চড়া করে, তখন ভারি মজা আর স্ফূর্তি লাগে—অনেকটা সুড়সুড়ি লাগার মতন। মনে হয় —কী অদ্ভুত!

জমিদারী আর বিষয়-আশয় ছাড়া নতুন আর একটা আকর্ষণ এল ইউজিনের জীবনে। ক্রিমিয়াতে থাকতে প্রাদেশিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দুম্‌শিনের সঙ্গে আলাপ হওয়ার ফলে ইউজিনের মনে একটা নতুন আশা ও উদ্যম সঞ্চারিত হ'ল। প্রবাসে মার্শালের সংস্রবে এসে, তাঁর কাছে

কিছুটা তালিম নিয়ে ইউজিনের ধারণা জন্মালো যে, পাদরী ও জমিদারদের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত, প্রাদেশিক সদস্য-সভা জেম্‌স্তভোতে তার প্রবেশ করা উচিত।

এর মূলে ছিল—কিছুটা কর্তব্য-প্রীতি ও সামাজিক দায়িত্ববোধ আর কিছুটা উচ্চাশা—ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। মার্শালের সঙ্গে কথাবার্তা, পরামর্শ করে স্থির হয়েছিল যে, ইউজিন 'জেম্‌স্তভো'র আসনপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে, অক্টোবর মাসে সেই প্রাদেশিক সভার বিশিষ্ট অধিবেশনে তাকে সদস্য-পদে নির্বাচিত করা হবে।

তাই দেশে ফিরেই ইউজিন তোড়জোড় শুরু করল। প্রথমে একদিন গেল শহরে; তারপর আর একদিন গেল তুম্‌শিনের সঙ্গে দেখা করতে। মাঝে মাত্র মাসখানেক সময়। ইতিমধ্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা করতে হবে ইউজিনকে। নির্বাচনের পূর্বে তাকে সমাজে আর একটু মিশতে হবে, শহরে এসে স্থানীয় সদস্যদের সঙ্গে মেলামেশা করতে হবে। তুম্‌শিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তো রাখতে হবেই—তিনিই যখন ইউজিনের মুরুব্বি।

কিছুকাল পূর্বেও যে-দুর্দম প্রলোভন তাকে কবলিত করেছিল, তার কথা ভুলে গেছে ইউজিন। বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শ্বাসরোধকারী বিভীষিকা—মনের ওপর অসীম নির্যাতন, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অনুশোচনা—এ সমস্ত কথা যেন ভাবতেই ভুলে গেছে ইউজিন। যেন তারা বহুদিনের ধূসর স্মৃতি—কষ্ট করে স্মরণ করতে হয়। যেন কিছুদিনের জন্যে সে পাগল হয়ে গিয়েছিল সাংঘাতিক ভাবে। অতি কষ্টে পার হয়ে এসেছে সেই ভীতিকর উন্মাদনা। দেহ-মনের ক্ষতচিহ্নগুলো মিলিয়ে এসেছে। সাময়িক উন্মত্ততার অপ্রীতিকর স্মৃতি অস্পষ্ট, লুপ্তপ্রায়…।

ইউজিনের মনে হয়—এতোদিনে সে পুরোপুরি রাহু-মুক্ত হতে পেরেছে। অন্তত সে তাই ভাবে। বিগত জীবনের সেই খণ্ড-প্রলয়-যুগকে এখন সে বেশ উদাসীন, নির্বিকারভাবে দেখতে পারে।

তাই ইউজিন যেদিন প্রথম সরকার মশায়ের সঙ্গে একলা কথা বলবার

সুযোগ পেল, সেদিন তার খোঁজখবর করতে মন একটুও কাঁপল না। এই প্রসঙ্গ আগে একবার ইউজিন আলোচনা করেছিল ভ্যাসিলি নিকোলাইচের সঙ্গে। তাই এখন সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে গিয়ে তার কোনও লজ্জা-সঙ্কোচ হ'ল না। বেশ সহজ, স্বাভাবিক কণ্ঠেই ইউজিন প্রশ্ন করল: "তারপর···কি খবর? সিদর্ পেশনিকভ কি এখনো গ্রামে ফেরে নি··· বাইরে-বাইরেই থাকে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—সে তো শহরেই রয়েছে···"

"আর তার বৌ···?"

"তার কথা আর বলবেন না, হুজুর···" ভ্যাসিলি মুখখানা বিকৃত করে মনিবের প্রশ্নের জবাব দেয়। "জঘন্য স্ত্রীলোক ··ভারি নীচ প্রবৃত্তি ওর। এখন ঐ চাষী ছোঁড়াটা, জিনোভিব সঙ্গে চালাচ্ছে···একেবারেই জাহান্নমে গেছে হুজুর।"

"হুঁ"। তা হলে তো ঠিকই হয়েছে।" ইউজিন ভাবে। মনে-মনে নিজের তারিফ করে আর বলে: "কী আশ্চর্য! এখন ওর কথায় মনে আমার লেশমাত্র দাগই পড়ে না। কি করছে কেমন আছে—এল কি গেল, কিছুতেই কিছু এসে যায় না···বিন্দুমাত্র কৌতূহলও হয় না আমার···সত্যি, কেমন আশ্চর্য বদলে গেছি।"

১৯

ইউজিন যা-যা চেয়েছিল, সবই সে পেয়েছে।

তার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। দেনার দায় থেকে বাঁচিয়ে তালুকটা এখন তারই। সম্পত্তি সে রক্ষা করতে পেরেছে।

আর অন্যান্য বিষয়-আশয়ে···? সব দিকেই তার সুরাহা। যে-কারখানা বসিয়েছে, সেটা তো ভালোমতেই চলছে। বিট-এর ফসল এবার উঠছে প্রচুর। চালু কারখানা আর অজস্র ফসল···এতে মোটা রকমের মুনাফা না হয়ে যায় না। বাৎসরিক আয়ের অঙ্কটা, ইউজিন মনে মনে হিসেব করে দেখে, এবারে যথেষ্টই দাঁড়াবে।

তারপর···সন্তান লাভ হয়েছে তার অদৃষ্টে। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে নির্বিঘ্নে। প্রসবের সময় কোন কষ্ট পেতে হয় নি লিজাকে, সেটাও কম কথা নয়। মনের মধ্যে যা আতঙ্ক ছিল ইউজিনের···! শাশুড়ী ঠাকরুণ চলে গেছেন নিজের বাড়ি, কোন উৎপাত নেই আর। আর সবচেয়ে বড় কথা—ইউজিন জেম্‌স্তভো-সভায় নির্বাচিত হয়েছে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। সকলেই তার তরফে ভোট দিয়েছেন। নতুন জীবনের নিশ্চিত আরামে কৃতিত্বের আস্বাদে ইউজিনেব দিনগুলি নিটোল হয়ে ওঠে। রুচিকর, অর্থময় জীবন···সেখানে আশা ও উত্তমে অনেকখানি অতীতের বিভীষিকা অপসৃত হযে গেছে, কোথাও কোন ছায়া ঘনীভূত হয়ে ওঠে না। নিজের ওপর আবার আস্থা ফিরে আসে, আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয় জাগে ইউজিনের মনে···।

নির্বাচনের পর্ব চুকে গেছে। ইউজিন বাড়ি ফিরছিল শহর থেকে।

প্রাদেশিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হওয়ায় বহু লোকই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাই শহরেব বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়ি গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানানো প্রয়োজন। ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পালা শেষ করতে গিয়ে ইউজিন এক জায়গায় ডিনার খেয়েছে আর উপর্যুপবি পাঁচ গ্ল্যাস শ্যাম্পেন গলাধঃকরণ কবেছে।

গাড়ি হাঁকিয়ে ঘরে ফিরছিল ইউজিন। মনটা বেশ প্রফুল্ল, দিলদরিয়া ভাব। উদার তৃপ্তির প্রসন্ন মুহূর্তে সব কিছুই তার ভালো লাগছে এখন। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা মনে উদয় হচ্ছে। চিত্তপটে রঙীন ইন্দ্রধনু। রাশ আল্‌গা করে, ঠেসান দিয়ে বসে ইউজিন উপভোগ করে ঝিরঝিরে পাতলা নেশাটুকু। চোখের পাতায় নামে বর্ণাঢ্য বিলাসিতার আমেজ।

এ যেন দেশোয়ালী গ্রীষ্ম নয়, প্রাচ্য দেশের উত্তাপ। চমৎকার রাস্তা। প্রশস্ত ফিতের মতন সামনে ছড়িয়ে যাচ্ছে, গাড়ি চলেছে গড়গড়িয়ে। সূর্যের তাপ এইবার প্রখর হয়ে উঠল। রাস্তার ধুলো খরদাহে তপ্ত, চিক্কণ।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে ইউজিন।

ভাবছিল নিজের কথাই—অদূর ভবিষ্যতের কথা। নির্বাচন আর ভোট কুড়োবার পালা তো শেষ হয়েছে। এখন সে 'জেমৃস্তভো'র সদস্য। সে অঞ্চলের মনোনীত প্রতিভূ। এরপর কাজ কি···? দেশের দশজনের সামনে যে-উঁচু আসন, সাধারণ্যে যে-প্রতিষ্ঠা·ছিল তার কাম্য স্বপ্ন, সেটা তো এখন সফল হতে চলেছে। এইবার শুরু হবে কাজ—সত্যিকারের কাজ। দেশের ও দশের সেবা।

কি ভাবে সে আত্মনিয়োগ করবে দেশের ও সমাজকৃত্যে, সেই কথাই চিন্তা করে ইউজিন বার বার। সমাজের কাজে সে নিজেকে লাগাতে পারে, মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারে উৎপাদনের সাহায্যে—যার ফলে অনেক লোক কাজ পাবে, পাবে অন্নসংস্থান। তাতে করে ইউজিনের খাতির বাড়বে, স্থানীয় মানপ্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

যদি দিনকাল এমনি ধারা থাকে, তা হলে অদূর ভবিষ্যতে ছকমাফিক জীবনযাত্রা নির্দিষ্ট পথে এগুতে থাকবে। কল্পনায় অনুমান করে নেয় ইউজিন—আর বছর তিন-চার বাদে তার নিজের ও এই অঞ্চলের কৃষক-শ্রমিকের দল তাকে কী চোখে দেখবে। কি রকম সম্ভ্রম-ভরা দৃষ্টিতে প্রত্যাশায় ইউজিনের দিকে তাকাবে। যেমন ঐ বুড়ো লোকটি···

ইউজিনের গাড়ি গ্রামের মাঝ-রাস্তা ধরে বাড়ির দিকে চলেছে। ঠিক সেই সময়ে একজন বৃদ্ধ চাষী আর একজন স্ত্রীলোক, দুজনে মিলে একটা মস্ত বড় জলের টব হাত-ধরাধরি করে রাস্তা পার হচ্ছিল। লাগামটা একটু টেনে ধরল ইউজিন। ওরাও পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল রাস্তার ধারে।

পথ দেবার জন্যে ওরা যখন কাত হয়ে দাঁড়াল গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে, আড়চোখে একবার দেখে নিল ইউজিন। এ যে চেনা মুখ! বৃদ্ধ পেশ্-নিকভ আর তার পুত্রবধূ স্টীপানিডা—দেখামাত্রই চিনতে পারে ইউজিন। কিন্তু কি আশ্চর্য—দেখে একটুও আলোড়ন জাগল না মনে। স্টীপানিডার সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় হ'ল। তবুও তটুকু চাঞ্চল্য অনুভব হ'ল না। কথাটা ভেবে তৃপ্ত, আশ্বস্ত বোধ করে ইউজিন। বেশ শান্ত, স্থিরভাবেই তো তার

দিকে চাইতে পেরেছে। চেহারা তেমনি সুশ্রী আছে···দেহের বাঁধন একটুও শিথিল হয় নি। কিন্তু তাতে ইউজিনের কিছু এসে যায় না···স্টীপানিডার অটুট রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে সে সম্পূর্ণই নির্বিকার। কোন কিছুই আর ইউজিনকে স্পর্শ করতে পারে না।

বাড়ির খিলান-দেওয়া ফটক পেড়িয়ে প্রাঙ্গণে গাড়ি-বারান্দার কাছে এসে গাড়ি থামল।

মামা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। বললেনঃ

"কি খবর? কেল্লা ফতে···? অভিনন্দন জানাবো নাকি?"

"হ্যাঁ···খবর ভালোই," ইউজিন জবাব দিল। "নির্বাচিত হয়েছি, মামা···"

"বাঃ—কি চমৎকার। এতো আনন্দ হচ্ছে আমার·· এই সুখবর শুনে। আগে থেকে জানতুম অবিশ্যি—তোমার জয় হবেই। তবু তোমার স্বাস্থ্য-পান করা দরকার—মানে, এখুনি ··এমন একটা সৌভাগ্য-সংবাদে একটা বিশেষ ধরনের উৎসব প্রয়োজন···কিছু পানীয়···"

উত্তেজিত হয়ে পড়ে মামামশায় কথার খেই হারিয়ে ফেলেন।

মাঝে দিনকয়েক ইলেকশ্যন নিয়ে ইউজিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিল। ক্ষেত-খামারের কাজে মনোযোগ দেবার মত সময় ছিল না।

এখন ও পর্ব চুকে গিয়েছে। কৃতকার্য ইউজিন এবারে জমি-জমার তদারক শুরু করে। বকেয়া কাজের ফ্যাসাদ অনেক। আর অনর্থক দেরি বা অবহেলা করা উচিত নয়।

একটু দুরেই কাজ হচ্ছে। বারদিকে ঐ গোলাবাড়িতে একটা নতুন ফসল-ঝাড়াইয়ের কল বসানো হয়েছে। কাজ চলছে পুরোদমে।

মজুরেরা খাটছে কেমন, দেখবার জন্য একটু করে এগিয়ে যায় ইউজিন ···কাজ তদারক করতে করতে এক সময়ে মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ে। এদিকটায় স্ত্রীলোকের দল···ইউজিন তাদের দেখেও দেখে না। চেষ্টা করে যেন চোখাচোখি না হয়ে যায়···।

তবু যত চেষ্টাই করুক ইউজিন, চোখ চলে যায় বারে বারে একই জায়গায়। ঘুরে-ফিরে তার শ্যেন দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয় একটি সুডৌল মুখের ছাঁদে। রাশীকৃত খড় অনায়াসে দু'হাতে তুলে নিয়ে ওদিকে সরিয়ে রাখছে। আর শুকনো খড়ের আঁটিগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে ঘোর লাল রঙের রেশমী রুমাল। আয়ত পাতার নীচে ঘন কালো চোখ। ইউজিনের বেত্রাহত শরীর আবার যেন টনটনিয়ে ওঠে···

দু'একবার দেখে নেয় ইউজিন আড়চোখে। অপাঙ্গ দৃষ্টিতে কেমন যেন সব ঝাপসা ঠেকে। ইউজিন বুঝতে পারে তাব শরীরে আর মনে কি একটা ঘটছে···কিন্তু কেন আর কিসের প্রক্রিয়া চলছে, সেটা ঠিক ধরতে পারে না। নিজের বোধশক্তি নিজেরই কাছে ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে আসে।

পরের দিন ইউজিন আবার গেল মাঠে। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে গেল গোলাঘরের দিকে। আজও ফসল ঝাড়াই হচ্ছে···এমন কিছু তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন ছিল না, তবু ইউজিন ছুতোয়-নাতায় ঘণ্টা দুয়েক সময় কাটাল সেখানে। একেবারেই অনর্থক···আর সেই দুটি ঘণ্টার মধ্যে অধিকাংশ সময় নিযুক্ত হ'ল তীক্ষ্ণ দৃষ্টির নিপুণ ব্যবহারে।

ইউজিন যখন দেখল, একটি মুহূর্তের জন্যেও সে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না—স্টীপানিডা যখনি আসছে চোখের সামনে, তার আত্মার সমুহ ক্ষুধা একটি তির্যক রেখায় গিয়ে নিবদ্ধ হচ্ছে স্টীপানিডার মুখপানে, তার লোলুপ দৃষ্টি যেন আদর বুলিয়ে দিচ্ছে সারা গায়ে, যেন লেহন করে নিচ্ছে স্টীপানিডার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গীর সুপরিচিত মাধুরী, সুঠাম দেহশ্রীর উন্মাদক লাবণ্য, তখন ইউজিন বুঝল, সে গেছে—জন্মের মতই গেছে।

তার উদ্ধারের আর কোন আশাই নেই···আবার ঘনিয়ে উঠবে সেই দারুণ বিভীষিকার কৃষ্ণ মেঘ। জাগবে ঝড়, দুলবে মন ভ্রূ-কুটিল দ্বিধায়, সন্দেহ-দোলায়। হৃদয় বানচাল হয়ে ভেসে যাবে, মাথা কুটে মরবে অস্থির উন্মাদনায়। আবার শুরু হবে এই শ্বাসরোধ-করা ভয় আর উত্তেজনা, প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের দুঃসহ আত্মধিক্কার—মানসিক যন্ত্রণা আর বিক্ষোভ। এই

দুরন্ত কামনা আর নিরন্তর গ্লানি—এদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই ইউজিনের।

যা ভয় করেছিল ইউজিন, হ'লও তা-ই।

এমনি দুরদৃষ্ট তার, প্রত্যাশিত বিপদ যেন আগ বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ইউজিন এসে দাঁড়াল স্টীপানিডার কুটীরের পিছন দিককার পোড়ো জমিটার ধারে। আশ্চর্য! কেমন করে সে যে পৌঁছুল গিয়ে ঠিক জায়গাটিতে, সে নিজেই জানে না। যেন আর কারুর পা, মন্ত্রবশে চালিত হয়েছে। নিয়তির অভ্রান্ত নির্দেশে বিভ্রান্ত ইউজিন দাঁড়াল এসে স্টীপানিডার কুটীরের পিছনে। পোড়ো জমিটার একপাশে শুকনো ঘাস রাখার সেই পুরানো কুঁড়ে ঘরটা দেখা যাচ্ছে সন্ধ্যার আবছায়ায়। এখানেই শরতের এক মধুর অপরাহ্নে তাবা একদিন মিলিত হয়েছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে ছবিটা···কোমল, করুণ বিকালের অপরূপ আলোয় ভরে গেছে আকাশ। একটু একটু কবে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সব মনে পড়ে ইউজিনের, আর মর্মব স্তম্ভের মতন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কিসের প্রত্যাশায়!

হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিবে পায় ইউজিন।

সন্ধ্যার অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসে। ইউজিন এদিক ওদিক একটু পায়চারী করবার ভান করে। তারপর থমকে দাঁড়িয়ে একটা সিগ্‌রেট ধরায়।

সিগ্‌রেট ধরাবার সময় দেশলাইয়ের আলোয় ইউজিনের মুখখানা দেখা যায় কিছুক্ষণের জন্যে।

প্রতিবেশিনী এক কৃষক রমণী দেখতে পায় ইউজিনকে। দেখেই চিনে ফেলে। ইউজিনও তাড়াতাড়ি সন্ত্রস্ত হয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়। কানে আসে ঐ বমণীটির কণ্ঠস্বর, পাশেই আরেকজন কাকে যেন বলছে ঃ

"যা না,—বাবু তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন। কতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছেন···আ মব্, রকম দেখো মেয়ের! আমি মিছে কথা বলছি নাকি? বিশ্বাস না হয়, ঐদিক পানে চেয়ে ছাখ্। দাঁড়িযে আছেন এখনও—যা এইবেলা!"

দূর থেকে দেখতে পেল ইউজিন, একজন স্ত্রীলোক—হ্যাঁ স্টীপানিডাই বটে—ঝাঁ করে বেরিয়ে এল। ছুটে গেল ছাউনি ঘরটার দিকে··· ।

ইউজিনও পা বাড়াল। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে দেখা হয়ে গেল এক চাষীর সঙ্গে··· ।

আর এখন যাওয়া চলে না। আরেকজনের চোখের সামনে দিয়ে যাওয়া সত্যিই অসম্ভব···অগত্যা বাড়ি-মুখো ফিরতে হ'ল ইউজিনকে।

বাড়ি ফিরে এসে ড্রয়িং রুমে ঢুকল ইউজিন।

কিন্তু কি আশ্চর্য! ঘরে ঢুকে তার মনে হ'ল, কেমন যেন থমথমে ভাব। সব কিছু তার কাছে অদ্ভুত, অস্বাভাবিক ঠেক্‌তে লাগল···এ রকম তো আগে হয় নি।

আজই সকালে যখন ঘুম থেকে উঠেছিল ইউজিন, শরীরটা ছিল বেশ ঝরঝরে। মনও ছিল তাজা। কোন দুর্বলতা ছিল না। বরঞ্চ ঘুম থেকে উঠে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, ও সব দুর্বলতাকে আর সে কোনমতেই প্রশ্রয় দেবে না, প্রলোভনের ধার-কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না, অর্থাৎ মনের কপাট এমন জোরে বন্ধ করে দেবে—যাতে ওসব চিন্তা কোনও ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে।

কিন্তু সব ঝেড়েঝুড়ে সাফ্ করে দেওয়া সত্ত্বেও আবার একটু একটু করে জঞ্জাল জমে ওঠে। ইউজিন নিজেই ভালভাবে লক্ষ করে নি, কেমন করে আবার সেই আবর্জনা ধীরে ধীরে জড় হচ্ছে। ব্যাপারটা অলক্ষিতে ঘটতে থাকে। ইউজিনের অজ্ঞাতসারে কি যেন একটা প্রভাব আস্তে আস্তে ছড়িয়ে যায় মনের ওপর। সকালে উঠেছিল যে, সে এক মানুষ। আর যে-মানুষ বাড়ি ফিরে এল, সে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি। রূপান্তর বিস্ময়কর হলেও ঘটেছে ইউজিনেরই অসতর্ক মুহূর্তে।

যে-মানুষ কাজ নইলে বাঁচে না, কর্মঠ আর পরিশ্রমী,—সে আজ অকারণে এতটা সময় শুধু শুধু মিছে অছিলায় নষ্ট করে এল? ইউজিন ভাবে আর আশ্চর্য বোধ করে। ...রাটা সকাল আজ সে কি করেছে···? শুধু যে কাজে তার আঠা ছিল না, তাই নয়, কাজ সে এড়িয়ে গেছে। যে

জিনিস তার কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, অনলস পরিশ্রম—সেটা আর দিন-যাপনের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে হচ্ছে না।

আগে ছিল কাজেই আনন্দ, শান্তি আর স্ফূর্তি। এখন মনে হয়—ওটা অর্থহীন, গতানুগতিক পুনরাবৃত্তি। তাই ধীরে ধীরে একটা বীতস্পৃহ ভাব, একটা উদাস আলস্য এসে ইউজিনের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে···একটু একটু করে কাজ-কর্ম থেকে সে সরে আসে নিজেরই অজানিতে—মুক্ত করে নিতে চায় আপনাকে কারখানা আর ব্যবসার শ্রমসাপেক্ষ দায়িত্ব থেকে···।

ইউজিন ভাবে, নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন আছে—সমস্ত ক্ষণ কাজ আর কাজ, গতানুগতিক ক্রমিক দিনের শৃঙ্খলায় নিয়ত আবদ্ধ থেকে থেকে মানুষের মন কর্মচক্রে পিষ্ট হয়ে যায়। মনের সজীবতা লুপ্ত, নষ্ট হয়ে যায়। ভাববাব অবকাশ মেলে না, উদ্ভাবনী শক্তি যায় ফুরিয়ে।

তাই ইউজিন নিজেকে গুটিয়ে নিল, মুক্ত কবে নিল সকল রকমের কাজ থেকে। বেশির ভাগ সময়ই কাটাত একলা একলা। কিন্তু নির্জন অবসরের মধ্যেও মনেব শান্তি মিলল না। একলা হওয়া মাত্রই ধবল ছটফটানি। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা অসম্ভব—মন টেঁকে না। তাই বাগানে আর বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াত ইউজিন। আব সেইসব জায়গায় চারদিকে এতো স্মৃতি ছড়ানো যে, সেখানেও মন স্থিব করে কোনো কিছু চিন্তা কবা সম্ভব নয়। সেই সব স্মৃতি এসে মনকে ছেঁকে ধরে, গুরুভাব হয়ে বুকের ওপব চেপে বসে। কোনো দিকেই ছাড়ান নেই। এক-একটি দৃশ্যের সঙ্গে এক-একটি চিত্র জেগে ওঠে। একটি বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ ধরনের অনুভূতি স্পন্দিত হতে থাকে। আসে আনুষঙ্গিক কামনা আর দুঃসহ অশান্তি।

ইউজিন বুঝতে পারে সবই। এই যে চারদিকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঠে আর বাগানে, কাজকর্ম ছেড়েছুড়ে, সকলের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একলা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ভাবছে একটা কিছু জরুরী বিষয় নিয়ে গভীর চিন্তা করছি, আসলে তা সত্যি নয় একেবারেই।

ইউজিন কিছুই এমন গভীর দরকারী কথা নিয়ে মনে মনে আলোচনা করছে না। যা করছে, সেটা নিতান্তই অহেতুক, অযৌক্তিক কামনা। একটা মস্ত পাগলামি, অধীর ছেলেমানুষি তার সারা হৃদয়-মন জুড়ে বসে আছে। উগ্র কামনার একটি বিরাট লেলিহ শিখা তার সমস্ত চৈতন্য, সমস্ত সত্তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ফলে ইউজিন হারাচ্ছে তার বোধ-শক্তি, চিন্তা-ধারার স্বাধীন স্বচ্ছন্দ গতি। কোনো দ্বিতীয় চিন্তা, অন্যতর প্রসঙ্গের অবকাশ নেই সেখানে। কেবল আছে একটা অস্থির উন্মাদনা, একটি যুক্তিহীন, অসঙ্গত প্রত্যাশা। ইউজিন প্রত্যাশা করছে—ইচ্ছাশক্তির বলিষ্ঠ প্রয়োগে এই প্রত্যাশা করছে মনে মনে যে, একটা পরমাশ্চর্য দৈব ঘটনা কি এই মুহূর্তে তার জীবনে ঘটতে পারে না! কোনো এক অকল্পনীয় উপায়ে যদি সে আন্দাজ করতে পারত, ইউজিন তার দৈহিক উপস্থিতি কি একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে প্রার্থনা করছে এই সময়টাতে, আর বেতারে মনের খবর জেনে ফেলে সহসা সে উদয় হ'ত ইউজিনের চোখের সামনে, ঠিক সেই মুহূর্তে। তারপর তারা দুজনে চলে যেত এমন এক জায়গায়, যেখানে কারুর দৃষ্টি পৌঁছায় না। কিংবা যদি সে আসত নীরব অন্ধকার রাত্রিতে, যখন আকাশে চাঁদ নেই—কেউ কাউকে চিনতে পারে না—এমন কি, সে-ও নিজেকেই দেখতে পায় না,···এমনি ঘন আঁধারে যদি সে আসত কাছে, ইউজিন তার দেহ স্পর্শ করত···।

"হায় রে! এর নাম সকল সম্পর্ক ছিন্ন করা!" ইউজিন মনে মনে ভাবে। "যেন ইচ্ছা করলেই কাটান-ছেঁড়ান করা যায়! ভেবেছিলুম—দরকার শেষ হলেই, বাঁধন কেটে বেরিয়ে আসব। প্রয়োজন ঘটেছিল স্বাস্থ্য-রক্ষার খাতিরে···একটি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন নীরোগ মেয়ের! প্রয়োজন তো মিটে গেছে বহু দিন, তবে···? তা হলে দেখা যাচ্ছে, এসব ব্যাপার নিজের করতলগত নয়, নইলে কিসের জন্যে এই দীন লোলুপতা?"

অনেকটা সুস্থ ও স্থির মনেই ইউজিন বিচার করতে বসে আপনাকে।

"নাঃ—দেখছি, এইভাবে আ.র চালানো অসম্ভব, অন্ততঃ ঐ রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে! আগুন নিয়ে খেলা চলে না। ভেবেছিলুম—আমিই

বুঝি ওকে গ্রহণ করেছি, রেখেছি। এখন দেখছি—ওই আমায় পেয়ে বসেছে, বেঁধে রেখেছে···ওর হাত থেকে ছুটি-ছাড়ান নেই! কি আশ্চর্য! ভেবেছিলুম, আমি তো স্বাধীন···কোনো পিছুটান নেই আমার! কিন্তু নিজেকে প্রতারণা করেছি বিয়ে করবার সময়ে—আপনাকে মুক্ত ও স্বাধীন কল্পনা করে নিজেকেই স্তোক-আশ্বাসে ভুলিয়েছি। সেই নিদারুণ আত্মবঞ্চনার ফল এখন ভোগ করতে হচ্ছে! যেদিন ওকে প্রথম পেয়েছিলুম, সেইদিন থেকেই আমার মনের পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। থেকে থেকে মনের মধ্যে জেগে উঠত কেমন যেন একটা নতুন ধরনের অনুভূতি—সত্যিকাবের স্বামী হওয়ার অভিজ্ঞতা। এখন দেখছি, ওর সঙ্গে বাস করাই আমাব উচিত ছিল··· ।”

মনেব কাঠগড়ায় এই অন্তহীন জিজ্ঞাসাবাদ, বিশ্লেষণ আর বিচারের ফলে ইউজিন কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। মুখোমুখি প্রশ্ন করে নিজেকে :

“এই ভাবে তুই নৌকায় পা দিয়ে ভেসে চলা অসম্ভব। একটা শেষ সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো দরকার··· ।

“তুটি জীবনের একটি মাত্র সম্ভব। সেই একটিকেই বেছে নিতে হবে আমাকে, স্থির মনে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। হয় লিজার সঙ্গে জড়িত হয়ে যে-জীবনযাত্রা একদা শুরু করেছিলুম, সেইটি···তা' হলে একদিকে দেশ ও দশের সেবা, আমাব আদর্শ কর্মপদ্ধতি···সম্পত্তি-রক্ষা, নিয়মিত জমিদারী পরিচালনা আর আমার গার্হস্থ্য জীবন···আমার নবজাত সন্তান, তাকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা···আর প্রজাদের কাছ থেকে সম্মান ও শ্রদ্ধা পাওয়া···যদি এই জীবনকেই আঁকড়ে ধরি, তা হলে স্টীপানিডার সেখানে থাকা চলে না···কোনো স্থান নেই তার এই নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে। তাকে দূরে কোথাও সরিয়ে দেওয়ার অত্যন্ত প্রয়োজন। কিংবা জন্মের মতন তাকে লোপাট করে দিতে হবে—যাতে তার আর কোনও অস্তিত্ব না থাকে, কোনও দিনের জন্যে আর আমাকে দ্বিধাগ্রস্ত, পীড়িত ও উদ্বিগ্ন না হতে হয়···

“নয়তো তাকে নিয়েই জীবন। এইটিই দ্বিতীয় পথ···আর অন্য কোনও

উপায় নেই। তা হলে স্টীপানিডাকে ওর স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হয়, টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে হয়। তারপর স্বামীর অঙ্কচ্যুত করে, জনমত গ্রাহ্য না করে, সমস্ত লজ্জা আর অপমান বরণ করে, শালীনতা আর আত্মসম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে, স্টীপানিডাকে নিয়ে একত্র বাস করতে হয়··· একদিকে সমাজ আর বাইরের জগৎ, আর একদিকে আমি ও স্টীপানিডা— সে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই।

"কিন্তু সে ক্ষেত্রে লিজার অস্তিত্ব লোপ হওয়া দরকার। লিজা বেঁচে থাকলে কিংবা বাচ্ছা মিমিটা থাকলে এই দ্বিতীয় জীবনযাপন করা কি করে সম্ভব হয়? নাঃ—ঠিক তা নয়! বাচ্ছা বেঁচে থাকলে কিছু এসে যায় না··· কিন্তু লিজা···? লিজার থাকা চলে না, কোনো মতেই নয়। তার চলে যাওয়া দরকার···সে সব কথা জানুক, আমায় অভিশাপ দিক। তারপর চলে যাক, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক···।

"হ্যাঁ, লিজাকে জানতে হবে—তার জানা যে বিশেষ প্রয়োজন—যে আমি, তার স্বামী হয়ে, তার সন্তানের পিতা হয়ে, জৈব আকর্ষণের উন্মাদ মোহে তাকে এক নগণ্য কৃষক রমণীর পায়ের কাছে বলি দিচ্ছি···বিবাহিত ধর্ম-পত্নীর বদলে নির্বাচন করে নিলুম যৌন-সঙ্গিনীকে···লিজা জানুক আমি শঠ লম্পট, পাপিষ্ঠ প্রতারক, তার বেশি কিছু নয়···।

"না—না, সে সম্ভব নয়···এমন সাংঘাতিক সত্য কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? কিন্তু যদি আর একটা অঘটন ঘটে যায় ইতিমধ্যে···এমনও তো হতে পারে···।"

ইউজিন আকুল হয়ে, সর্বস্বান্ত দেউলিয়ার মত মরিয়া স্বপ্ন দেখতে বসে:

"হয় না যে, তা নয়···মনে করা যাক, লিজার সাংঘাতিক অসুখ হ'ল। সেই ভীষণ মারাত্মক পীড়ার কবল থেকে মুক্তি নেই। লিজার প্রাণ-বিয়োগ ঘটল···হ্যাঁ—তাই! লিজা যদি মারা যায়, তা হলে নিশ্চিন্ত! সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যায় এক নিমেষে···।"

"চমৎকার। কি মধুর যুক্তি-কল্পনা! উঃ—এতোদূর অধঃপাতে গেছি আমি যে, সুস্থ মস্তিষ্কে, নিপুণ বিচারশীল মনে লিজার মৃত্যু কামনা করছি···?

"না—না, তা হতে পারে না···হয়ে কাজ নেই। যদি মরতেই হয় কাউকে, তা হলে স্টীপানিডাই মরুক। মরুক না কেন? ওর বেঁচে লাভটা কি···? ও যদি জন্মের মত সরে যায় জীবন থেকে—তা হলে কি আরাম। আমি মুক্ত, চিরজীবনের জন্যে মুক্ত···

"হ্যাঁ—এভাবেই তো মানুষ নামে সর্বনাশের শেষ ধাপে···বিষ খাওয়ায় কিংবা অন্য কোনও উপায়ে মেরে ফেলে তার স্ত্রীকে অথবা প্রণয়িনীকে। তাই ভালো···একটা বিভলভার নিয়ে ওকে ডাক দেওয়া যাক। ও বেরিয়ে আসুক···তারপর বাহুবন্ধনে বেঁধে ফেলার আগেই ওব শাদা বুকের ঠিক মাঝখানটিতে একটা গুলি ছুঁড়ে সব শেষ করে দেওয়া যাক···যাক্ সব চুকে-বুকে।···

"সত্যি—ওর মধ্যে যেন শয়তানী জাদু আছে···না, শুধু মায়াবী নয়, পুরোপুরি খাঁটি শয়তান ও—আমায় পেয়ে বসেছে—আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি জয় করে আমায় বশীভূত কবে ফেলেছে—মনের দৃঢ়তা আর একটু নেই ···ওর সামনে আমি দুর্বল, অসহায়···"

[গল্পের উপসংহার এইখান থেকে আবম্ভ। উপন্যাসের শেষ অংশটি টল্‌স্টয় আর এক ভাবেও লিখে গেছেন। বিকল্প উপসংহাবটি পাঠান্তব হিসেবে গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হল।]

"তা হলে, মেবে ফেলবো? হ্যাঁ—মাবতেই হবে। মাত্র দুটি পন্থা রয়েছে—আর তৃতীয় পথ নেই···হয় লিজাকে মেরে ফেলতে হয়, নয় তো ওকে···। কেননা, এ ভাবে বেঁচে থাকা অসম্ভব···জড় দেহ, ভগ্ন মন, আর পঙ্গু ইচ্ছাশক্তি নিয়ে তিলে তিলে এক দুর্ধর্ষ মায়াবীর কবলে গিয়ে পড়ার কোনো মানে হয় না—না, সে হয় না···ওরকম ঘৃণ্য, জীবন্মৃত, রাহুগ্রস্ত হয়ে বেঁচে থাকা অসহ্য···।

"না, সে অসম্ভব। ব্যাপারটা ভালো করে বিবেচনা করতে হবে। ভবিষ্যৎ চিন্তার প্রয়োজন···এখন যেভাবে চলছে, সেই ভাবে যদি চলতে

থাকে,—মানে, কোনো বিহিত না করি—তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে কি রকম, সেটা ভেবে দেখা দরকার।

"যা হবে, তা বুঝতেই পারছি,—নিজেকে আবার সেই এক কথা, পুরানো স্তোক-বাক্য দিয়ে ভোলাতে থাকবো যে আমার ইচ্ছে নেই একেবারেই, ওকে ঝেড়ে ফেলবো, দূরে সরিয়ে দেবো— মনের সম্পর্ক পর্যন্ত রাখবো না একদম। কিন্তু ওটা শুধু কথার কথাই, মুখ-সর্বস্ব আশ্বাস মাত্র। সন্ধ্যাবেলায়—অন্ধকার নামতে না নামতেই আবার ঠিক ছুটবো—দাঁড়াবো গিয়ে ওদের বাড়ির পিছন দিককার ছোট্ট উঠানটায়···ও জানবে, আমি এসেছি···নির্ভুল হাজিরা দিয়েছি—আর তখন নিজে ও বেরিয়ে আসবে···।

"আর যদি লোকে জানতে পারে···? জেনে ফেলে আমার স্ত্রীকে বলে দেয় কিংবা আমিই যদি বলি তাকে, জানিয়ে দিই···কেননা, মিথ্যে কথা আমি বলতে পারবো না তো—তা হলে ওর সঙ্গে প্রকাশ্যে থাকতে পারবো না, একত্র জীবনযাপন তা হলে অসম্ভব···কি করে সেটা সম্ভব হয়। লোকে জানতে পারবে যে—সবাই জেনে ফেলবে···ঐ পারাশ্যা আর ঐ কামারটা··· কেউ আর বাদ থাকবে না—এ সমস্ত খবর চেপে রাখা যায় না। তা হলে, ওকে নিয়ে একত্র থাকি কি করে?

"অসম্ভব। তা হয় না। দেখছি, শুধু দুটো উপায় আছে আমার সামনে···হয় ওকে, না হয় স্ত্রীকে মেরে ফেলা···আর নয় তো···হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর একটা পথ আছে, তৃতীয় পথ। আত্মহত্যা···।"

কথাটা অস্পষ্ট ভাবে বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। ধীরে ধীরে মৃদুস্বরে উচ্চারণ করে ইউজিন···আর সহসা সারা গায়ে একটা শিহরণের ঢেউ বয়ে যায়···অত্যন্ত ঠাণ্ডা, শিরশিরে কিসের যেন একটা চকিত স্পর্শ···।

"হ্যাঁ—আত্মহত্যা। নিজেকে মেরে ফেললে আর কাউকে মারবার প্রয়োজন হবে না।"

গোপন অন্তর থেকে এই স্বগত উক্তি বেরিয়ে আসে, রূপ নেয় একটা ভয়াবহ কল্পনার। থতমত খেয়ে যায় ইউজিন, একটা অজানা আতঙ্কে চমকে ওঠে। কেননা—ঐটিই যে একমাত্র পন্থা, সে বিষয়ে আর সন্দেহ

নেই। চিন্তাটা ক্রমশঃই দানা বাঁধতে থাকে···একটা রিভলবার তো আছে তার !

"সত্যিই কি নিজের প্রাণ নিজের হাতে খোয়াবো ? পারবো আমি··· সে সাহস আছে আমার··· ? এ কথাটা তো কখনো ভেবে দেখি নি, সম্ভাবনাও মনে উদয় হয় নি···যদি পারি এমন অবিশ্বাস্য কাজ করতে, তা হলে কি অদ্ভুত ব্যাপার হবে··· ?"

ভাবতে ভাবতে পড়বার ঘরে ফিরে এল ইউজিন।

একটা নিদারুণ, অস্বস্তিকর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন। ঘরে ঢুকেই ছোট্ট দেয়াল-আলমারির পাল্লা খুলে ফেলে। ঐ তো রয়েছে রিভলবার··· ! কিন্তু খাপ থেকে খুলে রিভলবারটা বার করবার আগেই লিজা এসে ঢুকল সেই ঘরে···

২১

ইউজিন তাড়াতাড়ি একখানা খবরের কাগজ দিয়ে রিভলবারটা চাপা দিয়ে ফেলে···পাছে লিজা দেখতে পায়।

"আবার সেই··· !" চাপা ভয়ার্ত স্বরে চেঁচিয়ে ওঠে লিজা। স্বামীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ, অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সে। চোখের চাহনি তার উদ্‌ভ্রান্ত। সমস্ত মুখখানা ব্যথায় বিবর্ণ।

"কি আবার সেই···?" ইউজিন অপ্রসন্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করে। বিস্মিত, বিরক্ত তার কণ্ঠস্বর।

"আবার সেই রকম বিশ্রী, ভীষণ তোমার মুখের চেহারা···! সেই যে-রকম আগে তোমার হ'ত···কিছুতেই আমায় বলতে চাইতে না···"

উত্তেজনায় লিজার শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। কাছে এগিয়ে এসে বলে :

"কি হয়েছে, বলো না লক্ষ্মীটি ! জেন্যা, দোহাই তোমার, এ রকম অবস্থা আমি আর চোখে দেখতে পারি না, এ সহ্য করা যায় না। তুমি খুলে বলো সব কথা। দেখবে, বলে ফেললে মন অনেক হাল্‌কা হয়ে

যাবে। আমি কি দেখতে পাচ্ছি না, চেপে চেপে রেখে কতো কষ্ট পাচ্ছ? এ রকম মন গুম্‌রে থেকে থেকে তোমার স্বাস্থ্য-মন একেবারে নষ্ট হতে বসেছে। তার চেয়ে মন খোলসা করে বলে ফেলা ঢের ভালো,—নয় কি? সে যতো বড় দুশ্চিন্তার কারণই হোক, তাকে চেপে রাখলে তোমার মন খারাপ কি আরো বাড়বে না? ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে যাওয়া কোনো কাজের কথা নয়। একলা, কাউকে ভাগ না দিয়ে, মনের এই বিশ-মণী বোঝা টেনে কতোকাল আব ব'য়ে বেড়াবে, বলো? তার চেয়ে আমায় বলো, আমি শুনি···তুমি অনেকখানি সান্ত্বনা পাবে, দেখো···"

তারপর একটু থেমে, লিজা কি যেন ভেবে বলল:

"তা ছাড়া, তুমি অকারণে বেশি কষ্ট পাচ্ছ। আমি কি জানি না যে, এমন কিছু খারাপ ব্যাপার নয়···?"

"তুমি জানো?" অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করে ইউজিন। "কি করে জানলে এমন কিছু নয়? আমার...."

বলতে গিয়ে হঠাৎ পাংশু মুখে থেমে যায় ইউজিন। লিজা আকুল স্বরে বলে ওঠে:

"বলো, বলো! থামলে কেন? না বললে আমি কিন্তু ছাড়বো না তোমায়···"

বড় করুণ হাসির রেখা ফুটে ওঠে ইউজিনের ওষ্ঠে। বলে:

"বলব? নাঃ—নাঃ, সে হয় না! আর বলবারই বা কী আছে? ও কিছু না···।"

শেষ পর্যন্ত পীড়াপীড়ি করলে হয়তো ইউজিন বলতে পারত লিজাকে। কিন্তু সে বলতে পারল না। ঠিক সেই মুহূর্তে মিমি'র ধাত্রী ঘরে এসে প্রবেশ করল। লিজাকে জিজ্ঞাসা করল:

"খুকীকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসবো?"

লিজা বললে: "হ্যাঁ—নিয়ে যাও।"

তারপর একটু থমকে বললে:

"আচ্ছা, দাঁড়াও। ওর জামা-কাপড় বার করে দিই···ওর মুখ-হাত-পা-ও পরিষ্কার করা দরকার···"

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে স্বামীর দিকে ফিরে তাকায় লিজা। বলে যায়ঃ

"আমি আসছি এক্ষুণি। খুকীকে একটু সাজগোজ করে দিয়ে আসি... তুমি কিন্তু পালিয়ো না যেন—ফিরে এসে শুনব তোমার কথা। না বললে আমি কিন্তু ছাড়ছি না···"

"আচ্ছা, দেখি···তুমি এসো···"

কি রকম অন্যমনস্ক জড়িতস্বরে ইউজিন জবাব দেয়।

লিজা যেতে যেতে স্বামীর কথাই ভাবে। কিছুতেই ভুলতে পারে না সে—ইউজিনের অপ্রস্তুত, অসহায় মুখখানা। লিজার সনির্বন্ধ অনুরোধ-প্রশ্নের উত্তরে তার মুখে যে ভীরু, কুণ্ঠিত আর করুণ হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই হাসিটির কথা বার বারই মনে পড়ে লিজার। দুর্বহ বেদনায় আর অন্তর্দাহে সমস্ত বুকটা থেকে থেকে টন্ টন্ করে ওঠে। এ কী নিদারুণ, অবর্ণনীয় মনস্তাপ ইউজিনের—যে কাউকে বলতে পারা যায় না, প্রকাশ করতে বাধে? লিজা তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে নেয়। ফিরে এসে শুনতে হবেই···ইউজিনের মুখ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে তবে সে ছাড়বে।

লিজা যেই ঘর ছেড়ে বাইরে গেল, ইউজিন অমনি তাড়াতাড়ি চোরের মতন সন্তর্পণে রিভলবারটা তুলে নিল খাপ থেকে।

খুলে পরীক্ষা করে দেখল ইউজিন। বহুদিন আগে গুলি ভরা হয়েছিল এতে, মনে পড়ে। সব গুলোই আছে, কেবল একটা কার্তুজ নেই। কোথায় গেল, কেন গেল মনে করতে পারল না। রিভলবারটা হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল ইউজিনঃ

"আচ্ছা, কোথায় লাগানো যায়?—মাথায়···?"

সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধরে রিভলবার। আস্তে আস্তে হাত ওঠে। কপালের এক প্রান্তে, রগের ঠিক কাছটিতে নিয়ে গিয়ে একটু ইতস্ততঃ করে ইউজিন···

একটা দ্বিধা—করবো কি করবো না—এই ভাব এসে ইউজিনের মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কি রকম অবশ হয়ে আসে যেন শরীরটা···

কিন্তু তক্ষুণি মনে পড়ে যায় স্টীপানিডার কথা।

আর যেমনি ওর কথা ভাবে ইউজিন, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতেব মত খেলে যায় তার দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা। চকিতে ভেসে আসে আবার সেই সব পুরানো চিন্তা, পুরানো দিনের ভয়াবহ গ্লানি—'স্টীপানিডার মুখদর্শন করবো না', এই প্রতিজ্ঞা—তারপর সেই দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের পালা, সেই রমণীয় প্রলোভন আর নৈতিক অধঃপতন। পদস্খলনের পরে আবার সেই নতুন করে প্রলোভন জয় করবার চেষ্টা—সেই দ্বন্দ্ব-অন্তর্বিরোধের প্রাণান্ত প্রয়াস—ভাবলেও গা শিউরে ওঠে। আবার সেই দুর্বিষহ জীবন—কল্পনাতেও শরীর ঘর্মাক্ত হতে থাকে।

"নাঃ—তার চাইতে এ ঢের ভালো—" বলেই রিভলবারের ঘোড়াটা টিপে দেয় ইউজিন।

গুলির আওয়াজে বারান্দার ধাপগুলো একলাফে পেরিয়ে লিজা যখন উর্ধ্বশ্বাসে ঘরের মধ্যে ছুটে এল, ইউজিনের দেহ তখন মাটিতে পড়ে।

উপুড় হয়ে পড়ে আছে, মুখটা মেঝেতে ঠেকে রয়েছে। কানের ওপরে রগ থেকে গরম, কাল্‌চে রক্তের স্রোত মুখ বেয়ে মাটিতে নামছে—অজস্র রক্তক্ষরণ হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। ইউজিনের শবদেহ তখনও থেকে থেকে কুঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে, শরীর তখনও একেবারে নিথর, নিঃস্পন্দ হয়ে যায় নি···

যথারীতি ময়না তদন্ত শুরু হ'ল এবং যথাসময়ে রায় বেরুল।

ইউজিনের এই আকস্মিক আত্মহত্যার কারণ কেউ ব্যখ্যা করতে পারল না, খুঁজেও ঠিক্ করতে পারল না।

মামা মশাই এলেন। কিন্তু তাঁরও মাথাতে ব্যাপারটা ঢুকল না। মাস দুয়েক আগে ইউজিন তাঁকে যে-স্বীকারোক্তি জানিয়েছিল স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে, সেই ব্যাপারের সঙ্গে ইউজিনের আত্মহত্যার

মত বর্তমান শোচনীয় ঘটনার-যে কোনও যোগাযোগ থাকতে পারে, এই অতি সাধারণ নিতান্ত ন্যায্য অনুমানটুকুও তাঁর মগজে এল না।

অবিশ্যি ভার্ভারা আলেক্সিভনার কথাই আলাদা। তিনি বাড়ির সকলকেই বলে বেড়াতে লাগলেন যে, তিনি এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হন নি। ইউজিনের অদৃষ্টে-যে এই নিদারুণ পরিণাম নাচছে সে কথা তিনি বহু পূর্বে থেকেই অনুমান করেছিলেন, স্থির ও নিশ্চিত বলেই জানতেন··· যে-মানুষ ও ভাবে তর্ক করে, কথা কাটাকাটি করে, তার ভাগ্যে এই পরিণতিই হয়ে থাকে! যা হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন, তাই হয়েছে। অতএব আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কিন্তু লিজা আর মেরী পাভ্‌লোভনা—কেউই বুঝতে পারেন না ব্যাপারটা, কেন ইউজিন নিজের প্রাণ নিজের হাতে নষ্ট করল। কারণটা খুঁজে পান না কেউই।

কারণ খুঁজে না পেলেও ডাক্তারদের কথা তা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ডাক্তাররা বলেন, ইউজিনের মাথার গোলমাল হয়েছিল। তার নাকি মস্তিষ্কের বিকৃতিই শুধু হয় নি, হয়েছিল মনো-বিকলন—যেটা মনস্তাত্ত্বিকের এলাকার মধ্যে পড়ে।

চিকিৎসকদের এ সিদ্ধান্ত অবিশ্যি লিজা বা মেরী পাভ্‌লোভনা মেনে নিতে পারেন নি। বিশ্বাস করা কঠিন বই কি! তাঁরা তো জানতেন, চেনা-শুনো, আত্মীয়-স্বজন, সকলের চেয়ে ইউজিন ছিল সুস্থ-মস্তিষ্ক, ধীর স্থির এবং স্বাভাবিক। আর সত্যিই তো!

ইউজিনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এ কথাটা যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তা হলে বলতে হয় প্রত্যেকেই ঐ রকম পাগল। জগতের সমস্ত লোকেরই মস্তিষ্ক-বিকৃতি আছে।

যাঁরা অন্য লোকের খুঁত ধরেন, তাঁদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবিকারের লক্ষণ খুঁজে বেড়ান—যে-লক্ষণগুলো তাঁদের নিজেদেরই অব-চেতনায় রয়েছে অথচ নিজেরাই দেখতে পান না,—তাঁরাই তো সবচেয়ে বেশি অসুস্থ-চিত্ত। তাঁদের মাথা খারাপই বেশি।

উপন্যাসের দ্বিতীয় উপসংহার

"তা হলে মেরে ফেলবো ? হ্যাঁ, মারতেই হবে। মাত্র দুটি পথই আছে, তৃতীয় পন্থা নেই—হয় স্ত্রীকে মেরে ফেলতে হয়, নয়তো ওকে—এভাবে জীবনধারণ অসম্ভব, বেঁচে থাকা চলে না কোনো মতেই। এ রকম ঘৃণ্য, জীবন্মৃত, রাহুগ্রস্ত জীবন—অসহ্য…"

ইউজিন আপন মনে কথা বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। অস্থির-ভাবে পায়চারী করতে করতে টেবিলের দিকে এগিয়ে যায়, তুলে নেয় রিভলবারটা। পরীক্ষা করে দেখে, ঠিক আছে কিনা—নাঃ, একটা কার্তুজ নেই, কি হ'ল কে জানে ?

তারপর রিভলবারটা আস্তে আস্তে পাত্‌লুনের পকেটে পুরে নেয়।

"হায় ভগবান্ ! এ কী করছি আমি ?" একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ইউজিনের কণ্ঠ থেকে। হঠাৎ, হাত জোড় করে ইউজিন প্রার্থনা শুরু করে দেয়। করজোড়ে অদৃশ্য বিধাতাকে উদ্দেশ করে বলে ওঠে—

"হে ঈশ্বর ! আমায় সাহায্য করো, বাঁচাও এ সঙ্কট থেকে—উদ্ধার করো ! তুমি তো জানো, ভগবান্, কায়মনোবাক্যে কোনোদিনই আমি অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে চাই নি—কিন্তু আমি নিঃসহায়, একলা, বড় দুর্বল—শক্তিহীন, ক্রমশঃ অসমর্থ হয়ে পড়ছি। এই দুর্বার প্রলোভনের সামনে—তুমি আমায় সাহায্য করো, উদ্ধার করো, প্রভু—"

ভক্তিভরে ক্রস-বিদ্ধ মূর্তির সামনে নত-মস্তক হয়ে দাঁড়ায় ইউজিন—বুকের ওপর দু'হাত দিয়ে ক্রসের চিহ্ন করে দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে।

কিছুক্ষণ পরে যেন ইউজিনের সম্বিৎ ফিরে আসে। চমক ভেঙে যায়, মাথা তুলে চারদিকে তাকায় ইউজিন আর আপন মনেই বলে ওঠে :

"হ্যাঁ—আমি স্থির, সংযত হয়ে থাকতে পারবো—সাম্‌লাতে পারবো

নিজেকে। এখন একটু বাইরে বেরিয়ে পড়ি—একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসা দরকার। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা তলিয়ে দেখা দরকার।"

বাইরে বেরুবার আগে ইউজিন নীচেকার হল্-ঘরে আগে ঢুকল। সেখান থেকে ওভার-কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে পরে নিল। তাবপর ঘর থেকে বেবিয়ে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি-বাবান্দাটাব নীচে।

কি আশ্চর্য! নিজেরই অজানিতে ইউজিন হেঁটে চলল সেইদিকেই। তার প্রতিটি পদক্ষেপ কে যেন চালিত করে নিয়ে চলেছে বাগানের পাশ দিয়ে, মেঠো পথ ধবে, ক্ষেত পেরিয়ে ঐ দূবেব গোলাবাড়ির দিকে—অভ্রান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল ইউজিন।

ফসল ঝাড়াইয়েব নতুন কলটার কর্কশ আওয়াজ তখনও থামে নি··· ছোক্‌রা ড্রাইভাবদেব তীক্ষ্ণ চীৎকাব শোনা যাচ্ছে দূর থেকে।

ইউজিন গিয়ে ঢুকল গোলাঘবে।

দাঁড়িয়ে আছে সে। গোলাঘরে ঢুকবামাত্র প্রথমে নজরে পড়ল ওকেই। হাতলওয়ালা মস্ত একটা লম্বা কাঁটা দিয়ে ফসলগুলো নেড়ে-চেড়ে ঘেঁটে দিচ্ছে স্টীপানিডা।

ইউজিনকে দেখতে পেয়েই স্টীপানিডার চোখ খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। আর হঠাৎ স্ফূর্তিতে, মেঝেয় ছড়ানো শস্যকণাগুলোব ওপর দিয়ে দৌড়ে ছুটাছুটি করতে লাগল। ফসল-মাড়াইয়ের কাজে সে-যে কত নিপুণ, সেইটে ইউজিনকে দেখাবার জন্যেই যেন তার উৎসাহ!

স্টীপানিডাকে নজব কবে দেখবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না ইউজিনের। কিন্তু না দেখেও সে পারল না। স্টীপানিডাব কাজের প্রতিটি খুঁটিনাটি সে গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল। আর আড়চোখে এক-একবার লুকিয়ে তাকালো ওব মুখের দিকে।

ইউজিন এতোই অন্যমনস্ক ছিল যে, খেয়াল করে নি স্টীপানিডা কখন

তার চোখের সামনে থেকে সরে গেছে। হঠাৎ যেন সম্বিৎ ফিরে পায় ইউজিন। আচমকা শরীরটা শিউরে ওঠে।

গোমস্তা এগিয়ে এসে ইউজিনকে সেলাম ঠুকে বললে :

"ঝাড়াইয়ের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল হুজুর! যেগুলো মাড়াই হয়েছে, সেগুলো এখন ঝেড়ে তোলা হচ্ছে। কাজ এখন একটু ঢিমে চলছে, হুজুর। তাই মাল উঠছে কম।"

ইউজিন ঝাড়াই-কলটার দিকে এগিয়ে গেল দেখবার জন্যে। শস্যের গোছাগুলো—যেগুলো সমানভাবে বেঁধে জড় করা হয় নি, সেগুলো ড্রামের নীচে এসে মধ্যে-মধ্যে শব্দ করে উঠছে।

ইউজিন মুখ ফিরিয়ে গোমস্তাকে জিজ্ঞাসা করল—

"আর কতগুলো আঁটি আছে এই রকম,—মানে যেগুলো মাড়াই হয়ে গেছে?"

"তা, পাঁচ গাড়ি বোধ হয় হবে, হুজুর···"

"আচ্ছা—তা হলে এক কাজ···"

ইউজিন বলতে গিয়ে কথাটা শেষ করতে পারল না। আবার স্টীপানিডা এল তার দৃষ্টিগোচরে।

ড্রামটার কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে স্টীপানিডা ড্রামের নীচে যে আঁটিগুলো আটকে রয়েছে সেগুলো নেড়ে দিতে লাগল। কাজ করতে করতে পাশ ফিরে তাকায় স্টীপানিডা।

ইউজিন দেখতে পায় তার খুশিতে নেচে-ওঠা চোখ। আনন্দে আর উত্তেজনায় সে দৃষ্টি প্রখর, যেন ইউজিনকে ঝল্‌সে মারছে। ওর চোখের জাদু এম্‌নি···যেন হাসি-ভরা দৃষ্টিতে ইউজিনকে দগ্ধ করে ফেলছে—সে দৃষ্টিতে আছে অন্তরঙ্গ আহ্বানের ইঙ্গিত।

স্টীপানিডার চোখে রয়েছে পুরানো দিনের সেই বেপরোয়া প্রণয়—দায়িত্বহীন, সর্বনাশা মিলনের আকুল আমন্ত্রণ। সে দৃষ্টির পরিষ্কার অর্থ হ'ল এই :

ইউজিন যে স্টীপানিডাকে এখনো চায়, তার গোপন আলিঙ্গনের কামনা মনে-মনে এখনো লালন করে—সেটা সে বোঝে। স্টীপানিডা জানে ইউজিন এখনো তার পিছনে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়, তারই ছোট কুঁড়ে ঘরটার পিছনে এসে সেদিন থম্‌কে দাঁড়িয়েছিল স্টীপানিডারই প্রতীক্ষায়··· স্টীপানিডা তো রাজিই আছে—বরাবরই সে রাজি—ইউজিনের সঙ্গে থাকতে আবার সে প্রস্তুত চায় সেই বেপরোয়া অঢেল স্ফূর্তি আর উত্তেজনা। লোকে যা-ই ভাবুক আর ফল যা-ই দাঁড়াক্, স্টীপানিডা মোটেই তা গ্রাহ্য করে না।

ইউজিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারে, বেশ অনুভব করতে পারে, যেন তার নিজস্ব শক্তি ক্রমশ কমে আসছে, স্টীপানিডার কবলে আবার সে গিয়ে পড়ছে।

এ ভাবে আবার আত্মসমর্পণ করতে চায় না ইউজিন। মেরুদণ্ড টান্ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ভাবে, "কিছুতেই রাশ আল্‌গা করবো না। মনের লাগাম জোর হাতে টেনে ধরি।"

প্রার্থনা···হ্যাঁ, প্রার্থনার কথাই মনে পড়ে যায় ঠিক এই ক্ষণটিতে। ইউজিন চেষ্টা করে মুখে বলতে···।

আস্তে-আস্তে মনে মনে আওড়ায় প্রার্থনার বাণী। কিন্তু, আর কথা সরে না···জিহ্বায় অস্বাভাবিক জড়তা নামে···বুঝতে পারে ইউজিন তক্ষুণি —ও হবার নয়। কথা থেমে আসে···হাল ছেড়ে দেয় ইউজিন। প্রার্থনা করতে সে পারছে না, ওতে কিছু হবে না—তার মন রয়েছে অন্য জায়গায়।

ইতিমধ্যে একটা মস্ত বড় ভাবনা এসে ইউজিনের মন জুড়ে বসে···

একটিমাত্র চিন্তা—সর্বগ্রাসী পাগল-করা চিন্তা তার সমস্ত হৃদয়-মন অধিকার করে, আচ্ছন্ন করে ফেলে তার সমগ্র চৈতন্যকে।

কেমন করে স্টীপানিডার সঙ্গে বন্দোবস্ত করা যায়—কোথায় ওর সঙ্গে দেখা করা চলে, নিভৃতে এবং সাবধানে—যাতে আর কারুর নজরে না

পড়ে। ওর সঙ্গে মিলিত হতে হবেই, উপায় নেই। ইউজিনকে টানছে কোন এক দুর্বার অদৃশ্য শক্তি।

গোমস্তা হঠাৎ তার মনিবকে জিজ্ঞাসা করল ঃ

"এগুলো যদি আজ শেষ করে ফেলা যায়, তা হলে আজই কি ঐ সব নতুন আঁটিগুলো ধরবো! না কি, আজ কাজ বন্ধ করে দিই,—কাল শুরু করা যাবে? কি বলেন, হুজুর?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, তাই হবে।"

অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিয়ে ইউজিন স্টীপানিডাব পিছুপিছু এগিয়ে যায় সেই স্তূপীকৃত ফসলের দিকে। আর পাঁচজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে স্টীপানিডা এখন কাঁটা চালিয়ে সেগুলো ঘেঁটে ঘেঁটে দিচ্ছে।

ইউজিন নিজেব মনের সঙ্গে একবাব বোঝাপড়ার শেষ চেষ্টা করে ঃ

"আচ্ছা, সত্যি সত্যিই আমি কি দুনিয়াব বার হয়ে গেছি, জাহান্নামে গেছি একেবারে? নিজেকে সামলাবার মত একটুও ক্ষমতা আর নেই আমার? হে ঈশ্বর!…"

বলতে গিয়ে কথাটা আটকে যায় যেন। ইউজিন ভাবে ঃ

"নাঃ নাঃ, ঈশ্বর এখানে নেই…আছে কেবল শয়তান…প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক নিদারুণ মায়াবী…সে স্টীপানিডা—তার কবল থেকে উদ্ধার নেই আমাব। ও আমাকে পেয়েছে—কাঁধে চেপে বসেছে। কিন্তু নাঃ—আমি করবো না, আমি পারবো না। হ্যাঁ, শয়তানই তো—"

নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে এগিয়ে গেল ইউজিন আবার স্টীপানিডার দিকে। পাত্‌লুনের পকেট থেকে ঝাঁ করে রিভলবারটা বার করে ফেলে।

এক…দুই…তিন। পর পর তিন বার ইউজিন গুলি ছোঁড়ে স্টীপানিডার পিঠ লক্ষ্য করে। স্টীপানিডা দু' পা দৌড়ে যায় কিন্তু আর পারে না…উঁচু করে রাখা ফসলের স্তূপের ওপরই মুখ গুঁজে পড়ে।

"আহাঃ? এ কি হ'ল? ওমা! এ কি কাণ্ড?"

সমবেত স্ত্রীলোকদের ভয়ার্ত চীৎকারে গোলাবাড়ি সরগরম হয়ে উঠ্‌ল।

"নাঃ—অ্যাক্‌সিডেন্ট নয়। হাত ফসকে গুলি বেরোয় নি।" ইউজিন বেশ জোর গলাতেই বলে ঃ

"ওকে আমি ইচ্ছে করে মেরে ফেলেছি—হ্যাঁ, খুন। দারোগার কাছে খবর পাঠাও তোমরা!"

বেশ সুস্থ সহজভাবেই বাড়ি ফিরল ইউজিন। কারুর সঙ্গে একটিও কথা বলল না ইউজিন। লিজার সঙ্গেও না। কোনও বাক্যালাপ না করে পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকল ইউজিন। ভেতর থেকে খিল এঁটে দিল।

ঘরের ভেতর থেকেই দরজার ফাঁকে মুখ দিয়ে ইউজিন চেঁচিয়ে জবাব দিল লিজাকে। লিজা এসে ধাক্কা দিচ্ছিল। কিন্তু ইউজিন দরজা খুলে দিল না। শুধু ভেতর থেকে চেঁচিয়ে বলে দিল ঃ

"আমার কাছে এসো না…তুমি…না, কোনো দরকার নেই কথা বলবার। পরে সবই জানতে পারবে…"

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ইউজিন ঘন্টি বাজাল। একজন চাকর আসতে ইউজিন উঠে দরজা খুলে দিল।

"যা—গিয়ে খবর নিয়ে আয় স্টীপানিডা বেঁচে আছে কিনা।"

চাকর খবরটা ভালোভাবেই জানত। মনিবকে জানাল, "ঘণ্টাখানেক আগে সে মারা গেছে।"

"বেশ! তা হলে যা এখান থেকে। ঘরে যেন কেউ না ঢোকে। দারোগা কিংবা ম্যাজিস্ট্রেট যখন আসবে, আমায় খবর দিস্—"

সেদিন এই ভাবেই গেল।

পরের দিন সকাল বেলায় দারোগা আর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসে হাজির হলেন। তাঁদের সঙ্গে ইউজিনকে যেতে হ'ল হাজতে। যাবার আগে লিজা আর শিশুকন্যার কাছে বিদায় নিয়ে গেল ইউজিন।

যথারীতি বিচার শুরু হ'ল ইউজিনের। এটা যে সময়কার কাহিনী, তখন সবে জুরির বিচারের প্রথম আমল।*

বিচারের ফলে সিদ্ধান্ত হ'ল, ইউজিন সাময়িক উন্মাদনার বসে এ-কাজ করে ফেলেছে। তাই হাকিমের রায় অনুসারে ইউজিনকে গির্জায় থেকে অনুতাপ-দণ্ডে দণ্ডিত করা হ'ল।

ইউজিন প্রথম দিকে প্রায় ন' মাস ছিল গারদে। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হ'ল এক মঠে। সেখানে একমাস তাকে আটক রাখা হ'ল।

জেলে থাকতেই ইউজিনের বদ অভ্যাস শুরু হয়েছিল মদ খাওয়ার। মঠে এসেও ইউজিন সে অভ্যাস ছাড়তে পারল না। সেখানেও সমানে মদ্যপান চলতে লাগল।

ইউজিন যখন ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে এল, তখন সে পুরোপুরি নেশাখোর। অত্যধিক সুরাপানের ফলে দুর্বল দায়িত্বহীন মাতালে পরিণত হয়ে গেছে ইউজিন।

ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌নার অবিশ্যি কোনো পরিবর্তন হয় নি। তিনি যেমন ছিলেন আগে, এখনও ঠিক তেমনি আছেন। দৃঢ়কণ্ঠে তিনি সকলকে জানিয়ে দিলেন তাঁর স্থির নিশ্চিত বিশ্বাসের কথা। তিনি তো অনেক আগে থেকেই জানতেন, ইউজিনের এ অবস্থা হবেই। যেভাবে সে অকারণ তর্ক চালাতো, অবাধ্য কোপন স্বভাবের জন্যে কথা কাটাকাটি করতো, তাই থেকে ভার্ভারা আলেক্সিভ্‌না অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইউজিনের অদৃষ্টে এই রকম পরিণতি তোলা আছে। যা হবে বলে তিনি অনুমান করেছিলেন, তা-ই হয়েছে।

কিন্তু মেরী পাভ্‌লোভ্‌না কিংবা লিজা—কেউই বুঝতে পারে নি ব্যাপারটা, কেন ইউজিন এ রকম কাজ করে বসল। কারণটা কারুর মাথায় ঢোকে নি।

* [১৮৬৪ সালে রাশিয়ায় জুরি-প্রথার প্রবর্তন হয়। তাই গোড়ায় গোড়ায় জুরিরা আসামীদের শাস্তি-বিধানে কোনো রকম কঠোরতা অবলম্বন করতো না। হাল্‌কা শাস্তি দিয়েই ছেড়ে দিত]

কারণ বুঝতে না পারলেও ডাক্তারদের কথা তা বলে বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না, প্রবৃত্তিও হয় না। ডাক্তাররা বলেন, ইউজিনের মাথার গোলমাল হয়েছিল। তার নাকি শুধুই মস্তিষ্ক-বিকৃতি হয় নি, হয়েছিল মনোবিকলন, যে-ব্যাধি মনস্তাত্ত্বিকের এলাকায় পড়ে।

চিকিৎসকদের এই সিদ্ধান্ত অবিশ্যি লিজা বা মেরী পাভ্‌লোভ্‌না মেনে নিতে পারেন নি। বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি! তাঁরা তো জানতেন, চেনা-শুনো আত্মীয়-স্বজনের সকলের চেয়ে ইউজিন ছিল অনেক বেশি সুস্থ-মস্তিষ্ক, ধীর-স্থির ও প্রকৃতিস্থ।

আর সত্যিই তো!

ইউজিনের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এ কথাটা যদি স্বীকার করে নিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, প্রত্যেকেই ঐ রকম পাগল! জগতে সমস্ত লোকেরই তা হলে মস্তিষ্ক-বিকার আছে।

যাঁরা অন্য লোকের মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিংবা মনোবিকারের লক্ষণ খুঁজে বেড়ান—যে-লক্ষণগুলো তাঁরা নিজেদের মধ্যে দেখতে পান না—তাঁরাই তো সবচেয়ে বেশি অসুস্থচিত্ত। তাঁদেরই নিশ্চয় মাথা খারাপ।

ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা

লিও টলস্টয়

১৯ নভেম্বর, ১৮৮৯

এই উপন্যাস রচনার শেষে পাণ্ডুলিপিতে লেখা রয়েছে—ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা। তার নীচে সাল তারিখ। মস্কো থেকে স্থানটির দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার। এই জায়গাটির সঙ্গে টলস্টয়ের জীবন কর্ম ও চিন্তা গভীর ভাবে অন্বিত। এখানেই তাঁর জোত-জমি, ক্ষেত-বাগান ও খামার বাড়ি। একটা গোটা গ্রামই বলা চলে, যেখানে তাঁরই আশে-পাশে থাকত তাঁর পরিচারক ও অনুচরবৃন্দ, আর চাষী-শ্রমিকরা বাস করত তাদের পরিবার নিয়ে। টলস্টয় এই ভাবে পরিবৃত হয়ে দীর্ঘ কাল কাটিয়েছেন। এখানে বসেই তাঁর বহুবিশ্রুত গল্প উপন্যাস নিবন্ধ লিখে গেছেন। এখানেই রুশদেশের সমকালীন সাহিত্যিকরা এসে তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, নানা বিষয়ের আলোচনা করে তৎকালের শ্রেষ্ঠ মনীষী লেখক ও চিন্তাশীল মানুষ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যক্তিগত ধারণার কথা বিভিন্ন স্মৃতিচিত্রে এঁকে রেখেছেন। 'পূর্বকথা'য় গোর্কির স্মৃতিচারণ, বিশেষভাবে তাঁর 'একটি চিঠি'র উল্লেখ করা হয়েছে। এ ছাড়া আব যে-সব সাহিত্যিক শিল্পী অভিনেতা নাট্য-প্রযোজক ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানায় এসে টলস্টয় সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিখ্যাত—যেমন, শেখভ আন্দ্রিয়েভ কোরোলেঙ্কো চায়কোভস্কি রেপিন দাভিদোভ গিন্‌সবার্গ এবং স্তানিস্লাভস্কি।

এঁরা সকলেই লক্ষ করেছেন টলস্টয়ের দীর্ঘ অবয়ব, প্রতিভামণ্ডিত মুখমণ্ডল, তাঁর চোখের কখনও কোমল কখনও কঠিন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি, এক এক সময়ে যুবজনোচিত উৎসাহ, অন্য সময়ে বার্ধক্যসুলভ গাম্ভীর্য, কখনও খোলাখুলি কথাবার্তা, কখনও বা প্রশান্ত নিস্তব্ধতা। একাধারে আদর্শনিষ্ঠা ও সংশয়, এক কথায় নানা দ্বৈতভাব-মিশ্রিত তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব তাঁদের কাউকে চমকিত কাউকে বা অভিভূত করেছে। সকলেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন টলস্টয়েব জটিল সত্তার বিচিত্র উপকরণ। নানা বিষয়ে তাঁর মর্মস্পর্শী মন্তব্য শুনে তাঁদের মন উদ্ভাসিত হয়েছে। এক বিরাট পুরুষের সান্নিধ্যে এসে তাঁরা কি জেনেছেন ও পেয়েছেন তার যথাযথ বিবরণ পাওয়া যায় তাঁদের লেখা স্মৃতিচারণে। টলস্টয় ছিলেন একাধারে শিশু ও

জ্ঞানবৃদ্ধ পেট্রিয়ার্ক, স্বভাব-অভিজাত আবার খাঁটি 'মুজিক'। দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে একাত্ম। দরিদ্র চাষীদের পরম আত্মীয়, বন্ধু। টলস্টয়কে না জানলে রুশ কৃষককে জানা যায় না, লেনিনের এ উক্তি যথার্থ। টলস্টয়ের এই রূপটি চমৎকার ফুটে উঠেছে রেপিনের আঁকা বিখ্যাত তৈলচিত্রে, যেখানে দেখা যায় টলস্টয় তাঁর খামারে নিজ হাতে লাঙ্গল ধরে জমি চষছেন। চাষীগৃহস্থদের সন্তানদের প্রতি তাঁর যে আশ্চর্য মমতা ছিল, তা জানা যায় সংগৃহীত অনেক ছবির মাধ্যমে।

ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানাতে টলস্টয় এদেরই জন্য একটি স্কুল খুলেছিলেন। সেখানে এস্টেটের যে-সব ছেলেমেয়ে পড়তে আসত, তাদেরই মধ্যে একজন, মোরোজোভ পরবর্তী কালে তাঁর বাল্যস্মৃতি সুন্দরভাবে লিখে গেছেন। স্কুলবাড়িটির দৃশ্যও মনোরম। দূরে ঘন বন, বিশাল গাছগুলোর জটলা, তারই কোল দিয়ে পথ চলে গেছে বাঁক নিয়ে। বাড়িটি এখনও আছে। খামারের মধ্যে একটি পথ ছিল টলস্টয়ের খুব প্রিয়। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শালবীথির মতই এটি ছায়াস্নিগ্ধ, আপন মনে বেড়াবার উপযোগী। পথের বাঁকে ঈষৎ ন্যুব্জ টলস্টয়ের পিছন-থেকে দেখা মূর্তি রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে পড়িয়ে দেয়। বসতবাড়ির কাছেই একটি গাছ ছিল। তার একটি শাখা নীচু হয়ে নেমে-আসা, টলস্টয় তারই গায়ে হেলান দিয়ে প্রতিবেশী কৃষকদের সঙ্গে আলাপ করতেন। তাই এর নাম দেওয়া হয় 'পুয়োর ম্যান্‌স্ ট্রী'। গাছটি এখন শুকিয়ে মরে গেছে।

এই এস্টেটের সব কিছুই এখন সরকারের সযত্ন-রক্ষিত মিউজিয়ম। সেখানে টলস্টয়ের পড়ার লেখার যাবতীয় সরঞ্জাম, বই, চিঠিপত্র, ব্যবহৃত জিনিস যেমনটি জীবদ্দশায় থাকত, তেমনিভাবেই রাখা আছে। পবিত্র তীর্থস্থানে যাত্রীদের মত শ্রদ্ধাবনত দর্শকরা প্রবেশ করেন চামড়ার জুতো খুলে। ইয়াস্‌নায়া পোলিয়ানা অনেক সমাগম, অনেক ঘটনা এবং সব শেষে টলস্টয়ের গৃহত্যাগের মত নাটকীয় দৃশ্যের নীরব সাক্ষী। দীর্ঘকাল গার্হস্থ্য জীবনের মধ্যেও তাঁর সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা, স্ত্রী সোফিয়ার সঙ্গে অবনিবনা, গৃহত্যাগের সঙ্কল্প, অবশেষে ১৯১০, ২৮-এ অক্টোবর খুব

ভোরবেলায় দু'একজন বিশ্বস্ত সঙ্গীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আনুপূর্বিক কাহিনী লিখে গেছেন তাঁর নিজস্ব ডাক্তার মাকোভিস্কি। তারপর সপ্তাহখানেক ট্রেনে ঘুরে এবং পথে ঠাণ্ডা লাগিয়ে টলস্টয় যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন এক তৃতীয় শ্রেণীব কামরা থেকে তাঁকে নামিয়ে নেওয়া হয় আস্তাপোভো স্টেশনে। স্টেশনমাস্টার ওজোলিন সযত্নে তাঁকে নিজের বাড়িতে সরিয়ে এনে রাখেন। এইখানেই ৭ই নভেম্বর ১৯১০ সকাল ৬টায় টলস্টয় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর চার ঘণ্টা আগে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে তিনি স্পষ্ট গলায় বলে ওঠেন: 'এই তো শেষ……তা আসুক। তবে একটা কথা তোমরা মনে রেখো—এ পৃথিবীতে লিও টলস্টয় ছাড়াও লক্ষ লক্ষ লোক আছে…আর তোমরা কেবল লিও'র কথাই ভাবছ!' টলস্টয়ের এই শেষ উক্তি তাঁর জনগণ-প্রীতিরই উন্মুক্ত পরিচয়। টলস্টয়ের জীবনের এই অন্তিম সময়টির কথা লিখে গেছেন মাকোভিস্কি, নিকিতন প্রভৃতি চিকিৎসকরা। তাঁর দেহান্তে জনসাধারণ কি ভাবে শবাধার বহে নিয়ে যায় অন্তরের শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়ে, সেই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখেছি কেনেথ ক্লার্কের Civilisation-নামক বই-এর চিত্রায়িত রূপে।

কেউ কেউ বলেন, সোভিয়েত রুশদেশ নাকি তার কবি সাহিত্যিক চিত্রকর ভাস্কর অভিনেতা প্রভৃতি ব্যক্তিদের জাতীয় সম্পত্তি জ্ঞানে প্রচার কাজের সুবিধা করে নিয়েছে। কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। গান্ধীজীর নাম ও মাহাত্ম্য আমরা কি ভাবে ব্যবহার করছি! যে যুক্তিতে ইংলণ্ডের শেক্‌সপীয়র, জার্মনির গ্যয়টে, এ দেশের রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিম, সেই যুক্তিতে পুশ্‌কিন তুর্গেনিভ দস্তোয়েভস্কি, গোগল গোর্কি শেখভ এবং টলস্টয়ও সোভিয়েত দেশেরই মানুষ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান। সুতরাং ওটা প্রচারের নমুনা নয়, সাংস্কৃতিক ও মানবিক চেতনার অথবা ভাবমূর্তির প্রসারের আন্তরিক প্রচেষ্টা। লেনিনই বোধ হয় টলস্টয়ের সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব এবং রুশদেশের বিচিত্র ঐতিহাসিক সত্তার একাত্মতা সব চেয়ে ভালো বুঝেছিলেন ও বুঝিয়েছেন তাঁর তিনটি আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রবন্ধে: প্রথমটি Tolstoy As the Mirror Of The Kussian Revotion (১১ সেপ্টেম্বর

১৯০৮), দ্বিতীয়টি L. N. Tolstoy (মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১৬ নভেম্বর ১৯১০) এবং তৃতীয়টি L. N. Tolstoy And The Present-Day Working Class Movement (২৮ নভেম্বর, ১৯১০)। এগুলোতে তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কি ভাবে টলস্টয়কে 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ' বলে বিবেচনা করা যায়। ঐ মহান বিপ্লবের মধ্যে যেমন নানাবিধ সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তির আপাত-বিরোধ অথচ সমন্বয়ী অবসান, টলস্টয়ের বহুমুখী প্রতিভায়, বিচিত্র চরিত্র ও জীবনের মধ্যেও সেই রকম দ্বন্দ্ব ত্রুটি অসঙ্গতি এবং পূর্ণতা। এই সব নিয়েই তো তিনি মহৎ মানুষ, জনগণের অগ্রগতির সহায়ক, অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিরোধের প্রতীক। অবশ্যই জটিল ও দ্বৈত মিশ্রিত তাঁর মত আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব—"But our revolution is an extremely complex thing." (Lenin). গোর্কিও বলেছেন, মনে হয় যেন টলস্টয় আর তাঁর ভগবান একই খাঁচায় বন্দী দুটি মেরু ভাল্লুকের নিত্য যুদ্ধ !

পরিশিষ্ট প্রসঙ্গে টলস্টয়ের শেষ ইচ্ছার কথা বলতে হয়। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় একটি স্থানে অনাডম্বর মাটির সমাধি। ওপর থেকে গাছের ফুল ঝরে পড়বে, কোনও স্মৃতিফলক থাকবে না। ছবিতে দেখা যাবে, তা-ই আছে। বরফে বৃষ্টিতে মাটির স্তূপটি ধসে নেমে যায়, আবার মাটি দিয়ে সমাধিটি উঁচু করে রাখা হয়। তারই নীচে শায়ান এমন এক কোমল-কঠিন শান্ত-বিক্ষুব্ধ মানুষ যাঁর অটল পাথুরে চরিত্র খোদাই করে গেছেন গিন্‌সবার্গ তাঁর ছোট স্ট্যাচুতে, ১৯০৪ সালে।

ভারতবাসীর মনে টলস্টয়ের বিশিষ্ট আসন স্থায়ী, সুচিহ্নিত। রচনা ও পত্রাবলীর মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বহুদিনের, সেই দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর 'টলস্টয় ফার্ম' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এবং টলস্টয়ের বিখ্যাত 'Letter To A Hindu' পত্ররচনা থেকে। তবে এই চিঠি গান্ধীজীকে নয়, প্রবাসী বিপ্লবী তারকনাথ দাসকে লেখা। অবশ্য গান্ধীজীর সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল, বিশেষ করে উভয়ের নৈতিক মতাদর্শ সূত্রে। Shifman-রচিত Tolstoy and India (Sahitya Akademi), এই বিষয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ, কিন্তু বর্তমানে তা দুর্লভ।

টলস্টয়ের সমাধি